সূর্যোদয়

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

নাথ পাবলিশিং
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড ❑ কলকাতা-৭০০০০৯

সূর্যোদয়

এক

১০ই মে ১৮৫৭।

সেদিনই প্রথম কোম্পানির বিরুদ্ধে গর্জে উঠল সিপাহীরা।

তবে শতাব্দীর শুরু থেকেই সিপাহীদের মনে অসন্তোষের কালো মেঘ জমতে শুরু করে।

দিল্লী।

মোগল বাদশা বাহাদুরের রাজধানী দিল্লী।

বাদশা বাহাদুরের নিবাস ও সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র লালকেল্লার সামনেই জমজমাট চাঁদনী চক। দুনিয়ার মানুষের যাবতীয় ভোগ্য ও কাম্যবস্তুর সম্ভার নিয়ে জমিয়ে ব্যবসা চলছে। গিজ গিজ করছে মানুষ চারদিকে। সালাউদ্দীনের চুড়ির দোকানের ভীড় উপচে পড়েছে রাস্তায়। তবু মিনিটে মিনিটে এক্কা চড়ে বোরখা পরা বেগমরা যেমন আসছেন, তেমনি আসছে লম্বা ঘোমটা দিয়ে হিন্দু মেয়ে-বউরা। ভীড়ের মধ্যেও সালাউদ্দীন ওদের দেখে আদাব করে। অনুনয় করে বলে, মেহেরবানী করে একটু অপেক্ষা করুন।

পাশ দিয়ে যেতে যেতে বন্ধু কিষণচাঁদ মুচকি হেসে মন্তব্য করে, আরে দোস্ত! ঘাবড়াও মাত। তোমার চুড়ির জন্য সবাই হাসি মুখে দু'চার ঘণ্টা অপেক্ষা করবে।

অপেক্ষা করবে না কেন? যে দোকানের চুড়ি খোদ লালকেল্লার দেওয়ানী খাসের লাবণ্যময়ী বেগমদের পর্যন্ত মন জয় করেছে, তার দোকানে তো ভীড় হবেই। সবাই জানে অপেক্ষাও করতে হবে।

শুধু সালাউদ্দীনের চুড়ির দোকানেই না, ছগনলালের পানের দোকানেব সামনেও

অসম্ভব ভীড়।

আরে মিয়া, তুমি তো এত সকালে......

লালাজীর বেটা চন্দ্রকান্তর থুতনিতে একটা টোক্কা মেরে রশিদ মুচকি হেসে বলে, কী করব বলো? নতুন বেগমকে পাশে না দেখেই ঘুম ভেঙে গেল। তাই.....

কথাটা শেষ না করেই রশিদ একটু থামে। তারপর বন্ধুর কানের কাছে চাপা গলায় বলে, রাতে নতুন বেগমের মধু আর দিনে ছগনলালের সুর্ত্তি-পান খেয়েই তো বেঁচে আছি।

আশেপাশের এইসব দৃশ্য আর নানাজনের কলগুঞ্জন শুনতে শুনতেই মৌলানা সাহেব সদর বাজারের দিকে হেঁটে যাচ্ছিলেন। কিছু দূর যাবার পর দূর থেকে মুন্সীজীকে ওর দিকে এগিয়ে আসতে দেখে অবাক।

আদাব। মুন্সীজী। কোথায় যাচ্ছেন?

আবে মৌলানা সাহাব। আমি তো আপনার ওখানেই যাচ্ছিলাম কিন্তু আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

মৌলানা সাহেব ওর একটা হাত ধরে ছপ্তলেন, চলুন। চলুন। আমি আপনার ওখানেই যাচ্ছিলাম। খাস বাত হ্যায়।

আমিও তো খুব জরুরী কথা বলার জন্য আপনার কাছে যাচ্ছিলাম।

যাইহোক মুন্সীজীর কোঠিতে পৌঁছে এক গেলাস ঠাণ্ডা জল খেয়েই মৌলানা সাহেব পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে চাপা গলায় পড়তে শুরু করেন।

"বিদেশী প্রভুদের জন্য বিনা দ্বিধায় আমরা রক্ত ঝরিয়েছি, বিসর্জন দিয়েছি অনেক প্রাণ। লন্ডনের রাজা আর কোম্পানির জন্য জান-প্রাণ লড়িয়ে লড়াই করে দখল করেছি কলকাতা থেকে পেশোয়ার।"

মুন্সীজী মাথা নেড়ে বলেন, সাচ্চা বাত! আর এর জন্য আমরা কী পুরস্কার পেলাম।

মৌলানা সাহেব মুহূর্তের জন্য ওর দিকে তাকিয়েই আবার কাগজখানার উপর চোখ রেখে বলেন, হ্যাঁ, পুরস্কারের কথাও বলছি।

"যারা আগে দু'শ টাকা কর দিয়েছে, তারা এখন তিন শ' দিতে বাধ্য হচ্ছে যারা আগে চার শ' দিয়েছে, তাদের দিতে হচ্ছে পাঁচ শ'।...."

মুন্সীজী মাথা নেড়ে বলেন, বিলকুল ঠিক।

"পায়ে হেঁটে এক জেলা থেকে অন্য জেলা যেতে হলেও দিতে হচ্ছে কর। গরুর

গাড়ি-মোষের গাড়ি করে গেলে কর দিতে হচ্ছে চাব আনা থেকে আট আনা।...”

“দশ গুণ বাড়ানো হয়েছে চৌকিদারী ট্যাক্স। সব গুণী-মানী ব্যক্তিদের পেশা হয়েছে নিষিদ্ধ, বন্ধ হয়েছে সব রকমের রোজগারের পথ। এদের সহ্য করতে হচ্ছে অনাহার আর দারিদ্র্যের জ্বালা।....'

মৌলানা সাহেব মুখ না তুলেই বলেন, এবার শুনুন।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনছি।

“সর্বোপরি সমস্ত হিন্দুস্থানবাসীর ধর্ম ধ্বংস করার উদ্যোগ নিয়েছে কোম্পানি।”

এইবার মৌলানা সাহেব মুখ তুলে মুন্সীজীর দিকে তাকিয়ে বলেন, শুনলেন সব কিছু?

শুনলাম বৈকি।

উনি মুহূর্তেব জন্য থেমে প্রায আপন মনেই বলেন, তাহলে যা শুনেছিলাম, তা সত্যি!

মৌলানা সাহেব জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মুন্সীজীর দিকে তাকিয়ে বলেন, আপনি কী শুনেছিলেন?

আজ সকালে হাকিম সাহেব যখন জুম্মায় নামাজ পড়ে ফিরছিলেন, তখন হঠাৎ আমার সঙ্গে দেখা। তখনই উনি এইরকম একটা ইস্তাহারের কথা বলছিলেন কিন্তু তখন ঠিক বিশ্বাস করতে পারিনি।

মুন্সীজী সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন করেন, মৌলানা সাহাব, আপনাকে এ ইস্তাহার কে দিয়েছে?

আপনি তো জানেন মুন্সীজী, আমি রোজ রাত্তিরে শোবাব আগে কোরানের কিছু অংশ পড়ি।....

জানব না কেন?

কাল রাত্তিরে যখন কোরান পড়ছিলাম, ঠিক তখনই কে যে ইস্তাহারটা আমার দিকে ফেলে দিয়েই পালিয়ে গেল, তা বুঝতে পারলাম না। তবে এই ইস্তাহারের নীচে লেখা আছে, দিল্লীবাসী হিন্দু ও মুসলমানদের তরফ থেকে এই ইস্তাহার জারি করা হলো।

দু' পাঁচ মিনিট চুপ করে থাকার পর মুন্সীজী বললেন, তবে আমার মনে হয় কোম্পানির সিপাহীরাই এই ইস্তাহার প্রকাশ করেছে।

একটু ভেবে মৌলানা সাহেব মাথা নেড়ে বললেন, কিন্তু মুন্সীজী, সিপাহীদের কি এত সাহস হবে?

দেখুন মৌলানা সাহাব, একটা কথা মনে বাখবেন, আমাদের মত মানুষ না,

সিপাহীদের জন্যই কোম্পানি একটার পর একটা রাজ্য জয় করেছে। তাছাড়া এইসব যুদ্ধ-বিগ্রহে সিপাহীরাই জখম হচ্ছে বা মরছে। তারা কোম্পানির আসল চরিত্র ও মতলব যত ভাল বুঝবে, তা আমি বা আপনি বুঝব না।

ঠিক বলেছেন মুন্সীজী।

১৮০৬।

স্যার জন বার্লো তখন গভর্নর জেনারেল।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তরফ থেকে ইনি হুকুম জারী করলেন, কলকাতা, বোম্বে ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর সামরিক কর্তৃপক্ষ নিজেদের বিবেচনা মত আইন-কানুন বিধি-নিষেধ জারি করতে পারবে।

সে সময় সিপাহীরা নিজের নিজের ধর্মের ও গোষ্ঠীর পরিচয় চিহ্ন ললাটে ধারণ করতো। ধর্মের নির্দেশ মেনে অনেক সিপাহী দাড়ি রাখতো। তবে সব সিপাহীদের মাথায় থাকতো পাগড়ি।

মাদ্রাজের সাময়িক কর্তৃপক্ষ হুকুম জারি করলেন, নো, নো, নো। ওসব নেহি চলেগা। ব্লাডি নেটিভ সিপাহীরা ক্লাউন সেজে থাকবে, তা বরদাস্ত করা হবে না। দে মাস্ট পুট অন ক্যাপস্। পাগড়ির বদলে প্রত্যেককে টুপি পরতে হবে।

শুধু কি টুপি?

না, না, শুধু টুপি না। প্রত্যেক টুপিতে থাকবে লেদার ব্যাজ।

চামড়ার ব্যাজ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, চামড়ার।

এই সর্বনাশা ফতোয়া জারির খবর শুনেই হিন্দু-মুসলমান সিপাহীরা চঞ্চল হয়ে ওঠে। সবার মুখেই এক প্রশ্ন-কোন পশুর চামড়া দিয়ে তৈরি হবে এইসব ব্যাজ?

গরু? নাকি শূওর?

না, না, ঐ ব্যাজ ব্যবহার করা সম্ভব না। হিন্দু-মুসলমান সিপাহীরা এক যোগে প্রতিবাদ করলো। ওরা সন্দেহ করলো, কোম্পানির সামরিক অফিসারদের অভিপ্রায়, হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীরা হিন্দু ও ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করুক।

এই চামড়ার ব্যাজ ব্যবহারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠল ভেলোরের হিন্দু-মুসলমান সিপাহীরা।

ইংরেজ সন্দেহ করল, টিপু সুলতানের চক্রান্তেই সিপাহীরা বিদ্রোহ করেছে।

এর ঠিক আঠারো বছর পরের কথা।

১৮২৪।

বার্মা আসাম দখল করে নেবার পর থেকে মাঝে-মাঝেই টুকটাক সংঘর্ষ আর বিরোধ চলছিল ইংরেজদের সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত ১৮২৪ সালে বার্মার সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হলো ইংরেজদের।

কোম্পানি কলকাতা আর মাদ্রাজেব সামরিক কর্তৃপক্ষকে হুকুম দিল, অবিলম্বে সিপাহীদের বার্মা পাঠাও।

আসাম আর আরাকান হয়ে স্থলপথে বার্মা যেতে আপত্তি ছিল না ব্যারাকপুরের ৪৭ বেঙ্গল রেজিমেন্টের সিপাহীদের কিন্তু হিন্দু সিপাহীরা স্পষ্ট ভাষায় ইংরেজ অফিসারদের জানিয়ে দিল, জাহাজে চড়ে কালাপানি পার হতে পারব না।

হোয়াই? জাহাজে যাবে না কেন?

স্যার, ধর্মের নিষেধ আছে। কালাপানি পার হলেই আমাদের ধর্ম চলে যাবে। আমরা ধর্মচ্যুত হবো।

ননসেন্স!

ইতিমধ্যে মাদ্রাজের সিপাহীবা সমুদ্র পথেই বার্মা রওনা হলো।

সঙ্গে সঙ্গে ব্যারাকপুরের সিপাহীদেব হুকুম দেওয়া হলো অল রাইট। তোমরা যখন জাহাজে যাবে না, তখন তোমরা এখুনি গরু-মোষ-ঘোড়ার গাড়িতে বার্মার পথে যাত্রা শুরু করো।

ইংরেজ অফিসারদের হুকুম শুনে সিপাহীরা স্তম্ভিত হয়ে যায়। ওরা বলে, স্যার, আমরা গরু-মোষ-ঘোড়ার গাড়ি পাবো কোথায়? সব গাড়ি তো আগেই কোম্পানি নিয়ে নিয়েছে।

ইউ ব্লাডি নেটিভস! ওসব ওজর-আপত্তি আমরা শুনবো না। ইউ স্টার্ট ইমিডিয়েটলি।

ঠিক এই সময় সিপাহীরা জানতে পারলো, ওরা চট্টগ্রাম পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই কোম্পানি জোর করে ওদের জাহাজে চড়িয়ে দেবে তাড়াতাড়ি বার্মা পৌঁছবার জন্য।

হিন্দু সিপাহীরা আরো ক্ষেপে উঠল।

প্রধান সেনাপতি স্যার এডওয়ার্ড প্যাগেট হুঙ্কার দিলেন, আই উইল নেভার টলারেট দিস ইনডিসিপ্লিনড্ ব্লাডি বাস্টার্ড হিন্দু সিপাহীজ।

প্রধান সেনাপতির হুঙ্কারেও হিন্দু সিপাহীরা বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না। ওরা পাল্টা

হুঙ্কার দেয়, শৃঙ্খলারক্ষার চাইতে ধর্মরক্ষা অনেক অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

হোয়াট? সামান্য নগণ্য হিন্দু সিপাহীরা আমার হুকুম মানবে না?

প্রধান সেনাপতি স্যার এডওয়ার্ড হুকুম দিলেন, ফায়ার! মারো বাস্টার্ড হিন্দু সিপাহীদের।

গুলি খেয়ে এক দল সিপাহীর প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়তেই প্রধান সেনাপতি বলেন, স্টপ!

সঙ্গে সঙ্গে গুলি করা বন্ধ হয়।

না, এক দল হিন্দু সিপাহীকে খতম করেই উনি খুশি হতে পারেন না। বলেন, বাকি বিদ্রোহী সিপাহীদের ফাঁসি দাও।

স্যার এডওয়ার্ড মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, সিপাহীদের মৃত্যু হবার পরও ওদের দেহ সৎকার হবে না। বেশ কয়েক দিন ওদের মৃতদেহ গাছ থেকে ঝুলে থাকবে। অন্য সিপাহীরা দেখুক, বিদ্রোহ করলে ওদের কি পুরস্কার জুটবে।

এই বছরেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উৎসাহে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্নতির জন্য ৬৬ নং বৌবাজার স্ট্রীটের ভাড়া বাড়িতে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয। আবার এই বছরের শুরুতেই জন্ম হলো মাইকেল মধুসদন দত্তের।

দুই

ষোল শ' নব্বই সালের তুমুল বর্ষাব দিনে জোব চার্নক দলবল নিয়ে সুতানুটির হাটখোলা বা রথতলা ঘাটে নামেন এবং নিজেদের বসবাসের জন্য কয়েকটা মাটির ঘর তৈবি করেন।

ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্য বিস্তারের সেই প্রথম পদক্ষেপ।

নবাব বাহাদুরের অনুমতি নিয়েই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী শুরু করলো ব্যবসা-বাণিজ্য এবং কোম্পানির আমলাদের কৃপায় অর্থলাভ করে, সৃষ্টি হলো একদল স্তাবকের।

না, নবাব বাহদুর সেজন্য বিচলিত বোধ করেন না।

মাত্র পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছরের মধ্যেই যেভাবে কোম্পানি তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি,

ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থ-সামর্থ্য ও সর্বোপরি সৈন্যবল বৃদ্ধি করলো, তাতে নবাব বাহাদুর সত্যি চিন্তিত হলেন। কোম্পানি কলকাতা শহরের মধ্যে শুধু দুর্গ তৈরি করেই থামলো না। সৈন্যবাহিনীকে আরো শক্তিশালী করা হলো ; বিলেতও থেকে আনা হলো অফুরন্ত গোলা-বারুদ আর অসংখ্য কামান।

আকণ্ঠ সুরাপান ও দিবারাত্রি নারীসঙ্গ উপভোগ করেও নবাব সিরাজদ্দৌল্লার মনে শান্তি নেই।

না, না, শুধু ব্যবসা-বাণিজ্য রক্ষার জন্য এত গোলা-বারুদ-কামান ও বিশাল সৈন্যবাহিনীর আয়োজন করেনি কোম্পানি। ওরা কি বাংলার মসনদ দখল করতে চায়?

নবাব আর কালবিলম্ব না করে বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে কলকাতা আক্রমণ কবলেন এবং কোম্পানির সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করে কলকাতা দখল করলেন।

ঠিক সাত মাস পরে ক্লাইভ আর ওয়াট্সনের নেতৃত্বে কোম্পানির সৈন্যবাহিনী নবাব-বাহিনীকে পরাজিত করে কলকাতা দখল করলো।

বছর ঘুরে যাবার আগেই পলাশীর যুদ্ধে ক্লাইভের সৈন্যবাহিনীর কাছে নবাব-বাহিনীর পরাজয়। সিরাজের হত্যা। কোম্পানির কৃপায় নবাব হলেন আলিবর্দ্দী খাঁ-র জামাতা মীরজাফর আলি।

মীরজাফর আলিকে গদিতে বসিয়েই কোম্পানি জানিয়ে দিল, সিরাজ-বাহিনীর আক্রমণে কলকাতার বহু ঘরবাড়িই শুধু ধ্বংস করা হয়নি। তারা লুঠ করেছে লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি। সুতরাং সেইসব ক্ষতির খেসারত দিতে হবে বর্তমান নবাবকে।

মীরজাফর এক কথায় ওদের দাবী মেনে নিলেন। সিরাজের কলকাতা আক্রমণের এক বছর পরে—সতের শ' সাতান্নর ৬ই জুলাই মুর্শিদাবাদ থেকে একশ' নৌকায় সাতশ' কাঠের বাক্স ভর্তি হয়ে এলো ক্ষতিপূরণের প্রথম কিস্তি ছিয়াত্তর লক্ষ টাকা। দু'সপ্তাহ পরে এলো আরো চল্লিশ লক্ষ টাকা। তারপর আরো। মোট এক কোটি সত্তর লক্ষ টাকা।

ক্ষতিপূরণের বারো আনা টাকাই গেল কোম্পানির এক দল ইংরেজ কর্মচারীর পকেটে ; চার আনা এলো স্থানীয় বাসিন্দাদের হাতে। স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে শোভারাম বসাক, রতন সরকার, গোবিন্দরাম ও রঘুরাম মিত্র, নীলমণি মিত্র ও আলিজান ভাইয়ের মত কোম্পানির আমলাদের প্রিয়পাত্রদেরই কপালে শিকে ছিঁড়ল। গোবিন্দরাম মিত্র কোম্পানির তহবিল তছরুপ করেও রেহাই পেয়েছিলেন।

এসব ইতিহাস। অনেক দিন আগেকার কথা।

পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের পর পরই কোম্পানি ঠিক করলো, কালবিলম্ব না করে

এবার ঝড়ের বেগে এগুতে হবে। দখল করতে হবে সমগ্র বঙ্গদেশ, তারপর সমগ্র ভারত।

দেখতে দেখতে কত কি ঘটে যায় সারা দেশে। দিন দিনই বদলে যায় কলকাতা। যাবে না? এত নোংরা, এত অপরিচ্ছন্ন শহরে কি ইংরেজরা থাকতে পারে? তাছাড়া ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, ওলাওঠা ; আরো কত রকমের মারাত্মক অসুখ। এইসব অসুখ-বিসুখে কোম্পানির লোকও কম মরল না।

সুতরাং পলাশীর যুদ্ধের ছ'সাত বছর আগে থেকেই কলকাতায় নর্দমা তৈরির প্রারম্ভিক কাজ কোম্পানি শুরু করে ; মশা মাছি পোকা-মাকড়ের প্রকোপ কমাবার জন্য শুরু হয় চৌরঙ্গীর জঙ্গল পরিষ্কার। হাত দেওয়া হয় লালদীঘির উন্নতিতে। পলাশীর যুদ্ধের প্রায় তিরিশ বছর আগেই কোম্পানি চালু করেছে 'মেয়র-কোর্ট'। তবে যুদ্ধে জয়ের পরই কোম্পানি সিদ্ধান্ত নেয়, প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীদের বেত মেরে মারা হবে না ; তোপের মুখে ওদের উড়িয়ে দেওয়া হবে। চালু হলো কলকাতা ও মুর্শিদাবাদের মধ্যে ডাক ব্যবস্থা ; মাত্র তিরিশ ঘণ্টায় পৌঁছে যায় চিঠিপত্র। কয়েক বছর পর ডাক ব্যবস্থা প্রসারিত হলো ব্যারাকপুর-হুগলী-চন্দননগর থেকে ঢাকা-চট্টগ্রাম, বারাণসী থেকে কটক-গঞ্জাম পর্যন্ত। ইতিমধ্যে কলকাতায় চালু হয়েছে কোম্পানির টাঁকশাল।

আরো আরো কত কি হলো কলকাতায়। কাঁচা রাস্তা পাকা হলো, তৈরি হলো ফোর্ট উইলিয়ম, চালু হলো সুপ্রীম কোর্ট, শুরু হলো ঘোড়দৌড়-ক্রিকেট খেলা। যাতায়াতের জন্য শুধু পালকি না, শুরু হলো দুই ও চার স্প্রিংওয়ালা বগী গাড়ির চলন। আলু তখনো চালু না হলেও সতেরশ' চুরানব্বইতে এসে গেল বাঁধা কপি। কাগজে বিজ্ঞাপন বেরুল—"যাঁহারা বাঁধা কপির লোভনীয় আস্বাদনে তৃপ্তিলাভ করিতে চান, তাঁহারা চাঁদপাল ঘাটের সান্নিধ্যে, পুরাতন অর্ফান হাউসের একটু দক্ষিণে, কাপ্তেন ম্যাকিন্‌টারের বাগানে অনুসন্ধান করুন। এক শত কপির দাম—৮সিক্কা টাকা।"

পত্র-পত্রিকার তো অভাব নেই। সে সব পত্র-পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপনও ছাপা হচ্ছে। এক কাগজে বিজ্ঞাপন বেরুলো, লালবাজারে বাঘ বিক্রি, অন্য কাগজে গাড়িওয়ালা স্টুয়ার্ট কোম্পানি বিজ্ঞাপন দেয়, আটশ' টাকায় বিলাতী গাড়ি বিক্রির। কখনও কখনও বিচিত্র বিজ্ঞাপনও ছাপা হয়। যেমন—

'আমার পায়ে কতকগুলি কড়া হওয়ায় বড়ই কষ্ট পাইতেছি। যে লোক এই কড়াগুলি আরাম করিয়া দিতে পারিবে, তাহাকে এক হাজার সিক্কা টাকা পারিতোষিক দিব। ৮০ নং জিগজ্যাগ লেনে সংবাদ লউন।"

কোম্পানির উৎসাহে কলকাতায় নাচ-গান-থিয়েটার হল তৈরি হলো, প্রতিষ্ঠা হলো ক্লাব, বৈঠক বসে নাচ-গান-মদ্যপানের। চৌরঙ্গী ও তার আশেপাশে আকাশচুম্বী সুন্দর সুন্দর পাকা বাড়ি, ফিটন আর বগী চড়ে সাহেব-মেমসাহেব আর কিছু ধনী বাঙালি বিকেল-সন্ধেয় ময়দানে হাওয়া খেয়ে ঘুরে বেড়ান।

এক কথায় কলকাতা তখন শুধু কল্লোলিনী না, মহানগরীও হয়ে গেছে।

শোভাবাজারে অঘোর বসাকের চণ্ডীমণ্ডপের সামনে বারান্দায় ঘনিষ্ঠ পাত্র-মিত্রদের দৈনন্দিন অপরাহ্ণকালীন বৈঠকে ইতিমধ্যেই অনেকে হাজির হয়েছেন। সবার মুখেই হাসি ; ব্যতিক্রম শুধু নিধিরাম মিত্তির।

অঘোর বসাক তাকিয়ায় হেলান দিয়ে গড়গড়ায় একটা টান দিয়েই বলেন, কি হলো মিত্তিরমশাই, আজ মুখে হাসি নেই কেন? শরীর সুস্থ আছে তো?

নিধিরাম মিত্তির একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, আজ্ঞে শরীর ভালই আছে তবে....

না, উনি কথাটা শেষ করেন না।

তবে কি?

বলরাম মুখুজ্যে নিধিরামের বিশেষ বন্ধু। তাই তিনি একটু হেসে বলেন, তবে কি স্ত্রী-সুখে বঞ্চিত হয়েছ?

হ্যাঁ, বলরাম, আমি সত্যি সত্যি স্ত্রী সুখে বঞ্চিত হচ্ছি।

তিন-চারজন এক সঙ্গে প্রশ্ন করেন, কেন? কেন?

বলরাম বলেন, নিধিরাম, একটি নয়, দুটি নয়, তোমার সাত-সাতটি স্ত্রী ; তবুও তুমি স্ত্রী সুখে বঞ্চিত হচ্ছো?

আরে ভাই, আমার দুটি স্ত্রী পিত্রালয়ে থাকে, তা কি তুমি জানো না?

হ্যাঁ জানি বৈকি কিন্তু অন্য পাঁচজন স্ত্রী তো তোমার কাছেই থাকেন।

বড় বউ প্রায় নিত্যই শয্যাশায়ী থাকেন। মেজ বউ সংসার নিয়ে ব্যস্ত, সেজ বউ পুজোর ঘর সামলানো ছাড়া আমার বৃদ্ধা মাকে দেখাশুনা করতেই হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে।...

অন্য দু' জন?

বলছি, বলছি।

নিধিরাম একবার নিঃশ্বাস নিয়ে বলেন, এই ছোট দু'জনই আমার দেখাশুনা সেবা-যত্ন করতো। সত্যি কথা বলতে কি এই দু'জনের রূপের-গুণের যেমন তুলনা

হয় না, তেমনি আমাকে সুখে রাখতে, আনন্দে রাখতে ওদের চেষ্টায় বা আগ্রহের সীমা নেই।

তবে আবার দুঃখ করছো কেন?

ওরে বাপু, ওরা দু'জনেই গর্ভবতী। তারমধ্যে একজন তো আসন্ন প্রসবা।

সবার মুখেই হাসি।

বলরাম চাপা হাসি হেসে বলেন, কপালগুণে ওরা দু'জন স্বামীর সোহাগ ভালবাসা পেয়ে গর্ভবতী হয়েছে, সে তো আনন্দের কথা।

ওহে বন্ধু, এখন যে আমাকে দেখাশুনা করার কেউ নেই।

অঘোর বসাক গড়গড়ায় শেষ টান দিয়ে এক গাল ধোঁয়া ছেড়েই বলেন, মিত্তির, তুমি সত্বর বিয়ে করো।

এই বয়সে আবার বিয়ে করবো?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, করবে।

বসাক মশাই মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, সব চাইতে বড় কথা, তুমি কুলীন কায়েত। তুমি স্বচ্ছন্দে পাঁচিশ-তিরিশটা বিয়ে করলেও কেউ নিন্দা করবে না।

না, তা করবে না ঠিকই কিন্তু.....

আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও ; আমাকে বলতে দাও।

বসাক মশাই বলে যান, তোমার বয়স মাত্র পঞ্চাশ.....

আজ্ঞে পঞ্চান্ন।

ঐ একই ব্যাপার। তুমি রূপবান, স্বাস্থ্যবান, কোম্পানির অধীনে কাজ করে বেশ ভাল আয় করো...

আজ্ঞে হ্যাঁ, তা করি।

এই কলকাতা শহরে তুমি প্রায় সাহেবদের মতই বিরাট পাকা বাড়ি তৈরি করেছ, গ্রামেও যথেষ্ট জমিজমাও করেছ....

নিধিরাম গদ গদ্ হয়ে বলেন, কিছু না হলেও ষাট-সত্তর বিঘে জমি কিনেছি গত পাঁচ বছরে।

বসাক মশাই একগাল হেসে গলা চড়িয়ে বলেন, মিত্তির, তোমাকে কন্যাদান করে ধন্য হবে মেয়ের বাপেরা।

বলরাম নিজের উরুতে এক থাপ্পড় মেরে বলেন, ঠিক বলেছেন বসাক মশাই।

নিত্যহরি নাকে নস্যি দিয়ে মৃদু হেসে বলেন, নিধিরাম, আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব প্রায় শতখানেক বিয়ে করেছিলেন। আমার গর্ভধারিণী ছাড়া এগারজন বিমাতা আমাদের বাড়িতেই থাকতেন। আমার অন্য বিমাতারা পিত্রালয়েই থাকতেন।

পিতৃদেব ঘুরে-ফিরে ওদের প্রত্যেকের কাছে যেতেন।

অঘোর বসাক একটু বিরক্ত হয়েই বলেন, ওরে বাপু, তোমার বাপের কথা ছাড়ো। যদি নিজের বিষয়ে কিছু বলতে চাও, তাই বলো।

হ্যাঁ। বলো।

নিত্যহরি কাতর দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে বলেন, আমি জীবনে কোনদিন আমার গর্ভধারিণী আর বিমাতাদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ দেখিনি কিন্তু আপনি ভাবতে পারবেন না। আমার ছোট তিন গৃহিণী প্রতি রাত্রে কি বিচ্ছিরি ঝগড়া-ঝাটি করে।

কেন? কেন?

নিত্যহরি একটু চাপা হাসি হেসে বলেন, আমার কনিষ্ঠতম বউ প্রায় স্বর্গের অপ্সরাদের মতই সুন্দরী। ওকে দেখলেই আমার কামনা-বাসনার আগুন জ্বলে ওঠে।....

বাঃ! সে তো অত্যন্ত আনন্দের কথা।

বসাক মশাই প্রায় না থেমেই বলেন, যে স্ত্রী স্বামীর মনে কামনা-বাসনার আগুন জ্বালাতে না পারে, সে স্ত্রী তো মৃতবৎ!

নিধিরাম বলেন, ও নিত্য, তোমার স্ত্রীরা ঝগড়া করে কেন, তা তো বললে না।

হ্যাঁ, ভাই, বলছি।

নিত্যহরি একটু চাপা হাসি হেসে বলেন, সত্যি কথা বলতে কি, আমি সর্বকনিষ্ঠাকে নিয়েই রাত কাটিয়ে সব চাইতে বেশি আনন্দ পাই কিন্তু.....

বলরাম ওর কথার মাঝখানেই একটু হেসে বলেন, অন্য দুই বউ তা সহ্য করতে পারে না, তাই তো?

হ্যাঁ, ঠিক তাই।

অঘোর বসাক শুধু ধনী না, নারী সংক্রান্ত বিষয়েও অত্যন্ত অভিজ্ঞ। এবং বেশ বিচক্ষণ। তার বিচক্ষণতার উপর এইসব পাত্র-মিত্রদের অগাধ বিশ্বাস ও আস্থা। তাইতো নিত্যহরি তাঁর সুবিবেচনাপূর্ণ পরামর্শ প্রার্থনা করেন, বসাক মশাই, আপনিই বলুন আমার কি করণীয়।

অঘোর বসাক গুরুগম্ভীর হয়ে বলেন, দেখো নিত্যহরি, আমরা বিয়ে করি, উপপত্নী বা রক্ষিতার কাছে যাই শুধু একটু সুখ আর আনন্দের জন্য। যে স্ত্রী, উপপত্নী বা রক্ষিতা আমাদের সেই সুখ আর আনন্দ দেবে, আমরা অবশ্যই তার কাছে যাব।

সম্মতিতে সবাই মাথা নাড়েন।

উনি বলে যান, যে নারী আমাদের পরিপূর্ণভাবে সুখ বা আনন্দ দিতে না পারে,

তাকে তো আমাদের বর্জন করতেই হবে।

নিত্যহরি ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করেন, তাহলে অন্য দুই স্ত্রীকে ত্যাগ করতে বলছেন?

না, না, ঠিক তা বলছি না।

তবে?

তুমি ওদের পিত্রালয়েও পাঠাতে পারো, আবার তোমার কাছেও রাখতে পারো মোদ্দা কথা ওদের স্পষ্ট বলে দেবে, ওরে মাগী, তোদের মধু খেয়ে আমার মন ভরে না বলেই তো নতুন বউকে ঘরে এনেছি।

হ্যাঁ, তা বলে দিতে পারি কিন্তু....

কিন্তু কি?

বসাক মশাই, ওদের দু'জনেরও বয়স বেশি না ; মোটে একুশ-বাইশ। দু'জনের দেহেই যৌবনের জোয়ার। ওদের দূরে সরিয়ে দিলে যদি ওরা দ্বিচারিণী হয়?

ওর কথা শুনে বসাক মশাই হো হো করে হেসে ওঠেন। তারপর বলেন, ওরা দ্বিচারিণী তো হবেই এবং হওয়াই তো স্বাভাবিক কিন্তু তাতে আপনার কি?

কিন্তু....

নিত্যহরির মুখে আবার কিন্তু শুনেই উনি দপ্ করে জ্বলে ওঠেন, আরে দূর মশাই! পুরুষ হয়ে আবার এত কিন্তু কিন্তু করলে চলে?

পরিস্থিতির মোড় ঘুরাবার জন্য বলরাম মুখুজ্যে বলেন, আচ্ছা বসাক মশাই আপনার একাধিক পত্নীও আছে, একাধিক উপপত্নী বা রক্ষিতাও আছে। আপনি কি করে সব দিকে সামাল দেন?

চাকর নতুন করে তামাক সেজে গড়গড়ার নল এগিয়ে দিতেই অঘোর বসাক চোখ বুজে পর পর কয়েকটা টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়েই একটু হাসেন। তারপর বলেন, বলরাম, আমি তো তোমার মত বামুনও না, মিত্তিরের মত কুলীন কায়েতও না। তাই দশ-বিশটা বিয়ে করতে পারিনি।

উনি সঙ্গে সঙ্গেই বলেন, তোমরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবে শতখানেক বউ পোষার মত অর্থবল আমার আছে।

পাত্র-মিত্ররা এক যোগে বলেন, নিশ্চয়ই আছে।

আমি মাত্র দুটো বিয়ে করেছি এবং নিশ্চয়ই স্বীকার করবো, ওদের দু'জনের সঙ্গেই সহবাস করে আমি তৃপ্তিলাভ করেছি।

বসাক মশাই একটু থামেন। গড়গড়ায় দু' একটা টান দেন। তারপর একটু হেসে বলেন, তোমরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবে, আমরা পুরুষরা দু'একটা তো দূরের কথা দশ-বিশটা নারী উপভোগ করেও পরিপূর্ণ তৃপ্তিলাভ করি না।

নিধিরাম মিত্তির এক গাল হেসে বলেন, আপনি ঠিক মনের কথাটি বলেছেন।

ওহে নিধিরাম, আমাকে কোনদিন একটি বাজে কথা বলতে শুনেছ?

না, না, জীবনেও শুনিনি।

ইতিমধ্যে সূর্য অস্ত যায়। এক প্রবীণা ঝি এসে চণ্ডীমণ্ডপে প্রদীপ রেখে যায়। অন্দরমহলে শঙ্খ বেজে ওঠে।

অঘোর বসাক চোখ বুজে দু'হাত কপালে ঠেকিয়েই আপনমনে বলেন, মাগো, তুমি কৃপা করো এই অধম সন্তানকে।

অন্যান্যরাও দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে পরমেশ্বরের উদ্দেশে প্রণাম জানান।

ব্যস! সঙ্গে সঙ্গে দু'জন চাকর প্রত্যেকের হাতে সরবতের গেলাস তুলে দেয়।

গেলাসে চুমুক দিয়েই বলরাম পরম তৃপ্তির হাসি হেসে বলেন, আঃ! চমৎকার!

অঘোর বসাক সঙ্গে সঙ্গে চাপা হাসি হেসে বলেন, ওহে ভায়া, তোমাদের সাধারণ সিদ্ধির সরবত দেওয়া হয়নি। এই সরবতের এমন সব দ্রব্য মেশানো আছে যে তাদের গুণ রাত্তিরে বুঝতে পারবে।

নিত্যহরি আর নিধিরাম প্রায় একই সঙ্গে বলেন, বসাক, মশাই, রাত্তিরে কি হবে? কি হবে?

বসাক মশাই ভুরু নাচিয়ে বলেন, আজ রাত্তিরে স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করার সময় বুঝবে এই সরবতের কি গুণ।

সবার মুখেই খুশির হাসি ফুটে ওঠে।

এই সরবত নিত্য সেবন করি বলেই পাঁচ-পাঁচটা উপপত্নীকে মহানন্দে রেখেছি আর নিজেও মহানন্দে থাকি।

হঠাৎ বলরাম মুখুজ্যে বলেন, বসাক মশাই, আপনি তো বললেন না, কি করে স্ত্রী আর উপপত্নীদের সামলাচ্ছেন।

. হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলছি।

অঘোর বসাক স্নানাদি সেরে এক পেট লুচি-তরকারী আর মিষ্টি খেয়েই পাল্কি চড়ে সোজা গদিতে যান। কার কাছ থেকে কত সুতা আমদানী হলো, কোন কোন তাঁতিকে কত সুতা দেওয়া হলো, তাঁতিরা কে কত কাপড় এনেছে, কত কাপড কোথায় বিক্রি হলো, কত নতুন অর্ডার ইত্যাদি ছাড়াও কত টাকা জমা পড়লো আর কাকে কত টাকা দেওয়া হলো, তার পাই পয়সার হিসেব পর্যন্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন বসাক মশাই।

ম্যানেজারবাবু!

আজ্ঞে হ্যাঁ, বলুন।

কাল বিকেলে-সন্ধেয় কোনো সাহেব এসেছিল ধার চাইতে?

আজ্ঞে হ্যাঁ, চারজন সাহেব এসেছিল।

কে? কে?

দু'জন আমাদের পুরনো খদ্দের ; দু'জন নতুন।

বসাক মশাই মুখ তুলে তাকাতেই ম্যানেজারবাবু একটু হেসে বলেন, লেহ্যাম সাহেব আরো একটা মাগী রেখেছেন।

বেচারীরা সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে এদেশে এসেছে। বিয়ে করা বউ আসেনি ম্যালেরিয়া-কালাজ্বরের ভয়ে। তাই একটু-আধটু স্ফূর্তি না করে কি থাকতে পারে?

উনি সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন করেন, লেহ্যাম কত টাকা চেয়েছে?

আজ্ঞে দু'হাজার।

আগের টাকার সুদ ঠিক মত দিচ্ছে তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ ; কাল পাই পয়সা পর্যন্ত মিটিয়ে দিয়েছে।

তবে ম্যানেজারবাবু, একটা কথা মনে রাখবেন।

আজ্ঞে বলুন।

কোম্পানির কর্মচারী ছাড়া অন্য কোন সাহেবকে যেন এক পাই পয়সাও ধার দেওয়া না হয়।

তাই কি দিই!

যে দুই নতুন সাহেব ধার চাইছে, তারা কি কোম্পানির কর্মচারী?

একজন কোম্পানির রাইটার, অন্যজন ব্যবসা করে।

যে ব্যবসা করে তাকে ধার দেবেন না। আর হ্যাঁ, কখনই কাউকে এক সঙ্গে দু'হাজার টাকার বেশি ধার দেবেন না।

না, না, তা কখনই দেওয়া হয় না, হবেও না।

ব্যবসা-বাণিজ্য সামলে বসাক মশায়ের বাড়ি ফিরতে ফিরতে বেলা গড়িয়ে যায় মধ্যাহ্নভোজনের পর বিশ্রাম। দুটি দাসী হাত-পা টিপে দেয়। দিনের বেলায় বউদের কর্তার ঘরে আসা নিষেধ। দাসীদের সেবা নিতে নিতেই বসাক মশাই ঘুমিয়ে পড়েন ঘুম থেকে উঠে সেজেগুজে পাত্র-মিত্রদের নিয়ে আসর।

দু'এক ঘণ্টা নিছক আড্ডা আর রসালাপ। তারপরই পাল্কি চড়ে সোজা কোন না কোন উপপত্নীর কোলে নিজেকে সঁপে দেওয়া।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে মাঝরাত্তির গড়িয়ে যায়। ঘুম আর ক্লান্তিতে ঢুলতে ঢুলতে ঘরে ঢুকেই বিছানায় লুটিয়ে পড়েন।

বসাক মশাই বলেন, তোমরাই বলো, ছোট বউয়ের সঙ্গে ন্যাকামী বা ঢলাঢলি করার সময় কোথায় আমার?

দু'তিনজন মাথা নেড়ে বলেন, হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন।

নিত্যহরি ওদের সঙ্গে এক মত হতে পারলেন না। বলেন, কিন্তু বসাক মশাই, আপনার ছোট বউ তো বৃদ্ধা না, রোগগ্রস্তা না ; তিনিও যুবতী। তারও তো চাহিদা মেটাবার দায়িত্ব আপনার।

দেখো নিত্যহরি, ছোট বউকে যখন বিয়ে করি, তখন সে ষোড়শী। প্রথম বছর খানেক প্রত্যেক সপ্তাহে দু'একদিন সে আমার সঙ্গে সহবাস করেছে। সত্যি কথা বলতে কি বছর খানেক পরই ওর দেহে যৌবনের ঢল নামলো। আমি উপপত্নীদের কাছ থেকে ফিরে আসার পরও ওকে সোহাগ না করে ঘুমুতে পারতাম না।

নিত্যহরি প্রশ্ন করেন, তারপর কি নেশা কেটে গেল?

প্রশ্ন শুনে অঘোর বসাক বেশ বিরক্ত হয়েই বলেন, দেখো নিত্যহরি, বিয়ে করা বউদের ন্যাকামীতে আমার নেশা ধরে না।

কেন?

আরে দূর! দূর! ওরা পুরুষদের খুশি করতেই জানে না।

বসাক মশাই মুহূর্তের জন্য থেমে একটু হেসে বলেন, পুরুষদের খুশি কবার জন্য উপপত্নীরা যে কত রকমের ছলা-কলা-ঢং জানে, তা তুমি ভাবতে পারবে না। ওরা সত্যি পুরুষদের নেশা ধরিয়ে দেয়।

সবাই চুপ।

বসাক মশাই আবার হাসতে হাসতে বলেন, ওরে বাপু, বিয়ে করা বউদের চাইতে উপপত্নী বা রক্ষিতাদের কাছে অনেক বেশি আনন্দ পাওয়া যায় বলেই তো সমাজের সব গণ্য-মান্য বিত্তবানরা একাধিক উপপত্নী বা রক্ষিতা রাখেন।

উনি নিত্যহরির থুতনী ধরে বলেন, ওহে দু'একটা রক্ষিতা রাখো। দেহে-মনে অনন্ত বসন্ত বিরাজ করবে।

রক্ষিতা পোষা তো অনেক খরচের ব্যাপার।

নিশ্চয়ই খরচের ব্যাপার। শুধু ভাত-কাপড় দিয়ে বউ পোষা যায় ; রক্ষিতা রাখা যায় না। তেমন ভাল রক্ষিতা পোষা আর হাতি পোষা একই ব্যাপার কিন্তু যে মধু, যে রস, যে আনন্দ উপভোগ করা যায়, তা কোন বিয়ে করা বউয়ের কাছে কোনকালে কেউ পায়নি।

হাসতে হাসতে অঘোর বসাক আবার তাকিয়ায় হেলান দেন। নিত্যহরি সঙ্গে সঙ্গে বলেন, আপনি আসল কথাটাই তো বললেন না।

কোন কথা?

আপনি উপপত্নী নিয়ে মহাসুখে দিন কাটাচ্ছেন কিন্তু ছোট বউ কিভাবে.....

ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই বসাক মশাই বেশ গম্ভীর হয়ে বলেন, কেন, ব্রজ তো আছে।

কে ব্রজ?

আমার মেজ পিসিমার সেজ ছেলের খুড়তুতো শালার দূর সম্পর্কের আত্মীয়। অতীব দরিদ্র পরিবারের ছেলে। বাড়িতে খাওয়া-পরার কষ্ট পাচ্ছিল। তাই ওকে নিয়ে এসে বাড়িতে রেখে দিলাম।

গরীবের ছেলেকে বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছেন, সে তো ভাল কথা কিন্তু ও করে কি?

ছোট বউয়ের ফাই-ফরমায়েস খাটে। ওর কথা মতো আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি যায় খোঁজ খবর নিতে-দিতে ; ময়রার দোকান থেকে মিষ্টি এনে দেয়। আবার কখনও স্যাকরাকে খবর দেয়, ছোট বউয়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য।

এতেই ছোট বউ খুশি?

বলরাম মুখুজ্যে প্রশ্ন করেন, ছোকরার বয়স কত?

বসাক মশাই বলেন, ভাল-মন্দ খেয়েদেয়ে আঠারো বছরের ব্রজ এখন তাগড়া জোয়ান।

উনি ঠোঁটের কোণে হাসি চেপে পাত্র-মিত্রদের বলেন, ব্রজ এখন ছোট বউয়ের বড় পেয়ারের পাত্র।

সবার মুখেই চাপা হাসি।

বসাক মশাই চাপা হাসি হাসতে হাসতেই বলেন, ওহে নিত্যহরি, বাড়িতে একটা ব্রজ আমদানী করো। দেখবে বউরা আর মারামারি কাটাকাটি করছে না।

তিন

নকু সরকার ছিলেন মিঃ পার্কারের 'মুন্সী'। তবে সাহেবরা মুন্সীকেই বলতো সরকার। তাইতো সবার কাছে নকু দত্ত পরিচিত হলেন নকু সরকার বলে।

নকু দত্ত'র আসল নাম ছিল নিকুঞ্জ দত্ত। মিঃ পার্কার আর মেমসাহেব বেশ কয়েক মাস চেষ্টা করেও নিকুঞ্জ উচ্চারণ করতে পারলেন না। অথচ বাড়ির সরকারকে তো মিঃ দত্ত বলা যায় না। এত সম্মান পাবার উপযুক্ত সে না।

নিকুঞ্জ প্রথমে হলেন নিকু ; তারপর নকু।

পার্কার সাহেব তখন শুধু কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারী না, বিখ্যাত ব্যবসাদারও। আয় করেন দু'হাতে না, দশ হাতে। তা না হলে চৌরঙ্গীর অত বড় কুঠীতে বাস করা ছাড়াও অত কর্মচারী রাখতে পারেন? খানসামা, খিদমদগার, বাবুর্চি, দ্বারোয়ান, হরকরা, কচুয়ান, সহিস, মশালচি, সর্দার বেয়ারা, সহকারী বেয়ারা, পাংখা বেয়ারা, মেথর, ভিস্তি ও আবদার। এদের উপরে সরকার।

শুরুতেই নকু দত্ত'র মাইনে হলো কুড়ি টাকা।

কুড়ি টাকা?

শুনেই মাথা ঘুরে যায় আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব প্রতিবেশীদের।

শুধু কি মাইনে?

সাহেব-মেমসাহেবের সব কেনাকাটায় টাকায় দু'আনা দস্তুরি।

অর্থাৎ সাড়ে বারো পার্সেন্ট!

চাল-ডাল-নুন-তেল, পাঁঠার মাংস-গরুর মাংস-শূয়োরের মাংস-মুরগির মাংস, সাহেবের কোট-প্যান্ট-জামা-জুতো-হ্যাট, মেমসাহেবের গাউন, গাউনের নীচে পরার জন্য নেটের টেপ, মোজা-জুতা ইত্যাদি থেকে চেয়ার-টেবিল-আলমারি-পালঙ্ক ছাড়াও আরো কত কি কেনা হতো সাহেব-মেমসাহেবের হুকুম মতো। এই সবকিছু কেনাকাটায় সাড়ে বারো পার্সেন্টি!

আঃ! নকু সরকার আনন্দে ধেই ধেই করে নাচে।

কলকাতায় বছরখানেক থাকার পরই মিসেস পার্কার প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত কোম্পানির ডাক্তারের পরামর্শে মেমসাহেবকে বিলেতে পাঠিয়ে দিলেন মিঃ পার্কার।

পার্কার সাহেব মহা চিন্তায় পড়লেন, রাত কাটবে কিভাবে? নিজের দেশ, নিজের

সমাজ, নিজের স্ত্রীকে ছেড়ে এত দূর দেশে কি একলা একলা রাত কাটানো যায়?

অসম্ভব।

কয়েকদিন পরই খবর পেলেন পার্কার সাহেবের প্রিয় বন্ধু ও মুর্শিদাবাদের রেসিডেন্ট মিঃ সেটান। উনি সঙ্গে সঙ্গে চিঠি লিখলেন প্রিয় বন্ধুকে।

ডিয়ার হ্যারল্ড, তুমি বোকা বলেই এদেশে স্ত্রীকে এনেছিলে। আমাদের দেশের কোন মেয়েই এখানে সুস্থ থাকতে পারে না। আবার অসুস্থ হলে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করাও যায় না এ দেশে। কোম্পানির দু' একজন ডাক্তার ছাড়া এখানে আর কোন ডাক্তার নেই। যাইহোক তুমি স্ত্রীকে দেশে পাঠিয়ে সত্যি বুদ্ধিমানের পরিচয় দিয়েছ।....

....এদেশে আমাদের মত ইংরেজদের সঙ্গে রাত কাটাতে উৎসুক মেয়ে আছে হাজার হাজার। আমি নিজে আমার আনন্দের জন্য আমার কুঠীতে পনের-ষোলটি মাগীকে রেখেছি। আমি এক একদিন এক একটি বা দুটি মাগীকে নিয়ে রাত কাটাই এবং আমি হলপ করে বলছি, এইসব মাগীদের সঙ্গে রাত কাটিয়ে আমি সত্যি আনন্দিত হই। এছাড়া নবাব বাড়ি থেকে মাঝে মাঝে আমার আনন্দের জন্য দু' একটি সুন্দরী যুবতীও পাঠানো হয়। দু'তিন রাত উপভোগের পর আমি ওদের আবার নবাব বাড়িতে পাঠিয়ে দিই।

যাইহোক গতকালই আমার কুঠীতে তিন-চারটে নতুন মেয়ে এসেছে। আমি তোমার আনন্দের জন্য দুটি মাগীকে পাঠাতে চাই। এখানকার কোন কর্মচারীকে আমি বিশ্বাস করি না। তুমি সত্বর তোমার একজন বিশ্বস্ত কর্মচারীকে এখানে পাঠাও। সে এখানে দু'জনকে পছন্দ করবে, আমি আমার নৌকা করে তোমার কর্মচারী ও মেয়েদের তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব।

আমার একান্ত বিশ্বাস, এই মেয়েদের উপভোগ করে তুমি আনন্দেই থাকবে।....

বন্ধুর চিঠি পড়েই পার্কার সাহেব হুঙ্কার দেন, সর্দার বেয়ারা!

জী সাহেব!

সর্দার: নকুকে জলদি বুলাও!

নকু সরকার ছুটে এসেই সেলাম দিয়ে বলেন, সার, ইওর মোস্ট ওবিডিয়েন্ট সারভেন্ট হাজির।

নকু, রিড দিস লেটার। চটপট চিঠিটা পড়ো।

সাহেবের হাত থেকে চাবিটা নিয়েই নকুর মুখ শুকনো হয়ে যায়। বলে, সার, লেটার ইংলিশ! স্লো! স্লো!

ঠিক হ্যায়!

চিঠিটার উপর দিয়ে চোখ বুলাতে বুলাতে নকু সরকার গার্লস, বিউটিফুল, নাইট. এনজয়মেন্ট ইত্যাদি শব্দ দেখেই এক গাল হেসে বলে, ভেরি ভেরি গুড লেটার। ভেরি হ্যাপি লেটার।

নকু!

ইয়েস হাজির!

তুমি কাল সকালেই মুর্শিদাবাদ স্টার্ট করো। আমার চিঠি নিয়ে আমার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করবে। তারপর ওখানে দু'তিন দিন থেকে ভাল করে দেখেশুনে দুটো সুন্দরী মাগীকে নিয়ে আসতে পারবে?

ইয়েস, ইয়েস, সী গার্লস, ব্রিংগ টু।

দ্যাটস রাইট।

পার্কার সাহেব সঙ্গে সঙ্গে বলেন, তুমি ছাড়া অন্য কোন কর্মচারীকে বিশ্বাস করি না বলেই তোমাকে মুর্শিদাবাদ পাঠাচ্ছি। তবে হ্যাঁ, যদি আজেবাজে মাগীকে পছন্দ করে আনো, তাহলে আমি তোমাকে লাথি মেরে দূর করে দেব।

নকু এক গাল হেসে বলে, ভেরি, গুড সার!

মিঃ স্টোন বন্ধুর চিঠি পড়েই একজন কর্মচারীকে হুকুম করলেন, সরকারকে গেস্ট হাউসে নিয়ে যাও। ওখানকার কর্মচারীদের বলে দিও, ওনার যেন কোন কষ্ট বা অসুবিধা না হয়।

জী হুজুর।

এখন তো উনি বিশ্রাম করবেন। তাই সন্ধের পর ওনাকে যেন জেনানা মহলে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর উনি কয়েকজনকে নিয়ে গেস্ট হাউসে যাবেন।

জী হুজুর।

এবার মিঃ স্টোন নকু সরকারকে বলেন, আপনি দু'তিন দিন মেয়েদের ভাল করে দেখে, কথা বার্তা বলে যে দু'জন মেয়েকে আপনার মনে হবে, আমার বন্ধুর পছন্দ হবে, তাদের নিয়ে যাবার ব্যবস্থা আমি করব।

সার, ইউ ভেরি গুড! ভেরি ভেরি কাইন্ড!

ইয়েস, গো!

গেস্ট হাউস দেখে তো নকু সরকারের চোখ ছানাবড়া। ঘর দেখেই ওর মনে

হয়, এটা নিশ্চয়ই নবাব সিরাজদ্দৌলার ঘর ছিল। তা না হলে এত সাজানো-গুছানো হয়?

জনাব, সরবত!

নকু সরকার সরবত খাবে কি! যে মেয়েটি সরবত দিতে এসেছে, তাকে দেখেই মন-প্রাণ জুড়িয়ে যায়।

নকু এক গাল হেসে বলে, তোমার নাম কি?

সেলিনা।

বাঃ! খুব সুন্দর নাম।

সেলিনা শ্বেত পাথরের টেবিলের উপর সরবতের গেলাস রাখতেই নকু বলে, তুমি আবার কখন আসবে?

আপনি যখন হুকুম করবেন, আমি তখনই আসব।

ও মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, আপনার যাতে কোন কষ্ট না হয়, তা আমি দেখব। আপনি যা হুকুম করবেন, আমি তাই করব।

নকু ডান হাত দিয়ে ওর গাল টিপে এক গাল হেসে বলে, আমি যা বলব, তাই করবে?

জরুর করব। আপনি সাহেবের মেহেমান আছেন। আপনার সেবা-যত্ন করা, আপনার হুকুম তামিল করার জন্যই তো আমি আছি।

খুব ভাল, খুব ভাল। কিন্তু আমি তোমাকে ডাকব কি করে?

আমি তো ঐ জালির ওপাশেই থাকব। আপনি হাতে একটু তালি দিলেই আমি হাজির হবো।

আমি সরবত খেয়ে হাত-মুখ-ধুয়ে আসি। তারপর তুমি আমার একটু সেবা করবে।

জী হুজুর।

সেলিনা সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন করে, আপনি কি বিকেলেব দিকে কোথাও বেড়াতে যাবেন?

না।

আপনি সন্ধের সময় তো জেনানা মহলে যাবেন?

হ্যাঁ।

নকু সঙ্গে সঙ্গে বলে, তুমি জানো কেন আমি জেনানা মহলে যাব?

আপনি পছন্দ করে দুটো লেড়কী নিয়ে যাবেন সাহেবের দোস্তের জন্য।

দেখছি, তুমি সবই জানো।

জেনানা মহলের সব লেড়কীই সুন্দর।

নকু আবার সেলিনার গাল টিপে বলেন, তোমার মত সুন্দর তো ওরা হবে না.

ও একটু সলজ্জ হাসি হেসে বলে, আমি আবার সুন্দর নাকি?

আমি অন্তত তোমার চাইতে সুন্দর মেয়ে দেখিনি। তুমি ভারী সুন্দর। ভারী মিষ্টি মেয়ে।

আপনি শরবত খেয়ে হাত-মুখ ধুয়ে এসে আমাকে ডাকবেন। আমি আপনার সেবা করব।

হ্যাঁ, নকু সরকার হাত-মুখ ধুয়ে এসে তালি বাজাতেই সেলিনা এসে হাজির হয়। বলে, হুজুর, আপনি শুয়ে পড়ুন। আমি আপনার সেবা করছি।

সেলিনা ওর নরম হাত দিয়ে গা-হাত-পা টিপে দিতেই নকু সরকারের সব ক্লান্তি যেন দূর হয়ে যায়। চোখ বুজে আসে। চোখ বন্ধ করেই বলে, সেলিনা, সত্যি খুব ভাল লাগছে।

আপনার ভাল লাগছে শুনে আমারও ভাল লাগছে।

রাত্তিরে তুমি কি আমার কাছে থাকবে?

আপনি হুকুম করলে জরুর থাকব।

সেলিনা মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, আপনাদের মত মেহেমানদের খুশি করার জন্য এখানে আরো লেড়কী আছে। আপনি তাদেরও কাউকে পছন্দ করলে, সেও রাত্রে আপনার কাছে থাকবে।

না, না, অন্য কেউ না ; তুমিই আমার কাছে থাকবে। তুমি আমার কাছে থাকলে আমি খুব খুশি হবো।

আমিও আপনাকে খুশি করার চেষ্টা করব।

সেলিনাকে কাছে টেনে জড়িয়ে ধরে একটু আদর করে নকু সরকার বলে. এখন তুমি বিশ্রাম করতে যাও। আমি জেনানা মহল থেকে ঘুরে এলে তোমাকে ডাকব।

নকু সরকার জেনানা মহলে পৌঁছতেই একজন বয়স্কা মহিলা ওকে অভ্যর্থনা জানায়, আদাব। হুজুর ভিতরে চলুন।

পাশের একটা ঘরে নকু সরকারকে বসতে দিয়েই ঐ মহিলা বলেন. হুজুর, আমার এখানে এখন উনিশটি মেয়ে আছে। সবাই সুন্দরী, সবাই যুবতী। আপনি এদের সবাইকে দেখুন। তারপর আপনার পছন্দমতো কয়েকজনকে পরীক্ষা করে দেখে....

নকু সরকার ওর কথার মাঝখানেই একটু চিন্তিত হয়ে বলে, পার্কার সাহেব আমাকে হুকুম করেছেন, মেয়েদের শরীর খুব ভাল করে দেখতে ; মেয়েদের যেন কোন ইস্‌কিন রোগ না থাকে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝেছি।

ঐ মহিলা গম্ভীর হয়ে বলেন, কোন অত্যন্ত সুন্দরী মেয়ের শরীরের কোথাও যদি সামান্য চুলকানিও থাকে, তাহলে সাহেবরা তাকে একবার ছুঁয়েও দেখবে না।

ইয়েস, ইয়েস, ঠিক বলেছেন।

আগে আপনি সব মেয়েদের দেখুন। আমাকে বলবেন, কোন মেয়েদের আপনি পরীক্ষা করে দেখতে চান। তারপর আপনাকে একটা ঘরে বসিয়ে আমি একটি করে মেয়ে পাঠাব।

হ্যাঁ, ঠিক আছে। আমি ওদের দেখব, কথাবার্তা বলব কিন্তু সারা শরীর পরীক্ষা করে দেখতে পারব না।

ঐ মহিলা একটু হেসে বলেন, কেন লজ্জা করবে?

হ্যাঁ, লজ্জা তো করবেই। আমার দ্বারা ওকাজ হবে না।

নকু সরকার সঙ্গে সঙ্গে বলে, ওদের শরীর-টরির আপনিই পরীক্ষা করে দেখবেন কারুর কোন ইস্‌কিন রোগ আছে কিনা।

আপনি যখন বলছেন, তখন আমিই দেখব।

জেনানা মহলের মেয়েদের দেখে নকু সরকারের মাথা ঘুরে যায়। সবাই এক একজন অপ্সরী। এদের মধ্যে কাদের পছন্দ করবেন আর কাদের বাতিল করবেন, তা ভেবে কূলকিনারা পায় না নকু সরকার। তবু চার-পাঁচজনকে নকু আলাপ করে দেখে। টুকটাক কথাবার্তা বলে। একটু-আধটু গায় হাত দিয়েও দেখে।

তারপর ঐ বয়স্কাকে বলে, বুঝতেই তো পারছেন সাহেবের ব্যাপার। আপনি যে দু'জনকে পছন্দ করবেন, আমি তাদেরই কলকাতায় নিয়ে যাবো।

ঠিক আছে, আমি পছন্দ করব কিন্তু আপনিও ওদের সঙ্গে দুটো রাত কাটিয়ে দেখুন.....

নকু সরকার জিভ কামড়ে বলে, ইস! তাই কি সম্ভব?

কেন?

সাহেব যাদের নিয়ে রাত কাটাবেন, আমি কি তাদের সঙ্গে রাত কাটাতে পারি?

বয়স্কা মহিলা একটু হেসে বলেন, দেখছি, আপনি নিতান্তই সাধুপুরুষ।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমেই আবার বলেন, রাত না কাটালেও ওদের সঙ্গে দু'এক ঘণ্টা কথাবার্তা বলবেন।

তা বলতে পারি।

আজ রাত্রে কি একজনকে পাঠাব?

না, না, আজ না ; কাল বিকেল-সন্ধের দিকে পাঠাবেন।

ঠিক আছে, তাই পাঠাব।

রাত্রের খাওয়া-দাওয়া সেরে নকু সরকার চাঁদের আলোর গঙ্গার শোভা দেখছিলেন আর মনে মনে ভাবছিলেন সারাদিনের কথা। কোম্পানির সাহেবরা কি স্ফূর্তিতেই দিন কাটাচ্ছে! বোধহয় রাজা-বাদশারাও এত সুখে আনন্দে দিন কাটান নি।

হুজুর, আমি হাজির।

নকু সরকার ঘুরে দাঁড়িয়ে সেলিনাকে অপূর্ব সুন্দর জালি কাপড়ের পোশাক পরা দেখেই ওকে জড়িয়ে ধরে।

হুজুর, জেনানা মহলের কোন লেড়কী কি রাত্রে আপনার কাছে থাকবে?

না, না, আমি বারণ করেছি। তুমি আমার কাছে সারারাত থাকবে।

জরুর থাকব।

চলো, ঘরে যাই। আগে তোমার সঙ্গে একটু গল্প করি।

চলুন।

ঘরে এসে নকু সেলিনাকে নিবিড়ভাবে কাছে টেনে নিয়ে প্রশ্ন করে, তুমি যেমন আমার সেবা-যত্নের জন্য রয়েছ, অন্য অতিথিদের জন্যও কি অন্য মেয়েরা আছে?

হ্যাঁ, হুজুর, সব অতিথিদের জন্যই এইরকম ব্যবস্থা আছে।

যদি কোন মেয়ে অতিথি আসে?

হ্যাঁ, তাদের জন্যও কয়েকটা লেড়কা আছে।

নকু অবাক হয়ে বলে, ঐ ছেলেরা মেয়ে অতিথিদের সেবা-যত্ন করে?

হ্যাঁ, করবে না কেন?

সেলিনা মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, কোম্পানির এক বড় সাহেবের মেয়ে এসেছেন বেড়াতে। এখানেই আছেন। তাকে তো সফী সেবা-যত্ন করছে এক সপ্তাহ ধরে।

বলো কি?

হুজুর, অবাক হচ্ছেন কেন?

ও না থেমেই বলে, আমি যদি আপনার সেবা করতে পারি, তাহলে সফী ঐ মেমসাহেবের সেবা করবে না কেন?

হ্যাঁ, তা ঠিক কিন্তু...

সেলিনা একটু হেসে বলে, ঐ মেমসাহেব তো সফীকে নিয়ে তিন রাত নৌকা-বিহার করে এলেন। সফীকে মেমসাহেবের খুব পছন্দ।

নকু সরকার মনে মনে ভাবে, এ তো দেখছি স্বর্গরাজ্য!

দু' এক মিনিট চুপ করে থাকার পর নকু বলে, আচ্ছা সেলিনা, কোম্পানির সাহেবরাই কি অতিথিদের সেবা-যত্নের জন্য এইসব ছেলে-মেয়ের ব্যবস্থা চালু করেছে?

না, হুজুর ; নবাবের আমলের বিধিব্যবস্থাই কোম্পানির সাহেবরা চালু রেখেছে।

যাইহোক সেলিনাকে নিয়ে তিন রাত্তির স্বর্গ-সুখ উপভোগের পর নকু সরকার দুটি পরমা সুন্দরী যুবতী মাগীকে নিয়ে কলকাতা যাত্রা করে।

পার্কার সাহেব ঐ দুটি মাগীকে নিয়ে এক রাত কাটিয়েই মহানন্দে ঘোষণা করেন, নকু, দুটো মাগীই অসাধারণ। আয়াম ভেরি হ্যাপি। আমি তোমাকে পুরস্কার দিবে।

সার, ইওর মোস্ট ওবিডেয়েন্ট সার্ভেন্ট ভেরি হ্যাপি!

মিঃ পার্কার তখন কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছাড়াও দু'টি ব্যবসা করতেন। এক-ফোর্ট উইলিয়ামের সেনাদের সব প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করা ; অন্য ব্যবসা ছিল বিলেতগামী জাহাজগুলিতে সব রকমের খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করা।

ইউ ব্লাডি নকু!

সার, ইওর ব্লাডি নকু হাজির।

এবার থেকে জাহাজের সব সাপ্লাই তুমি দেবে।

আমি! মাই কান নো বিশ্বাস। প্রভু, সত্যি বলছি, নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছি না।

ইয়েস নকু, জাহাজের সাপ্লাই ব্যবসা তোমাকে দিয়ে দিলাম।

নকু সরকার আনন্দে কৃতজ্ঞতায় পার্কারের পায লুটিয়ে পড়ে বলে, গড জেসাস ওড ইউ। আমি বলছি ভগবান যীশু আপনার নিশ্চয়ই ভাল করবেন।

দ্যাটস রাইট! এখন পা ছাড়ো।

নকু সরকার আনন্দে খুশিতে প্রায় ধেই ধেই করে নাচতে নাচতে বাড়ি যায় কিন্তু কাউকে কিছু বলে না। খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ে। একটু পরে স্ত্রী পাশে এসে শুতেই মেজাজ বিগড়ে যায়। বলে, একটু সরে শোও।

আজ আপনার হলো কি? অন্য দিন তো...

আঃ! বাজে বকো না।

সেলিনাকে নিয়ে তিন রাত্তির স্বর্গসুখ উপভোগের পর এই স্ত্রীর পাশে শুতেও ঘেন্না করে নকু সরকারের। অনেক রাত পর্যন্ত শুধু সেলিনার কথাই চিন্তা করে।

নকু মনে মনে ঠিক করে, যেভাবেই হোক আবার সেলিনার কাছে যেতেই হবে।

পরের দিন সকালে সাহেবের সঙ্গে দেখা হতেই নকু হাত কচলে বলে, সার, ইওর মোস্ট ওবিডিয়েন্ট সার্ভেন্টের একটা নিবেদন আছে।

ইয়েস নকু টেল মী।

মুর্শিদাবাদের দুটো মাগীকে পেয়ে আপনি যখন খুবই খুশি হয়েছেন, তখন স্টোন সাহেবকে আপনার কিছু উপহার পাঠানো উচিত।

দ্যাটস রাইট নকু! তুমি ঠিক বলেছ।

আপনি হুকুম দিলে আমি মুর্শিদাবাদে গিয়ে আপনার উপহার স্টোন সাহেবকে দিয়ে আসতে পারি।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমিই যাবে ; আবার কাকে পাঠাব।

মিঃ পার্কার দু'এক মিনিট পর বলেন, আমি নিজে দু'একদিনের মধ্যে উপহারগুলো কিনব। তারপর তুমি মুর্শিদাবাদ যাবে।

সার, জেনানা মহলের যে হেড মাগী আপনার মাগীদের প্রথম পছন্দ করে, তাকেও কিছু...

ওকে কিছু টাকা দিয়ে দিও।

সাহেব, আরো একটা নিবেদন আছে।

আবার কি নিবেদন?

সাহেব, মুর্শিদাবাদে অনেক কিছু দেখার আছে। গতবার তো ভীষণ ব্যস্ত ছিলাম; কিছুই দেখার সময় পাইনি। এবার...

অলরাইট! তুমি ওখানে এক উইক বা দশদিন থেকো। আমি স্টোনকে লিখে দেব তোমার সব ব্যবস্থা করার জন্য।

সাহেব, আপনি ভেরি গুড।

লুক হিয়ার নকু, তুমি মুর্শিদাবাদ থেকে ফিরে এসেই জাহাজের সাপ্লাই ব্যবসা শুরু করবে।

প্রভু, আই নো মানি। ব্যবসা করার মত টাকা আমার নেই।

আই উইল গিভ ইউ মানি। তারপর তোমার টাকা হলে আমাকে ফেরত দিয়ে দেবে।

সার, ভেরি গুড: ভেরি গুড!

যাইহোক কালে কালে এই নকু সরকার কোম্পানির নানা সাহেবদের কৃপায় বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্য করে প্রভূত অর্থ ও বিপুল সম্পত্তির মালিক হন। শুধু তাই না। ইনি কলকাতা শহরের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি বলেও সম্মানিত হতেন। ইনি লাটসাহেবের বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে যেতেন ; আবার লাটসাহেবও নকু সরকারের বেলগাছিয়ার বাগান বাড়িতে কাশীর বিখ্যাত বাঈজী জাহানারার নাচ দেখতে আসতেন। রাজা রাধাকান্ত দেব ও পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবারের সঙ্গেও ইনি নিত্য ওঠা-বসা করতেন। তবে অনেকে নকু সরকারের মুখদর্শন করতেও ঘেন্নাবোধ করতেন।

নকু সরকারের বসবাসের জন্য আহিরীটোলায় যে বিশাল প্রাসাদ তৈরি করেন, তার প্রবেশপথে পাথরের ফলকে লেখা আছে 'দত্ত ভিলা' কিন্তু আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বলে নকু সরকারের বাড়ি।

নকু সরকার অত্যন্ত বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। দশ-বারোটি রক্ষিতা রাখলেও বিবাহিতা স্ত্রী ছিল একজনই। এই স্ত্রীর গর্ভে তার দুটি পুত্রের জন্ম হয়; তাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ হচ্ছেন অনুকূলচন্দ্র ও কনিষ্ঠ হচ্ছেন নকুলচন্দ্র। অনুকূল বসবাস করেন আহিরীটোলার দত্ত ভিলায় ; নকুল চন্দ্র বসবাস করেন বিডন স্ট্রীটের নিকুঞ্জ ভিলায়। আলাদা বাড়িতে বসবাস করলেও যৌথ পরিচালনায় শুধু পৈতৃক ব্যবসা-বাণিজ্যই না, আরো অনেক নতুন ব্যবসা অত্যন্ত ভালভাবেই চলছে।

ওরা দু'জনেই সুখে-শান্তিতে সংসারজীবন যাপন করছেন। তবে হ্যাঁ, দু'জনেরই রক্ষিতা আছে। দু'ভাইয়ের সুখ-আনন্দ দু'রকমের। অনুকূলচন্দ্রের দত্ত ভিলায রোজ সন্ধ্যাকালীন একটা আসর বসতো। সে আসরে নানা ধরনের মানুষ আসতেন ; আলাপ-আলোচনাও হতো বিচিত্র বিষয়ে। এই আসরের পর বৌবাজারের বাঈজী বাড়িতে নাচ দেখে অনুকূলচন্দ্র যেতেন রক্ষিতার কাছে। নকুলচন্দ্রের সখ ছিল কোম্পানির সাহেবদের সঙ্গে আড্ডা দিতে দিতে মদ্যপান করা ও মাঝে-মধ্যে শিকারে যাওয়া।

অন্যান্য দিনের মত সেদিনও অনুকূলচন্দ্রের আসরে নানাজনের আগমন হয়েছে। আলোচনা হচ্ছে লাট সাহেবের নতুন প্রাসাদ নিয়ে।

একজন বলেন, শুনছি, ইংলন্ডেশ্বর স্বয়ং ভারত সম্রাটের প্রাসাদও বুঝি এত বিশাল না।

অনুকূলচন্দ্র মৃদু হেসে বলেন, না, না ; মহামান্য ইংলন্ডেশ্বরের বাকিংহাম আরো

অনেক বড়।

নগেন ঘোষ এক গাল হেসে বলেন, ভাই অনুকূল, এই প্রাসাদের যেদিন উদ্বোধন হয়, সেদিন নিশ্চয়ই তুমি আমন্ত্রিত ছিলে?

মহামান্য বড়লাট বাহাদুর লর্ড ওয়েলসলি এই গত আঠার শ' দুই সালের চৌঠা মে এই প্রাসাদে প্রথম প্রবেশ করেন। সেদিন ওখানে শ্রীরঙ্গপত্তমের বিজয় উৎসব মহা সমারোহে উদযাপিত হয়।

নগেন ঘোষ ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করেন, শ্রীরঙ্গপত্তমে আবার কি হয়েছিল?

অনুকূলচন্দ্র একটু হেসে বলেন, ওহে বন্ধুবর, টিপু সুলতানের পরাজয় ও মৃত্যুর জন্যই ঐ বিজয় উৎসব হয়।

তাই নাকি?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

উনি না থেমেই বলেন, আমি ঐদিন না গেলেও মহামান্য ইংলন্ডেশ্বরের জন্মদিনের উৎসবে যোগ দিতে ঐ প্রাসাদে প্রত্যেক বছরই যাই।

তুমি তো যাবেই।

নগেন ঘোষ হাসতে হাসতে বলেন, লাট সাহেবের বাড়িতে তো আর আমার মত চুনোপুঁটির নেমন্তন্ন হবে না।

ঠিক সেই সময় চক্কোত্তি মশায়ের প্রবেশ।

অনুকূলচন্দ্র তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানান, আরে চক্কোত্তি মশাই, আসুন, আসুন।

চক্কোত্তি মশাই আসন গ্রহণ করতেই উনি বলেন, আপনার মত সৎ ও শাস্ত্রোজ্ঞ ব্রাহ্মণের দর্শন পাওয়াও তো ভাগ্যের কথা।

না, তা বলবেন না ; তবে পিতা-পিতামহদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে স্মৃতিশাস্ত্রের চর্চা করেছি ও শাস্ত্রের নির্দেশ মেনেই জীবন অতিবাহিত করছি।

চক্কোত্তি মশাই মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, অজ্ঞানে কি করেছি, বলতে পারব না কিন্তু সজ্ঞানে কোন যজমান বা শিষ্যকে শাস্ত্রের সঠিক নির্দেশ দিতে ত্রুটি করি না।

হঠাৎ নগেন ঘোষ হাসতে হাসতে বলেন, চক্কোত্তি মশাই, কাঁধের সিল্কের চাদরটি নতুন মনে হচ্ছে।

চক্কোত্তি মশাইও এক গাল হেসে বলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, নতুন ; পরশুই প্রাপ্তিযোগ হয়েছে।

চাদরটিতে হাত দিয়েই নগেন ঘোষ বলেন, এ তো খুব দামী চাদর। কোন শিষ্য এটা দিল?

গতকাল মানিকতলার ঘোষাল বাড়ির বড়কর্তার পরলোক গমন হয়। তাঁর স্ত্রী সতী হলেন বলে এই চাদর ছাড়াও একটি শাড়ি, একটি ধুতি ও সাড়ে তের টাকা দক্ষিণা লাভ হয়েছে।

দু'তিনজন একসঙ্গে চিৎকার করে ওঠেন, সাড়ে তের টাকা দক্ষিণা?

ধনী বা সম্ভ্রান্ত পরিবারের কেউ সতী হলে সাড়ে তের টাকাই দক্ষিণালাভ হয়; তবে সাধারণ পরিবারে সতী হলে দু'তিন টাকা থেকে পাঁচ-সাত টাকা পাই।

অনুকূলচন্দ্র মৃদু হেসে বলেন, চক্কোত্তি মশাই, সতীর দক্ষিণাতেই বোধহয় আপনার সংসারের বারো আনা খরচ উঠে যাচ্ছে।

হ্যাঁ, তা বলতে পারেন কিন্তু কতদিন এই দক্ষিণা পাবো, তার তো ঠিক নেই।

কেন পাবেন না?

কাল এই কলকাতা শহরে কি কাণ্ড হয়েছে, তা জানেন না?

অনুকূলচন্দ্র বেশ উদগ্রীব হয়ে প্রশ্ন করেন, কাল এখানে কি হয়েছে?

যা হয়েছে তা নিন্দা করার ভাষা আমার জানা নেই। শুধু জানি, সতী হওয়া শাস্ত্রের নির্দেশ, পরম পবিত্র ব্যাপার।

আরে চক্কোত্তি, আসল ঘটনাটা বলুন।

হুগলীর রাধানগরের রামকান্ত রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র জগমোহন গতকাল অতি প্রত্যূষে মারা যান। তাই তাঁর স্ত্রীকে সতী হবার জন্য স্বামীব চিতায় শুইয়ে দেবার পরই রামকান্তর কনিষ্ঠ পুত্র রামমোহন প্রতিবাদে ফেটে পড়ে।...

কিসের প্রতিবাদ?

সতী হবার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

বলেন কি?

দত্তমশাই, রামমোহন চিতায় আগুন দিতেও যে কি বাধা দিচ্ছিল, তা আপনি কল্পনা করতে পারবেন না।

এই শাস্ত্রীয় কাজে ওর আপত্তির কারণ কি?

ছোকরা উন্মাদের মত চিৎকার করে বলছে, জীবন্ত মানুষকে পুড়িয়ে মারা চলবে না। আদিম যুগের এই বর্বরতা আমি সহ্য করব না।

অনুকূলচন্দ্র সোজা হয়ে বসে বলেন, কি আশ্চর্য! সতী হওয়া বর্বরতা?

আসরের সবাই প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠেন।

কেউ বলেন, ছোকরা হিন্দুর ঘরে জন্মে হিন্দুধর্মের বিরোধিতা করার সাহস কোথায় পায়?

আবার কেউ বলেন, ও হতচ্ছাড়া কি ম্লেচ্ছ ধর্ম গ্রহণ করেছে?

নগেন ঘোষ বললেন, এই বিধর্মী ছোকরাটাকেও সতীর সঙ্গে পুড়িয়ে মারা উচিত ছিল।

অনুকূলচন্দ্র একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, কুলীন কায়স্থ পরিবারে যদি এই ঘটনা ঘটতে পারে, তাহলে...

চক্কোত্তি মশাই ওনার কথার মাঝখানেই বলেন, না, না, ওরা কায়স্থ না ; ওরা বাঁড়ুজ্যে বামুন। নবাব বাহাদুরের আমলে ওরা রায় উপাধি পায়।

আপনি ঠিক জানেন?

চক্কোত্তি মশাই একটু হেসে বলে, আমাদের এক জ্ঞাতি পরিবারের বাড়িও তো ঐ রাধানগর গ্রামে।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, আমি নিজেও একাধিকবার ঐ গ্রামে গিয়েছি।

ঐ ছোকরা রামমোহনের সঙ্গে আপনার আলাপ আছে?

আজ্ঞে না।

তার মানে ওর বিষয়ে বিশেষ কিছু জানেন না?

খুব বেশি কিছু জানি না ; তবে শুনেছি, রামমোহন অসম্ভব মেধাবী, সুপণ্ডিত ও বড্ড একগুঁয়ে।

নগেন ঘোষ মন্তব্য করে, ও ছোকরা যতই মেধাবী বা পণ্ডিত হোক, সনাতন হিন্দুধর্মকে তো উল্টে দিতে পারবে না।

অনুকূলচন্দ্র বলেন, চক্কোত্তি মশাই, রামমোহনের ব্যাপারে বিশদ খোঁজখবব কোথায় কার কাছে পাওয়া যায় বলতে পারেন?

আমাদের জ্ঞাতি শীতলাচরণ ওদের সব খবর রাখে। আপনি বললে আমি কালকেই ওকে আপনার এখানে আনতে পারি।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, চক্কোত্তি মশাই, অবশ্যই শীতলাচরণকে কাল এখানে আনবেন।

হ্যাঁ, পরদিনই শীতলাচরণকে নিয়ে চক্কোত্তি মশাই ঐ আসরে উপস্থিত হন ও সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন।

অনুকূলচন্দ্র শীতলাচরণকে বলেন, রামমোহনদের মত আপনাদের পরিবারও তো রাধানগরের বাসিন্দা?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আমি রামমোহনের বিষয়ে একটু বিশদ জানতে চাই।

আপনি কি ওদের পারিবারিক ইতিহাস জানতে চান?

না, না, পারিবারিক ইতিহাস জানতে চাই না। শুধু রামমোহনের কথা জানতে চাই।

শীতলাচরণ বলেন, রামমোহন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারের ছেলে হিসেবে শৈশবে অত্যন্ত ধার্মিক ছিল। এমন কি সদ্য কৈশোরেই সে সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করতে চাইলে মায়ের অনুরোধে সংসার ছেড়ে চলে যায় না।

আচ্ছা!

শৈশবে রামমোহন গ্রামের পাঠশালার গুরুমশাই আর মৌলবীর কাছেই লেখাপড়া শুরু করে কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই সে আরবী ও ফারসী ভাষায় যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করে।

বলেন কি?

হ্যাঁ, দত্ত মশাই, ঠিকই বলছি।

শীতলাচরণ একটু হেসে বলেন, আমাদের বহু লোকের কাছেই শুনবেন, রামমোহন সাত-আট বছর বয়সেই ঐ দুটি ভাষায় এমন জ্ঞান অর্জন করে যে গ্রামে ওকে পড়াবার মত কেউ ছিলেন না।

আশ্চর্য!

মাত্র ন'বছর বয়সে রামমোহন পাটনায় যান আরো ভালভাবে আরবী ভাষা-সাহিত্যে জ্ঞানলাভের জন্য। ওখানে ও অত্যন্ত গভীরভাবে কোরান পাঠ ও তার মূলতত্ত্ব বিষয়েও যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করে।

শুনেই অবাক হন অনুকূলচন্দ্র।

শীতলাচরণ বলেন, এই পাটনায় থাকার সময়ই উনি হাফেজ্ বা শামী তাব্রিজের মত সুফী কবিদের ভক্ত হন।

রামমোহন পাটনায় কতদিন ছিলেন?

প্রায় বছর তিনেক।

তারপর কি উনি কলকাতায় ফিরে আসেন?

না।

শীতলাচরণ না থেমেই বলে যান, বারো বছর বয়সে রামমোহন কাশী যায় প্রাচীন আর্য শাস্ত্র আর সংস্কৃত সাহিত্য অধ্যয়নের জন্য কিন্তু দু'-আড়াই বছরের মধ্যেই সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রের ব্যাপারে তার পাণ্ডিত্য দেখে পণ্ডিতরা খুশি হয়ে ওকে দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেন।

বাবা! এ তো দারুণ ছেলে!

হ্যাঁ, দত্তমশাই, ও সত্যি দারুণ ছেলে।

শীতলাচরণ একটু থেমে বলেন, এর পর ধর্মের ব্যাপারে পিতা-পুত্রের মতভেদ শুরু হয় এবং মতভেদ তীব্র হওয়ায় ষোল বছর বয়সে গৃহত্যাগ করে।

একেবারে গৃহত্যাগ করলেন?

হ্যাঁ।

তারপর?

সন্ন্যাসী ফকিরদের সঙ্গে ভারতবর্ষের বহু প্রদেশ ভ্রমণের পর ও তিব্বত যায়।

তিব্বত?

অনুকূলচন্দ্র চিৎকার করে ওঠেন।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তিব্বত।

রামমোহন ওখানে গেলেন কেন?

বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য।

শুনে সত্যি অবাক হয়ে যাচ্ছি।

হ্যাঁ, দত্ত মশাই, সত্যি অবাক হবার মত ব্যাপার।

অনুকূলচন্দ্র দু'এক মিনিট চুপ করে থাকার পর বলেন, আচ্ছা. আপনি রামমোহনকে চেনেন? বা তাঁর সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে?

শীতলাচরণ একটু হেসে বলেন, আজ্ঞে যথেষ্ট পরিচয় আছে।

রামমোহন কি আপনারই বয়সী?

না, না, ও আমার চাইতে বছর দশেকের ছোট।

এখন ওর কত বয়স হবে?

বোধহয় পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ।

মাত্র?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আচ্ছা রামমোহন সতীদাহে বাধা দিলেন কেন?

ও এই প্রথাকে কুসংস্কার মনে করে।

রামমোহন কি হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী? না খ্রীস্টান ধর্মে বিশ্বাসী?

না, ও মোটেই খ্রীস্টান না। ওর মত ব্রহ্মই সব। শুধু ব্রহ্মের উপাসনাই কাম্য।

ব্রহ্ম তো হিন্দু দেবতা?

অবশ্যই হিন্দু দেবতা।

আবার একটু নীরবতার পর অনুকূলচন্দ্র প্রশ্ন করেন। বর্তমানে রামমোহন কোথায় বা কি কাজ করছেন?

রামমোহন আগে রংপুর কালেক্টরীতে দেওয়ান ছিল ; এখন সে মুর্শিদাবাদে

আছে।

এবার অনুকূলচন্দ্র একটু হেসে বলেন, আপনি রামমোহনের মতবাদ সমর্থন করেন?

না।

ওনার সঙ্গে যখন পরিচয় আছে, তখন প্রতিবাদ করেননি কেন?

শীতলাচরণ এক গাল হেসে বলেন, ওর সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করার মত বিদ্যা-বুদ্ধি-পাণ্ডিত্য-সাহস বা চরিত্র বল আমার নেই। অনেক বড় বড় পণ্ডিতকে ও তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে পারে।

নগেন ঘোষ অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলেন, রামমোহন যত পণ্ডিতই হোক, হিন্দুধর্মের গায় আঁচড় কাটতেও পারবে না।

শীতলাচরণ মৃদু হেসে বলেন, ভবিষ্যতে রামমোহন কি করবে তা আমি জানি না। তবে এইটুকু বলতে পারি, ওর বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞান-সত্যনিষ্ঠা, চরিত্রবলকে উপেক্ষা করবেন না। রামমোহন অসম্ভবকে সম্ভব করার মত ক্ষমতা রাখে।

অনুকূলচন্দ্র একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, নগেন, আমি রামমোহনের মত সমর্থন করি না কিন্তু এই মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করে উপেক্ষা করতেও পারব না।

চার

সূর্যোদয়ের এক প্রহরের মধ্যেই নৌকা হালিশহরের কালীতলা ঘাটে এসে পৌঁছলো। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীধর মাঝি দৌড় দেয় পণ্ডিতমশায়ের বাড়ি।

পণ্ডিতমশায়ের বাড়ির উঠোনে পৌঁছেই শ্রীধর তারস্বরে চিৎকার করে, ও বড গিন্নীমা, ও মেজ গিন্নীমা, ও গিন্নীমা, ও আর সব গিন্নী মাযেরা! কোথায় গেলেন আপনারা? শিগগির শুনুন।

বড় গিন্নীমা ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেই গলা চড়িয়ে বলেন, কি হয়েছে কি? সাত সকালে ষাঁড়ের মত চিৎকার করছো কেন?

শ্রীধব আগের মতই উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করে বলে, আশেপাশের গিন্নী মায়েদের নিয়ে আপনারা শিগগির ঘাটে চলুন। দেরি হলে পণ্ডিতমশাই রেগে যাবেন।

পণ্ডিতমশাই কি জগৎ জয় করে ফিরছেন যে আমাদের সবাইকে ঘাটে গিয়ে

বেশি কথা শোনার ধৈর্য নেই শ্রীধরের। ও চিৎকার করে বলে, পণ্ডিতমশাই নতুন গিন্নীমাকে নিয়ে নৌকায় রয়েছেন। ওদের বরণ করে আনতে হবে না?

ওর কথা শুনে মেজ গিন্নীমা সত্যি রেগে যান। বলেন, শ্রীধর, কি আলতু-ফালতু বকছো? তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? পণ্ডিতমশাই ছেলের বিয়ের মেয়ে দেখতে গিয়ে নিজেই বিয়ে করে এলেন, একথা আমাদের বিশ্বাস করতে হবে?

মেজ গিন্নীমা, ছিধর মাঝি ইহজীবনে আপনাদের কাছে মিথ্যে কথা বলতে পারবে না। আপনারা দয়া করে পাড়ার সবাইকে নিয়ে শিগগির ঘাটে গিয়ে ওদের বরণ করে ঘরে তোলার ব্যবস্থা করুন।

শ্রীধর আর এক মুহূর্ত দেরি না করে দৌড় দেয় ঘাটের দিকে।

ও চলে যেতেই বড় গিন্নীমা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, হ্যাঁরে মেজ, শুধু শুধু দেরি করে লাভ নেই। চটপট তোরা দু'তিনজন আশেপাশের বাড়ির সধবাদের বল, পণ্ডিতমশাই আর নতুন বউকে বরণ করে বাড়ি আনতে হবে।

হাজার হোক পণ্ডিতমশায়ের ব্যাপার। খবরটা ছড়িয়ে পড়তেই পাড়ার নানা বয়সের তিরিশ-চল্লিশজন সধবা শাঁখ হাতে নিয়ে ছুটলো কালীতলা ঘাটের দিকে। নতুন সতীনকে বরণ করার প্রথা বা ইচ্ছা না থাকলেও পণ্ডিত মশায়ের ন'জন পত্নীই বোধহয় কৌতূহল বশে পাড়ার সধবাদের পিছন পিছন ঘাটে যায়।

পাড়ার প্রবীণা সধবা সান্ন্যাল বাড়ির বড়বৌ পণ্ডিতমশাই ও তাঁর নববিবাহিতা পত্নীকে বরণ করেন। অন্যান্যরা শঙ্খধ্বনিতে মুখরিত করে চারদিক। তারপর ওরা শোভাযাত্রা করে নবদম্পতিকে বাড়িতে পৌঁছে দেন।

বাড়িতে পৌঁছেই পণ্ডিতমশাই প্রথমা স্ত্রীকে বলেন, শোনো বড় গিন্নী, শান্তিপুর থেকে হালিশহর দীর্ঘ পথ। নৌকাতে দু'রাত্তির কাটাতে হয়েছে আমাদের। নতুন বউ খুবই ক্লান্ত। ওকে কিছু খাইয়ে-দাইয়ে আমার ঘরে শুইয়ে দাও।

পণ্ডিতমশাই কাঁধে চাদর নিতেই বড় গিন্নী বলেন, আপনিও তো খুব ক্লান্ত। আপনিও একটু বিশ্রাম করুন।

হ্যাঁ, সত্যি আমি ক্লান্ত।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, শান্তিপুর পৌঁছবার পরদিনই ছিল একাদশী। সেদিন সারাদিন নির্জলা উপবাসের পর রাত্রে সামান্য ফলাহার করেছি। তার ক'দিন পরেই আবার উপবাস করেছি। বিয়ের লগ্ন ছিল একেবারে শেষ রাত্তিরে।...

বড় গিন্নী বলেন, তারপর এই দীর্ঘ পথ নৌকায় এসেছেন। আপনি এখন বেরুবেন না। একটু বিশ্রাম করুন।

না, বড় গিন্নী, আমাকে এখুনি টোলবাড়িতে যেতে হবে।

কেন?

শান্তিপুরের দু'টি ছাত্র বোধহয় কাল এসে গেছে। ওদের বিধিব্যবস্থা না করা পর্যন্ত কি শান্তিতে বিশ্রাম করতে পারি?

কিন্তু...

চিন্তা করো না। আমি ওদের বিধিব্যবস্থা করেই ফিরব।

এবার উনি একটু হেসে বলেন, বড় গিন্নী, তুমি সত্যি বড় ভাল। শুধু তোমার জন্যই আমি শান্তিতে শাস্ত্রচর্চাও করছি, আবার সংসারও করছি।

না, না, ওকথা বলবেন না। আপনার পুণ্যবলেই শান্তিতে সংসার চলছে।

পণ্ডিতমশাই সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে যান।

হালিশহরে তখন অনেক পণ্ডিতের বাস। কেউ কাব্যে, কেউ ব্যাকরণে, কেউ স্মৃতি বা দর্শন শাস্ত্রের পণ্ডিত কিন্তু বেদান্তের বিশিষ্ট পণ্ডিত বলে হরিমোহন বেদান্ততীর্থের খ্যাতি সুদূর বিস্তৃত। বর্ধমান-বিষ্ণুপুর তো দূরের কথা, নবদ্বীপ-কেষ্টনগর-শান্তিপুরের মত শাস্ত্রচর্চা কেন্দ্রগুলি থেকেও ওর কাছে ছাত্ররা আসতো বেদান্ত অধ্যয়নের জন্য। হালিশহরে পণ্ডিত মশাই বলতে সবাই বুঝতো হরিমোহন বেদান্ততীর্থকেই।

সারাদিন টোলবাড়িতে কাটিয়ে এইসব পণ্ডিতরাই গঙ্গার ধারে রথতলায় এক আড্ডার আসরে মিলিত হতেন। রথতলার আড্ডাই ছিল ওঁদের চিত্তবিনোদনের অন্যতম উপায়।

রথতলার আসরের অনেক বৈশিষ্ট্য ছিল। এখানে এলেই সবাই বয়স ও পাণ্ডিত্যের ভেদাভেদ ভুলে যেতেন। সবাই সমবয়সী সুলভ আচরণ ও কথাবার্তা বলতেন। রসালাপেও কোন বিধিনিষেধ ছিল না ; বরং রসালাপের রস উপভোগ করাই ছিল প্রত্যেকের মুখ্য আকর্ষণ।

দিন দশেক পর হরিমোহন বেদান্ততীর্থ এই আসরে উপস্থিত হতেই সবাই হৈ হৈ করে উঠলেন।

স্মৃতিতীর্থ মশাই ওনাকে সাদরে পাশে বসিয়েই একগাল হেসে বলেন, শুনলাম, তুমি শান্তিপুর থেকে একটি অতীব মাধুর্যপূর্ণ রস-কদম্ব নিয়ে এসেছ।

হরিমোহন মৃদু হেসে বলেন, নিয়ে আসিনি, নিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছি।

ব্যাকরণতীর্থ বলেন, যাবার সময় তো তুমি বলে গেলে, ছেলের জন্য পাত্রী দেখতে যাচ্ছো কিন্তু ফিরে এলে নিজে বিয়ে করে?

কি করব ভাই? সে অসহায় বৃদ্ধকে দেখে আর তাঁর অসহায় অবস্থা বিবেচনা

করে আমি তার কন্যাকে বিয়ে না করে পারলাম না।

স্মৃতিতীর্থ বলেন, ছেলের সঙ্গে মেয়েটির বিয়ে দিলেই তো অসহায় বৃদ্ধকে সাহায্য করা হতো।

উনি না থেমেই একটু হেসে বলেন, সত্যি কথা বলো তো মেয়েটিকে দেখে কি তোমারই কামোদ্দীপনা জেগে উঠেছিল?

পণ্ডিত, একটু ধৈর্য ধরো। আমি সব খুলে বলছি। সব শুনলেই তোমরা বুঝবে, আমি কোন অন্যায় করিনি।

আমরা তো কখনো বলিনি, তুমি অন্যায় করেছ। ব্রাহ্মণ বা কুলীন কায়েতরা তো ইচ্ছা মত দার পরিগ্রহ করতেই পারে। যাইহোক শুনি, ছেলের বদলে তুমি কেন বিয়ে করলে।

হ্যাঁ, শোনো।

অতীব সাদরে অভ্যর্থনা করে নকুল ভটচাজ্ ও তাঁর প্রতিবেশীরা হরিমোহনকে বাড়ি নিয়ে গেলেন। একটি বউ সঙ্গে সঙ্গে ওর পা ধুইয়ে আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দেয়। জলযোগের আয়োজনেও কোন ত্রুটি ছিল না। খড়ের চালের ঘর হলেও অত্যন্ত পরিপাটি করে সাজানো ঘরের অতীব পরিচ্ছন্ন বিছানায় বিশ্রামের আয়োজন হয়েছে। হরিমোহন সে শয্যায় শয়ন করতেই দুটি বউ খাটের দু'পাশে দাঁড়িয়ে তালপাতার পাখা দিয়ে বাতাস করে। নৈশ ভোজনটি রীতিমত গুরুতর হলো। ভোজনের সময়েও দুটি বউ পাখার বাতাস করে।

মহাতৃপ্ত হরিমোহন বললেন, এত ব্যাপক আয়োজনের কোন প্রয়োজন ছিল না। এত আমি খাই না কিন্তু প্রত্যেকটি রান্না এত সুস্বাদু হয়েছে যে না খেয়েও পারলাম না।

ভটচাজ্ মশাই দু'হাত কচলে বলেন, আমি দীন-দরিদ্র ব্রাহ্মণ। অতি সামান্যই আয়োজন করতে পেরেছি। আপনার মত মহাপণ্ডিত ও পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির উপযুক্ত ব্যবস্থা করার সাধ্যই আমাদের নেই।

ভটচাজ্ মশাই, তা বলবেন না। আপনি সত্যি প্রয়োজনের অনেক বেশি আয়োজন করেছেন।

হাত-মুখ ধুয়ে হরিমোহন ঘরে ঢুকতেই ভটচাজ্ মশাই নিজে তাঁর হাতে পান তুলে দেন। ঠিক সেই সময় দরজার ওপাশ থেকে এক নারীকণ্ঠ শোনা যায়—আপনি পণ্ডিতমশাইকে জিজ্ঞেস করুন, কাল উনি কখন আমাদের মেয়েকে দেখতে চান।

হরিমোহন সঙ্গে সঙ্গে বলেন, আমি মধ্যাহ্নভোজনের আগেই আপনাদের

কন্যাকে দেখে অপরাহ্নেই এই স্থানত্যাগ করতে চাই।

আবার নারীকণ্ঠ : যখন দয়া করে আমাদের মত অভাগার সংসারে এসেই পড়েছেন, তখন কালকেই আপনাকে আমরা যেতে দেব না।

হরিমোহন একটু হেসে বলেন, আপনারা তো বহুকাল ধরেই আমাকে আসতে অনুরোধ করেছেন কিন্তু টোলের ছাত্রদের ছেড়ে আসা কঠিন বলেই এতকাল আসতে পারিনি। আমার সত্বর ফিরে যাওয়া দরকার।

আবার নারীকণ্ঠ : কাল আপনি আমাদের মেয়েকে দেখুন ; পরশু ঐ মেয়ের হাতের রান্না খেয়ে দেখুন, ও কেমন রান্না করে। তারপর...

হরিমোহন কোন কথা না বলে হাসতে হাসতেই শুয়ে পড়েন।

দরজার ওপাশে কয়েকজন মেয়ে-বউদের দেখা গেল। ভটচাজ্ মশাইই মেয়েটির হাত ধরে বলেন, আয়, মা, আয়।

ঘরের মধ্যে দু'এক পা এগিয়েই ভটচাজ্ মশাই মেয়েকে বলেন, পণ্ডিতমশাইকে প্রণাম কর।

মেয়েটি প্রণাম করতেই হরিমোহন বলেন, সুখে থাকো. শান্তিতে থাকো। যাও, আসনে বসো।

হরিমোহন মনের ভাব প্রকাশ করেন না যে মেয়েটিকে দেখেই ওর মাথা ঘুরে গেছে। এ তো পূর্ণযৌবনা। দেহের প্রতিটি অংশে, প্রতিটি অঙ্গে যৌবনের জোয়ার। ছেলের সঙ্গে তো একে মানাবে না। বড়ই বেমানান হবে।

তবু হরিমোহন একটু হেসে প্রশ্ন করেন, তোমার নাম কি?

হৈমীবালা।

বাঃ! খুব সুন্দর নাম।

তুমি ঘর-গেরস্থলির কাজ জানো?

মেয়েটি মাথা নাড়ে।

ভটচাজ্ মশাই সঙ্গে সঙ্গে বলেন, পণ্ডিতমশাই, বিশ্বাস করুন হেম সংসারের সব কাজ জানে। তাছাড়া সূচীশিল্প নিপুণা। আপনার বিছানার চাদর ও বালিশের অড়ে ওর কাজ আছে। দেখলেই বুঝবেন, ও কত সুন্দর..

হরিমোহন ভটচাজ্ মশায়ের কথার মাঝখানেই হৈমীর দিকে তাকিয়ে বলেন, তুমি উঠে দাঁড়াও তো।

হ্যাঁ, ও উঠে দাঁড়ায়।

হরিমোহনের কামাতুর দৃষ্টি হৈমীর দেহ-লাবণ্যর উপর দিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

এবার হুকুম হলো, একটু হাঁটো তো।

হ্যাঁ, হৈমী ঘরের মধ্যে ধীর পদক্ষেপে এদিক থেকে ওদিক করে।

হৈমীর স্তন, নিতম্ব আর উরুর আভাস দেখে হরিমোহন মনে মনে সত্যি চঞ্চল হয়ে ওঠেন।

দেখি, চুল কত বড়।

হৈমী খোপা খুলে পিছন ফিরে দাঁড়ায়।

বাঃ! দীর্ঘ কুন্তল।

হরিমোহনের ইচ্ছা করে হৈমীকে আরো কিছুক্ষণ চোখের সামনে রাখতে, আরো ভাল করে দেখতে কিন্তু তবু মুখে বলেন, যাও, হৈমী। ভিতরে যাও।

ভটচাজ্ মশাই করজোড়ে ঘরের মাঝখানেই দাঁড়িয়ে আছেন। হরিমোহন বিছানায় বসে মাথা নীচু করে কত কি চিন্তা করেন।

দেহ-লাবণ্যে হৈমী যেন কালিদাসের শকুন্তলা। মুহূর্তের দর্শনেই পুরুষের চিত্ত উদ্বেলিত না হয়ে পারে না কিন্তু...

হরিমোহন যেন হোঁচট খান।

মাত্রবছর খানেক আগেই এক ছাত্রের গৃহে গিয়ে তার এক বিমাতার কন্যা সরস্বতীকে বিবাহ করেছেন! না করে পারেন নি। সরস্বতীর পিতা ও গর্ভধারিণী এমন হাত-পা ধরে কান্নাকাটি শুরু করলেন যে...

হরিমোহন বোধহয় মনে মনেই একটু হাসেন ও মনে মনেই বলেন, ষোড়শী সরস্বতীকে দেখেই মনে হয়েছিল, সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপ। সরস্বতীকে অমনোনীত করার মত কোন পুরুষ বোধহয় এখনও ভূমিষ্ঠই হয়নি।

পণ্ডিতমশাই মনে মনে স্বীকার করেন, সরস্বতীর সঙ্গে এখনও সহবাস করে যে অভাবনীয় আনন্দলাভ করি, তার ভগ্নাংশ আনন্দ পাইনি অন্য কোন স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করে কিন্তু এখন যদি ঘটনাচক্রে হৈমীকে বিয়ে করে বাড়ি নিয়ে যাই, তাহলে..

হঠাৎ দরজার ওপাশ থেকে এক নারীকণ্ঠ ভেসে আসে—আপনি পণ্ডিত মশাইকে জিজ্ঞেস করুন, হৈমীকে পছন্দ হলো কিনা।

ভটচাজ্ মশাই কিছু বলার আগেই হরিমোহন বলেন, আপনাদের কন্যা হৈমীকে দেখে আমার খুবই পছন্দ হয়েছে। হৈমী যেমন সুন্দরী, তেমনি লাবণ্যময়ী কিন্তু...

ওরা দু'জনেই আঁতকে ওঠেন, কিন্তু কি?

আমার পুত্রের বয়স ঠিক আঠারো। আমারই মত রোগা পাতলা। তার স্ত্রী হিসেবে হৈমীকে বড়ই বেমানান লাগবে। হৈমীকে দেখে কখনই মনে হয় না, সে যোড়শী। মনে হয়...

ভটচাজ্ মশাই সঙ্গে সঙ্গে ওর দুটো পা জড়িয়ে ধরে প্রায় কাঁদতে কাঁদতে বলেন, পণ্ডিতমশাই, আপনি বিশ্বাস করুন, হৈমী সত্যি যোড়শী। কিন্তু ওর গর্ভধারিণীর মতই বড় বাড়-বাড়ন্ত।

নারীকণ্ঠ : পণ্ডিতমশাই, আপনি দয়া করুন, কৃপা করুন। এই মেয়ের বিয়ে দিতে না পারার জন্য আমরা সমাজে মুখ দেখাতে পারছি না।

হরিমোহন গম্ভীর হয়ে প্রশ্ন করেন, এত কাল মেয়ের বিয়ে দেননি কেন?

ভটচাজ্ মশাই করজোড়ে নিবেদন করেন, পণ্ডিতমশাই, আমরা নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে দিন যাপন করি। ভয়ঙ্কর হাঁপানীর জন্য গীতা পাঠ চণ্ডী পাঠ তো দূরের কথা, লক্ষ্মী-সরস্বতী পূজা করতেও অভাবনীয় কষ্ট হয়।

এইটুকু বলেই উনি হাঁপাতে শুরু করেন।

দরজার ওপাশ থেকে হৈমীর গর্ভধারিণী বলেন, পণ্ডিতমশাই, ঈশ্বরও আমাদের উপর বিরূপ। গত তিন বছরে আমাদের পরিবারের চারজনের অকাল মৃত্যু হয়েছে।...

সে কি?

ভটচাজ্ মশাই অশ্রুসিক্ত নয়নে বলেন, পণ্ডিত মশাই, প্রতি বছর বর্ষার সময় এদিকে কি ভয়ঙ্কর ওলাওঠা হয়, তা আপনারা কল্পনা করতে পারবেন না। ঐ সর্বনাশা রোগেই আমার দুই পত্নী ও দুটি সন্তান মারা যাওয়ায়...

বুঝেছি, বুঝেছি।

হরিমোহন একটু থেমে বলেন, আপনাদের এই কন্যার বিবাহের ব্যাপারে আমি কি করতে পারি, তা তো বুঝতে পারছি না।

এবার হৈমীর মা হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলেন, আমি হৈমীকে আপনার নৌকায় চড়িয়ে দেব। আপনি মাঝপথে ওকে গঙ্গায় বিসর্জন দেবেন, সেও ভাল কিন্তু...

ছি, ছি, এসব কথা বলতে নেই। ওকে গঙ্গায় বিসর্জন দিলে যে আমি মহাপাতক হবো।

তাহলে দয়া করে আপনিই হৈমীকে বিয়ে করুন।

আমি?

হরিমোহন মনে মনে খুশি হলেও মুখে বিস্ময় প্রকাশ করেন।

না, না, আর দ্বিধা-সঙ্কোচ না। ভটচাজ্ মশাই আর হৈমীর গর্ভধারিণী হরিমোহনের দুটি পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলেন, পণ্ডিতমশাই, আপনি দয়া করে হৈমীকে আপনার পায়ে স্থান দিন। তা না হলে আজ রাত্রেই আমরা দু'জনে হৈমীকে নিয়ে গঙ্গায় ডুবে মরব।

দয়া করে এইসব কথা বলবেন না। আমি অত্যন্ত বিব্রতবোধ করছি। আপনারা আমাকে একটু চিন্তা-ভাবনা করার সময় দিন।

মধ্যাহ্নভোজের পর হরিমোহন যথারীতি শযন করেন কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসে না। চোখের সামনে বার বার হৈমীর অভাবনীয় আকর্ষণীয় দেহ ভেসে ওঠে।

অপরাহ্ণে উনি আর শুয়ে থাকতে পারেন না। বিছানার উপর বসে বসেই আকাশ-পাতাল চিন্তা করেন। হঠাৎ দেখতে পান, দরজার ওপাশে একজন মহিলা বসে আছেন মুখ নীচু করে।

কে ওখানে?

ভদ্রমহিলা কাঁদতে কাঁদতে বলেন, আমিই হতভাগীকে পেটে ধরেছি।

ওখানে বসে আছেন কেন?

আপনি কখন কৃপা করেন, সেই আশায় বসে আছি।

ঘরের এক কোনায় যে চোরের মত ভটচাজ্ মশাই বসে আছেন, তা হরিমোহন খেয়ালই করেন নি।

হঠাৎ ভটচাজ্ মশাই কোন মতে কান্না চেপে বলেন, পণ্ডিতমশাই, সেই সকাল থেকেই আমরা দু'জনে আপনার সিদ্ধান্ত জানার জন্য বসে আছি।

আপনারা আহারাদি করেন নি?

এই মানসিক অবস্থায় কি আমরা অন্নগ্রহণ করতে পারি?

কি আশ্চর্য!

মুহূর্তের জন্য চুপ করে থেকেই হরিমোহন বলেন, ভটচাজ্ মশাই, আপনারা দু'জনে দয়া করে আহারাদি করুন : আর আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে, তাহলে আমি আপনাদের কন্যার সঙ্গে একটু কথা বলতাম।

ভটচাজ্ মশাই কিছু বলার আগেই হৈমীর গর্ভধারিণী বলেন. না, না, কিচ্ছু আপত্তি নেই। আমি এখুনি হৈমীকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

দরজার ঠিক বাইরে হৈমীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই হরিমোহনের মন পুলকিত হয়। একটু হেসে বলেন, ওখানে কেন? ভিতরে এসো।

লজ্জায়, দ্বিধায়, ভয়ে হৈমী কোন মতে দরজার এপাশে এসেই মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে একটু যেন কাঁপে।

হৈমী, কাঁপছো কেন? তোমার কি ভয় করছে?

না, ও কোন জবাব দিতে পারে না।

হরিমোহন একটু হেসে বলেন, আমি বাঘও না, ভাল্লুকও না ; ভয় কি? আমার সামনে এসো।

হৈমী কোনমতে কয়েক পা এগিয়ে আসে।

হরিমোহন অপলক দৃষ্টিতে ওকে দেখতে দেখতে বিভোর হয়ে যান। দু'এক মিনিট পর বলেন, তুমি কি জানো তোমার মা-বাবা আমাকে কি অনুরোধ করেছেন?

হৈমী মুখে না, মাথা নেড়ে বলে, হ্যাঁ, জানে।

তুমি অপূর্ব লাবণ্যময়ী যুবতী কিন্তু আমি যে আটচল্লিশ বছরের বুড়ো। আমি তোমাকে বিয়ে করলে কি তুমি সুখী হবে?

ও শুধু মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়।

আমাকে কি তুমি সুখী করতে পারবে?

হৈমী এবারও মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়।

হরিমোহন একটু খুশির হাসি হেসে বলেন, শুনে নিশ্চিন্ত হলাম। এবার মুখ তুলে আমার দিকে তাকাও।

হৈমী মুখ তুলেও লজ্জায় ওর দিকে তাকাতে পারে না।

পণ্ডিত মশাই চাপা হাসি হেসে বলেন, দু'দিন পর যার সঙ্গে সহবাস করবে, তার দিকে তাকাতে লজ্জা কি?

হৈমী এক পলকের জন্য ওকে দেখেই দৃষ্টি আনত করে।

এবার তুমি আসতে পারো।

পরের শুক্রবারই গভীর রাত্রির লগ্নে হরিমোহনের দ্বাদশ বিবাহ সম্পন্ন হলো হৈমীর সঙ্গে।

পরের দিন কাল রাত্রি। দু'জনের দেখা-সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ।

রবিবার ফুলশয্যা।

ফুলশয্যার আয়োজন হলো ভটচাজ্ মশায়ের প্রতিবেশী মৈত্রদের বাড়ি।

মৈত্রদের পাকা দোতলা বাড়ি। দেখেই মনে হয়, বেশ বিত্তবান পরিবার। এত

বড় বাড়ির বাসিন্দা মাত্র তিনজন ; মৈত্র মশায়ের মা, স্ত্রী ও শিশুকন্যা। আর দু'একটি দাসী।

ফুলশয্যার ঘরখানি অতীব সুন্দর। ঘরে বিশাল পালঙ্ক, দেয়ালে বিরাট আয়না আর কয়েকটি অর্ধনগ্ন নারীর ছবি। দোতলার এই ঘরখানির পিছনে বারান্দা। বারান্দা থেকে গঙ্গার শোভা দেখা যায়। একেবারে এই মনোরম পরিবেশ, বিশাল পালঙ্কে অমন সুন্দর সুখশয্যা এবং সর্বোপরি হৈমী!

হরিমোহনের মানসনেত্রে, সাক্ষাৎ কালিদাসের শকুন্তলা!

পণ্ডিতমশাই আনন্দে খুশিতে উত্তেজনায় সম্ভাবনায় পাগল হয়ে যান।

নতুন বউ, কাছে এসো।

হৈমী একটু কাছে আসতেই উনি বলেন, ঘোমটা সরাও।

হৈমী সামান্য একটু ঘোমটা সরায়। হরিমোহন সঙ্গে সঙ্গে নিজের হাতেই ওর ঘোমটা ফেলে দিয়ে বলেন, কেমন লাগছে?

ও লজ্জায় মুখ নীচু করে। মুখে কিছু বলে না।

নতুন বউ, যে স্বামীর সঙ্গে নিত্য সহবাস করতে হবে, তার কাছে আবার লজ্জা কি?

হরিমোহন এক হাত দিয়ে ওর মুখখানা ধরেই অবাক, একি, তুমি যে ঘামছো! এত বাতাস বইছে, তবু তোমার ঘাম হচ্ছে?

উনি অত্যন্ত উতলা হয়ে প্রশ্ন করেন, তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে?

হৈমী মাথা নেড়ে বলে, না।

তবে?

হৈমী ব্যাকুল হয়ে ওর দিকে তাকায়।

বলো, বলো, কি বলতে চাও।

আমার ভয় করছে।

কেন? কিসের ভয়?

যদি আমি আপনাকে সুখী করতে না পারি?

হরিমোহন হাসতে হাসতে ওকে জড়িয়ে ধরেই বিছানায় লুটিয়ে পড়েন।

নতুন বউ, রাত কেমন কাটলো?

হৈমীর মুখে হাসি ধরে না। লজ্জায় মুখ লুকোয়।

পণ্ডিতমশাই দু'হাত দিয়ে ওর মুখখানা ধরে ওর চোখের পর চোখ রেখে বলেন,

বলো নতুন বউ, রাত কেমন কাটলো।

হৈমী ওর কোলের মধ্যে মুখ লুকিয়ে কোনমতে বলে, খুব ভাল।

কয়েক মুহূর্ত পরে ও প্রশ্ন করে, আপনার রাত কেমন কাটলো?

নতুন বউ, বিশ্বাস করো, এত সুখ, এত আনন্দ জীবনে পাই নি।

হৈমী সকালবেলায় বাড়ি যেতেই কয়েকজন বিমাতা আর পাড়ার বউ ওকে ঘিরে ধরে প্রশ্ন করে, কিরে, জামাই আদর-টাদর করেছিল?

ওদের প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই হৈমী দৌড়ে ঘরে যায় কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হাজির হয় ওর সর্বকনিষ্ঠা বিমাতা। ইনি বিমাতা হলেও প্রায় হৈমীর সমবয়সী এবং দু'জনের খুব ভাব।

এই হতভাগী, সত্যি করে বল, জামাই আদর করেছিল কিনা।

হৈমী মাথা নেড়ে হাসতে হাসতে বলে, হ্যাঁ।

তোর ভাল লেগেছে?

ও দু'হাত দিয়ে নতুন মাকে জড়িয়ে ধরে কানে কানে বলে, খুব ভাল লেগেছে।

তাহলে পণ্ডিত জামাই বেশ রসিক আছে, কি বল?

হৈমী প্রায় ফিস ফিস করে বলে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

রথতলা আসরের বন্ধুদের সবকিছু খোলাখুলি জানাবার পর হরিমোহন বলেন, ভাই, তোমরাই বলো, আমি কি অন্যায় করেছি?

পঞ্চানন স্মৃতিতীর্থ বলেন, তুমি বিন্দুমাত্র অন্যায় করো নি ; বরং যথাযথ কর্তব্য পালন করেছ।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, আমরা শাস্ত্রজ্ঞ হতে পারি, পাণ্ডিত্যের জন্য আমাদের হয়তো সুখ্যাতি আছে, আমরা প্রত্যেকেই গৃহদেবতার সেবা করি, নানা তিথি-পার্বণে উপবাস করি কিন্তু তবু তো স্বীকার করতেই হবে, আমরা যখন জীবদেহ ধারণ করেছি, তখন নানা সহজাত প্রবৃত্তি থাকবেই।

সবাই সম্মতিতে মাথা নাড়েন।

সুন্দরী সুললিত লাবণ্যময়ী যুবতী দেখে আমাদের মধ্যে কামভাবের উদ্রেক হতেই পারে এবং যদি কাউকে দেখে কামভাবের উদ্রেক হয়, তাহলে তাকে অবশ্যই বিবাহ করা উচিত।

স্মৃতিমশাই একটু হেসে বলেন, সত্যি কথা বলতে কি আমি আমার সতেরটি স্ত্রীকেই বিবাহের পূর্বে দেখে কামভাবে এতই জর্জরিত হই যে...

প্রায় সবাই সমস্বরে হাসতে হাসতে বলেন, ওহে স্মৃতিতীর্থ, আমরাও তো একই কারণে বার বার বিয়ের পিঁড়িতে বসেছি।

গঙ্গায় যাবার দুটি রাস্তার মাঝখানে বিশাল এলাকা নিয়ে হরিমোহনের পৈতৃক ভিটা। এর একদিকে বসত বাড়ি, অন্য দিকে টোল বাড়ি ; দুটি আলাদা রাস্তার উপর দুটি বাড়িব মাঝখানের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে আম-জাম-কাঁঠালের বাগান। আরো কত ছোট-বড় গাছ গাছালিতে ভরা ঐ বাগান। কালে-কস্মিনেও হরিমোহনের ছেলে ঐ বাগানে যায় না সাপের ভয়ে। তবে হরিমোহনের অল্পবয়সী স্ত্রী মাঝে-মধ্যে ঐ বাগানের ভিতর দিয়েই গঙ্গায় যায় স্নান করতে ; ফিরেও আসে ঐ পথে। না এসে কি করবে? রাস্তাব লোকজনের সামনে দিয়ে তো ওরা ভেজা কাপড়ে আসতে পারে না। তবে প্রতিদিন গঙ্গায় যায় চম্পাকলি। ও তোলা জলে চান করতে পারে না। পারবে কি করে?

নবদ্বীপের গঙ্গার পাড়ে বাড়ি। ছ'সাত বছর থেকেই সাঁতার দিতে শিখেছে। বিয়ের পরও সাঁতার কাটার অভ্যাস যায় নি। তাছাড়া দশ-পনের মিনিট সাঁতার কেটে ওর মন ভরে না। প্রাণভরে সাঁতার কেটে চান করে চম্পাকলির বাড়ি ফিরতে ফিরতে এক-দেড় ঘণ্টা সময় লাগবেই।

আগে মাঝে মাঝে হরিমোহনের বড় গিন্নী ওকে বকুনি দিতেন, হ্যাঁরে, তোর কি কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই? বাড়ির বউ হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গঙ্গার ঘাটে পড়ে থাকতে লজ্জা করে না? তাছাড়া যদি কোন বিপদ-আপদ হয়?

চম্পাকলি এক গাল হেসে বলে, কিযে বলো বড়দি! আজন্ম গঙ্গায় সাঁতার কাটছি; গঙ্গায় আবার কি বিপদ হবে?

পরে একদিন হরিমোহন নিজেই প্রথমা স্ত্রীকে বললেন, বড গিন্নী, চম্পা গঙ্গার ঘাট থেকে ফিরতে দেরি করলে তুমি ওকে কিছু বলো না। একেবারে ছোটবেলা থেকে গঙ্গায় সাঁতার কাটা, চান করার অভ্যাস।

পণ্ডিতমশাই একটু হেসে বলেন, চম্পার কি এমন বয়স? প্রায় তোমার সন্তানের মত। ও যদি একটু বেশিক্ষণ সাঁতার কেটে আনন্দ পায়, তাতে তুমি আপত্তি করো না।

সন্ধের পর এক বড় সতীনের কাছে এই কথা শুনেই চম্পাকলি দৌড়ে রান্নাঘরে

গিয়ে এক গাল হেসে বলে, দেখো বড়দি, পণ্ডিতমশাই এখন নতুন দুই বউকে নিয়ে মেতে আছে। তিন-চার মাসের মধ্যেও আমাকে নিয়ে এক রাত কাটান নি কি দেখলে তো, তবু আমাকে কত ভালবাসেন!

ওর কথায় শুধু বড় গিন্নী না, অন্য দু'তিনজন বড় সতীনও না হেসে পারেন না

কাল থেকে আরো অনেকক্ষণ সাঁতার কাটবো।

বড় গিন্নী হাসতে হাসতে বলেন, তুই যতক্ষণ ইচ্ছে সাঁতার কাটিস ; তোকে কেউ কিছু বলবে না।

এর ঠিক দু'তিন দিন পরের কথা।

চম্পাকলি সাঁতার কেটে চান করে গঙ্গার ঘাট থেকে বাড়ি ফেরার পথে বাগানের মাঝামাঝি এসে গাছের আড়ালে কাকে যেন লুকিয়ে পড়তে দেখেই বলে, কে ওখানে?

গাছের আড়াল থেকে একটি বিশ-বাইশ বছরের ছেলে সামনে এসে বেশ ঘাবড়ে গিয়েই বলে, আজ্ঞে আমি নরেশ।

এখানে এলে কি করে?

আজ্ঞে আমি পণ্ডিতমশায়ের ছাত্র ; টোল বাড়িতে থাকি।

ও!

চম্পাকলি সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন করে, এই বাগানে কি করছো?

নরেশ একটু হেসে বলে, এই বাগানে বেড়াতে আমার খব ভাল লাগে।

এতক্ষণে চম্পাকলির হুঁস হয়, তার সর্বাঙ্গে ভেজা কাপড় জড়িয়ে আছে। লজ্জা ত্বরিত পদক্ষেপে ও বাড়ির দিকে এগিয়ে যায়।

পরের দিন গঙ্গা থেকে ফেরার পথে চম্পাকলি আবার নরেশকে বাগানের মধ্যে ঘুরাঘুরি করতে দেখে কিন্তু কেউই কোন কথা বলে না। তবে দু'জনেই দু'জনে দিকে কয়েক মুহূর্তের জন্য তাকিয়ে থাকে।

হ্যাঁ, রোজই ঐ বাগানে ওদের দেখা হয়। দু'জনের মুখেই একটু হাসি ফুটে ওঠে কিন্তু কোন কথা হয় না।

এইভাবেই দশ-বারো দিন পার হয়।

সেদিন গঙ্গায় সাঁতার কেটে চান করে ফেরার পথে বাগানের ভিতর দিয়ে অনেকটা পথ এগিয়ে এলেও নরেশকে দেখতে পায় না চম্পাকলি। একটু থমকে দাঁড়ায়। ভাল কবে চারপাশ দেখেও নরেশকে দেখতে পায় না। একটু পিছিয়ে যায়

।দিক-ওদিকে দৃষ্টি ঘুরিয়েও ওকে দেখতে না পেয়ে চম্পাকলি যেন একটা হতাশ য়।

বাড়ি ফেরার পথে, সন্ধের পর উঠোনে পায়চারি করতে করতে চম্পাকলির বার ার মনে হয়, নরেশ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েনি তো? নাকি দেশের বাড়ি গেছে?

রাত্রে শোবার পরও ও নরেশের কথা না ভেবে পারে না। বেশ ছেলেটা। উজ্জ্বল ্যামবর্ণ রং, বেশ বড় বড় দুটো চোখ, মাথায় ঘন কালো চুল, বেশ স্বাস্থ্যবান। াছাড়া সামান্য হাসিতেই ওর মুখখানা কি সুন্দর দেখায়!

চম্পাকলির একবার মনে হয়, নরেশ কি ওকে ভেজা কাপড়ে দেখার জন্যই রাজ বাগানে আসে?

যাইহোক পরের দিন গঙ্গা থেকে ফেরার পথে বাগানের মধ্যে দু'জনের মুখোমুখি দখা।

চম্পাকলি বলে, কাল তোমাকে দেখলাম না তো!

নরেশ একটু হেসে বলে, আমি তোমাকে দেখেছি।

কোথায়?

ঘাটের কাছে একটা গাছের আড়াল থেকে তোমাকে সাঁতার কাটতে, চান করতে দখলাম।

ও মা! তুমি তো আচ্ছা ছেলে!

নরেশ একবার ওকে ভাল করে দেখে বলে, তুমি রোজ সাঁতাব কাটো বলেই তা তোমার শরীরটা এত সুন্দর আছে।

চম্পাকলি একটু কৌতুকের হাসি হেসে ওর দিকে তাকিয়ে বলে, তাই নাকি?

সত্যি বলছি, তোমাকে ভারী সুন্দর দেখতে।

ইস! আমি আবার সুন্দর।

নরেশ হঠাৎ মুহূর্তের জন্য ওর একটা হাত ধরে বলে, সত্যি বলছি, তোমাকে ারী সুন্দর দেখতে।

চম্পাকলি চঞ্চলা হরিণীর মত নাচতে নাচতে বাড়ি যায়।

না, চম্পাকলি আর বেশিক্ষণ সাঁতার কাটে না; তাবপর দ'চারটে ডুব দিয়েই ঙ্গা থেকে উঠে আসে। রোজ নরেশের সঙ্গে শুধু দেখা হয় না, পাঁচ-দশ মিনিট থাবার্তাও বলে; অথবা চুপচাপ দু'জনে পাশাপাশি বাগানের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। দাচিৎ কখনও দু'জনে পাশাপাশি বসে হাত ধরাধরি করে গল্পগুজবও করে।

দু'জনেরই মনে নেশা ধরে। দু'জনেই একটু নিবিড় হয়ে, ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে। সুখ
দুঃখের কথা হয়।

চম্পা, সত্যি করে বলো, আমাকে খারাপ মনে হয় কিনা।

এই তোমার বুকে হাত দিয়ে বলছি, তোমাকে খারাপ মনে হয় না।

ও সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন করে, আচ্ছা নরেশ, তুমি কি সত্যি আমাকে ভালোবাসো

নরেশ ওর বুকের উপর হাত রেখে বলে, বিশ্বাস করো চম্পা, তোমাকে আমি
খুব ভালবাসি। সারা রাত শুধু তোমার কথা ভাবি।

চম্পাকলি ওর হাতের উপর একটা হাত চেপে ধরে একটু হেসে বলে, এখানে
হাত দেয়? এখানে হাত দিতে লজ্জা করলো না?

তুমি যে আমার চম্পা। তাইতো তোমার বুকে হাত দিতে লজ্জা করলো না

নরেশ সঙ্গে সঙ্গে দু'হাত দিয়ে ওর মুখখানা ধরে বলে, তোমাকে খুব আদর
করতে ইচ্ছে করছে।

পণ্ডিতের বউকে আদর করা অন্যায়, তা জানো না?

তুমি কারুর বউ না, তুমি শুধু আমার চম্পা।

না, নরেশ আর ধৈর্য ধরতে পারে না। ওকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেই মাটিতে
লুটিয়ে পড়ে।

দু'জনের মুখেই খুশির হাসি কিন্তু কারুর মুখেই কোন কথা নেই। পাঁচ-দশ মিনিট
পর নরেশই প্রথম কথা বলে।

চম্পা, তুমি আমার উপর রেগে গিয়েছ?

না।

কেন?

নরেশ না থেমেই বলে, তোমাকে এভাবে পাবার অধিকার তো আমার নেই

ওগো, আমি মানুষ, দেবতা না। আমার শরীর তো পাথরের তৈরি না। বছর
দুয়েকের মধ্যে পণ্ডিত আমাকে নিয়ে একটা রাতও কাটায় নি কিন্তু আমারও ইচ্ছে
করে মাঝে-মধ্যে স্বামীর সোহাগ পেতে।

হ্যাঁ, সে তো খুবই স্বাভাবিক।

নরেশের মুখে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে চম্পাকলি একটু হেসে বলে, তুমি আমার
অনেক দিনের দুঃখ-কষ্ট আজ ঘুচিয়ে দিলে। তোমার উপর কি রাগ করতে পারি?

চম্পা।

হ্যাঁ, বলো।

আমার আদর-ভালোবাসা তোমার ভাল লেগেছে?

হ্যাঁ, খুব ভাল লেগেছে।

চম্পাকলি সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করে, তোমারও ভাল লেগেছে তো?

নিশ্চয়ই।

দেখাশুনা রোজই হয়। কোন গাছের আড়ালে কিছুক্ষণ পাশাপাশি বসে ভাব-ভালবাসার কথা হয়। সেই সঙ্গে একটু আদর, একটু আলিঙ্গন। তবে কোন কোনদিন এইটুকুতেই মন ভরে না। সেদিন দু'জনেই ভেসে যায় যৌবনের জোয়ারে।

এইভাবেই মাস তিনেক কেটে গেল।

সুধাময়ী দরজায় খিল দিতে দিতেই বলে, চম্পা, ঘুমিয়ে পড়িস না। তোর সঙ্গে আমার খুব জরুরী কথা আছে।

চম্পাকলি একটু হেসে বলে, আমার সঙ্গে আবার তোমার কি জরুরী কথা থাকতে পারে।

আছে, আছে ; দারুণ জরুরী কথা আছে।

সুধাময়ী ওর পাশে শুয়েই বলে, চম্পা, আমি যা যা জিজ্ঞেস করব, তার ঠিক ঠিক জবাব দিবি। কিছু লুকোবিও না, মিথ্যেও বলবি না।

ভালোদি, এই সংসারে তোমার চাইতে কেউ আমাকে ভালবাসে না। আমিও তোমাকে খুব ভালোবাসি। আমি কি তোমাকে মিথ্যে কথা বলতে পারি?

সুধাময়ী চাপা হাসি হেসে বলে, হ্যাঁ, সত্যি তুই আমাকে খুব ভালবাসিস কিন্তু তবু বলছি, সব সত্যি কথা বলবি।

মা কালীর নামে দিব্যি করে বলছি, আমি সব সত্যি কথা বলব।

আচ্ছা চম্পা, নরেশ কে?

প্রশ্ন শুনে চম্পাকলির মাথা ঘুরে যায়। মুখ দিয়ে কোন কথা বেরোয় না।

বল, নরেশ কে?

চম্পাকলি ওকে জড়িয়ে ধরে বলে, ভালোদি, সব বলছি কিন্তু কাউকে বলবে না তো?

না, না, কাউকে বলব না।

নরেশের কথা অন্য কেউ জানলে আমাকে ঠিক আত্মহত্যা করতে হবে।

নারে চম্পা, কেউ জানবে না। বল, নরেশ কে?

নরেশ পণ্ডিতের ছাত্র।

আমাদের টোল বাড়িতেই থাকে?

হ্যাঁ।

তোর সঙ্গে ওর আলাপ হলো কোথায়?

বাগানে ; গঙ্গা থেকে ফেরার পথে।

রোজ তোদের দেখা হয়?

না, না, মঝে-মধ্যে।

তোদের মধ্যে ভালবাসা হয়েছে?

হ্যাঁ, ভালোদি, ওকে আমার খুব ভাল লাগে।

চম্পাকলি মুহূর্তের জন্য না থেমেই বলে যায়, নরেশকে দেখতে ভারী সুন্দর। তাছাড়া ওর কথা শুনলে মন ভরে যায়।

সুধাময়ী একটু হেসে বলে, আজকাল রোজ রাত্তিরে তুই ঘুমের মধ্যে আমাকে নরেশ ভেবে জড়িয়ে ধরে খুব আদর করিস।

চম্পাকলি চমকে ওঠে, সত্যি?

হ্যাঁ, সত্যি।

সুধাময়ী আবার একটু হেসে বলে, তুই তো ঘুমের মধ্যে আমার কাছে সবকিছু ফাঁস করে দিয়েছিস।

সবকিছু মানে?

সব কিছু মানে সবকিছু।

সুধাময়ী একবার নিঃশ্বাস নিয়েই বলে, এই তোদের আদর, ভালবাসা, সহবাসের কথা।

ভালোদি, সত্যি আমি ঘুমের মধ্যে এইসব বলেছি?

চম্পা, আমিও মা কালীর নামে দিব্যি করে বলছি, তুই এই সবকিছু ঘুমের ঘোরে আমাকে বলেছিস।

চম্পাকলি বোবা হয়ে যায়। কোন কথা বলে না। বলতে পারে না।

বেশ কিছুক্ষণ কারুর মুখেই কোন কথা নেই।

তারপর সুধাময়ী একটু হেসে বলে, একদিন নরেশকে দেখতে হবে।

চম্পাকলি সঙ্গে সঙ্গে মহা উৎসাহে বলে, ভালোদি, তুমি ওর সঙ্গে আলাপ করবে?

ও কেন আমার সঙ্গে আলাপ করবে? ও তো তোকে ভালবাসে।

আমি বলছি, তোমার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হলে ও খুব খুশি হবে।

তুই ঠিক বলছিস?

হ্যাঁ, ভালোদি, আমি ঠিকই বলছি।

কিন্তু কোথায় কিভাবে ওর সঙ্গে আলাপ হবে।

চম্পা একটু হেসে বলে, সে তোমাকে ভাবতে হবে না।

কেউ জানবে না তো?

না, না, কেউ জানবে না।

চম্পাকলি ওকে জড়িয়ে ধরে বলে, নরেশের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে তুমি যে কি খুশি হবে, তা ভাবতে পারবে না।

সুধাময়ী একটু হেসে বলে, তাই নাকি?

ভালোদি, তুমি বিশ্বাস করো, ওর সঙ্গে একটু মেলামেশা করলে তোমার প্রাণ জুড়িয়ে যাবে।

তাহলে তো আলাপ করতেই হবে।

পরের দিনই চম্পাকলি নরেশকে আগের দিন রাত্রের সব কথা ওকে বলে।

নরেশ চমকে ওঠে। বলে, তোমার ভালোদি পণ্ডিতকে সব বলে দেবে না তো?

না, না, সে ভয় নেই।

চম্পাকলি একটু না থেমেই বলে, ভালোদি সত্যি খুব দুঃখী।

দুঃখী কেন?

বছর পাঁচেকের মধ্যে এক রাতের জন্যও স্বামীর সোহাগ পায়নি ; অথচ ও বেচারা স্বামীর সোহাগের কাঙাল।

কি বলছ তুমি? পাঁচ বছরের মধ্যে এক রাতের জন্যও..

না, না, না।

চম্পাকলি একবার নিঃশ্বাস নিয়ে ওর দুটো হাত ধরে বলে, আমি যা বলব, তোমাকে তাই করতে হবে।

বলো, কি করতে হবে।

আমি গঙ্গায় যাবার সময় ভালোদিকে সঙ্গে আনব। তুমি সে সময় বাগানে পায়চারি করবে। আমি তোমাকে দেখে অবাক হবো, তুমিও আমাদের দেখে অবাক হবে।

তারপর?

ভালোদির সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দেব।

উনি আমার সঙ্গে আলাপ করবেন?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, করবেন।

চম্পাকলি একটু হেসে বলে, তারপর আমি বলব, ভালোদি। তুমি নরেশের সঙ্গে গল্প করো। আমি সাঁতার কেটে, চান করে ঘণ্টা খানেক ঘণ্টা দেড়েক পর ফিরব। তারপর আমরা একসঙ্গে বাড়ি ফিরব।

তোমার ভালোদি অতক্ষণ আমার সঙ্গে গল্প করবেন?

আমাকে ঘণ্টাখানেক কাছে রাখো কি করে?

নরেশ একটু হেসে বলে, কিন্তু..

কোন কিন্তু না ; ভালোদিকে প্রাণভরে আনন্দ দেবে।

প্রথম দিনই?

হ্যাঁ, প্রথম দিনই।

চম্পাকলি হেসে বলে, ভালোদিকে তুমি আনন্দ দিলে, সে আমার কথা কারুর কাছে বলতে পারবে না, বুঝেছ?

নরেশ এক গাল হেসে বলে, বুঝেছি। তুমি তো দারুণ বুদ্ধিমতী।

ওরে বাপু, চুরি করতে হলে একটু বুদ্ধি খাটাতে হবে না?

কবে ভালোদিকে নিয়ে আসবে?

একদিন আগে তোমাকে বলে দেব।

চম্পাকলিকে চুলে তেল দিতে দেখেই সুধাময়ী বড় গিন্নীর একটা হাত ধরে হাসতে হাসতে বলে, বড়দি, আমি চম্পার সঙ্গে গঙ্গায় যাই?

কেন? তুইও কি সাঁতার কাটবি?

আমি সাঁতার কাটতে জানি নাকি?

তবে যাবি কেন?

ওর সাঁতার কাটা দেখব ; আবার ওর সঙ্গেই ফিরে আসব। এখন তো বাড়িতে কোন কাজ নেই।

হ্যাঁ, ঘুরে আয়।

চম্পাকলি গলা চড়িয়ে বলে, ভালোদি, আমি কিন্তু ঘণ্টা খানেক-ঘণ্টা দেড়েকের আগে জল থেকে উঠব না। অতক্ষণ থাকতে পারবে তো?

সুধাময়ী এক গাল হেসে বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, পারব।

বাগানের পথে কিছুদূর এগুবার পরই হঠাৎ নরেশের সঙ্গে ওদের মুখোমুখি দেখা।

চম্পাকলি একগাল হেসে বলে, তুমি এই অসময়?

সেই ভোর থেকে পড়াশুনা করছিলাম বলে মাথা ঝিমঝিম করছিল। তাই...

ও ভাল কথা।

চম্পাকলি সুধাময়ীকে দেখিয়ে বলে, এই হচ্ছে আমার ভালোদি। আমাকে দারুণ ভালবাসে।

নরেশ একটু হেসে সুধাময়ীর দিকে তাকিয়ে বলে, হ্যাঁ, আপনার কথা অনেক শুনেছি।

চম্পার কাছে তোমারও অনেক প্রশংসা শুনেছি।

না, ভালোদি, প্রশংসা করার মত ছেলে আমি না। চম্পা নিশ্চয়ই বাড়িয়ে বলেছে।

চম্পাকলি একটু হেসে বলে, ভালোদি, তোমরা দু'জনে গল্প করো। আমি সাঁতার কেটে, চান করে এক-দেড় ঘণ্টার মধ্যেই ফিরব। তখন তুমি আর আমি একসঙ্গে...

সুধাময়ী বলে, এতক্ষণ কি গল্প করব?

ও হাসতে হাসতেই বলে, ও ভালোদি, এক-দেড় ঘণ্টা তো দূরের কথা, নরেশের সঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টা কাটাবার পরও তোমার মনে হবে, আরো কিছুক্ষণ থাকলে ভাল হতো।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, ভালোদি, হ্যাঁ।

এবার চম্পাকলি নরেশকে বলে, দেখো, আমার ভালোদি যেন তোমার সঙ্গে আলাপ করে ষোল আনা খুশি হয়েই বাড়ি ফেরে।

দরজায় খিল দিয়ে শোবার পরই সুধাময়ী চম্পাকলিকে জড়িয়ে ধরে একবার চুমু খেয়ে বলে, তোকে যে কি করে ধন্যবাদ জানাবো, তা ভেবে পাচ্ছি না।

আমাকে ধন্যবাদ জানাবার কি কারণ ঘটলো?

ওরে হতভাগী, তোর জন্যই তো নরেশের সঙ্গে আলাপ হলো।

নরেশকে কেমন লাগলো?

খুব ভাল লেগেছে।

খুব সুন্দর কথা বলে না?

ওর সবকিছুই সুন্দর।

চম্পাকলি খুব চাপা গলায় বলে, নরেশ কি তোমাকে একটু আদর-টাদর করেছে?

চম্পা, তোকে আমি মিথ্যে বলব না। ও আমাকে যে কি আদর করেছে, তা বলতে পারব না। ওর আদরে আমি আনন্দে পাগল হয়ে যাবার পর আর নিজেকে সংযত রাখতে পারিনি।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, চম্পা, পাঁচ বছর খরার পর নরেশের কৃপায় আমার জীবনে বৃষ্টি নামল। কি আনন্দ, কি সুখ যে পেয়েছি, তা মুখে বলা যায় না।

ভালোদি, তোমার মনের মধ্যে কত দুঃখ, কত কষ্ট হযেছিল, তা আমি ভাল করেই জানি। তাইতো তোমাকে আজ খুশি দেখে, আমার খুব ভাল লাগছে।

সত্যি তোর ভাল লাগছে?

হ্যাঁ, ভালোদি, সত্যি ভাল লাগছে?

তোর ভালবাসার পাত্রের উপর ভাগ বসালাম বলে রাগ হচ্ছে না?

রাগ হবে কেন? তোমার-আমার তো একই দুঃখ একই কষ্ট। তাই তো আনন্দও আমরা দু'জনে ভাগ করে নেব।

তাই আমাকে আবার নরেশের কাছে নিয়ে যাবি?

নেব না কেন?

হ্যাঁ ভাই, তুই আমাকে মাঝে মঝে নরেশের কাছে নিয়ে যাবি।

যেদিনই আমার সঙ্গে ওব দেখা হবে, তার দু'একদিন পরই আমি তোমাকে ওর কাছে নিয়ে যাব।

বছর দেড়েক পরের কথা।

হরিমোহন টোল বাড়িতে ছাত্রদের পড়িয়ে মধ্যাহ্নভোজনের জন্য বাড়ির উঠোনে পা দিতেই চিৎকার চেঁচামিচি শুনে বেশ বিরক্ত হয়ে বলেন, কি ব্যাপার কি? মনে হচ্ছে, বাড়িতে যেন ডাকাত পড়েছে।

পণ্ডিতমশাইকে দেখেই অন্য সবাই চুপ করে গেলেও বড় গিন্নী চুপ করে

থাকতে পারেন না। বলেন, চম্পা এখনও কেন গঙ্গা থেকে ফিরল না? আমার বড্ড ভয় করছে।

ও কখন গঙ্গায় গিয়েছে?

সে অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। ও কোন কালে এত দেরি করে না।

বড় গিন্নী কোনমতে একবার নিঃশ্বাস নিয়েই বলেন, ও গঙ্গায় যাবার পর পরই চক্কোত্তি বাড়ির পিসী গঙ্গায় গিয়েও ফিরে এলেন বানের ভয়ে৷ তাই...

ও বান আসার আগেই গিয়েছিল?

হ্যাঁ।

হরিমোহন সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেলেন টোলবাড়ি। তারপর ছাত্রদের নিয়ে গঙ্গার পাড় ধরে এদিক-ওদিকে বহুদূর ঘুরাঘুরি করেও চম্পাকলির দেখা পেলেন না। আশেপাশে যে ক'জন মাঝিমাল্লা ছিল, তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেও কোন খবর পাওয়া গেল না।

খবর ছড়িয়ে পড়ার পর পাড়া-প্রতিবেশীদের অনেকেই ছুটে গেলেন গঙ্গার ঘাটে। পাঁচ-সাতটা নৌকা নিয়ে গঙ্গায় অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কোন সুখবর শোনা গেল না। সবার মুখেই এক কথা, যে মেয়ে এত ভাল সাঁতার জানতো, সে কি করে গঙ্গায় ডুবে যাবে?

বান এসেছিল যে।

যে মেয়ে এত বছর ধরে গঙ্গায় সাঁতার কাটছে, সে কখনই বানের সময় সাঁতার কাটতে পারে না।

শুধু সেদিন না, পরের দিনও চম্পাকলির কোন খবর পাওয়া গেল না। যারা গঙ্গায় মাছ ধরে, সেই জেলেরাও বলল, না, না, আমরাও কোথাও কিছু দেখিনি।

তিন দিন পরে চম্পাকলির প্রাণহীন দেহ ভেসে উঠলো নৈহাটির ঘাটে।

কি করে যে এই দুর্ঘটনা ঘটলো, তা কেউ বুঝতেও পারলো না, জানতেও পারলো না।

সুধাময়ী কাউকে বলতে পারলো না, কোন দুর্ঘটনা না, চম্পাকলি আত্মহত্যা করেছে, না করে উপায় ছিল না।

পাঁচ

রামমোহন কালেক্টর ডিগরি সাহেবের অধীনে দেওয়ান হিসেবে রামগড় ও ভাগলপুরে কাজ করার পর এলেন রংপুব।

সারাদিন দেওয়ানের গুরুদায়িত্ব পালন করে ক্লান্ত হলেও বাড়ি ফিরে রামমোহন বিশ্রাম করতেন না।

বিশ্রাম করবেন কি করে? জীবনের আসল কাজই তো বাকি।

বাড়ির মধ্যেই সন্ধের পর রামমোহন ধর্মালোচনা করেন কিছু মানুষের সঙ্গে। পৌত্তলিকতার বিপক্ষে ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভের একান্ত প্রয়োজনীয়তার কত যুক্তি উপস্থিত করেন। ধীরে ধীরে রামমোহনের এই ধর্মালোচনার আসরে শ্রোতার সংখ্যা বাড়তেই খবর ছড়িয়ে পড়ে শহরের নানা মহলে।

ব্যস! সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো বিরুদ্ধাচরণ।

জজ্ কোর্টের দেওয়ান ও সুপণ্ডিত গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য 'জ্ঞানাঞ্জন' নামে একটা বই লিখে রামমোহনের মতবাদের তীব্র সমালোচনা করেন।

এই দলাদলি তর্ক-বিতর্কের খবর ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে ; কলকাতা থেকে রাধানগর গ্রাম পর্যন্ত।

রামমোহন মনে মনে স্থির করলেন, না, সরকারী চাকরি করে অভীষ্টলাভ সম্ভব নয়। মন-প্রাণ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারে আর সমাজ কল্যাণের কাজে। কালবিলম্ব না করে সরকারী চাকরি ত্যাগ করে চলে এলেন কলকাতায়।

এখানেও পদে পদে শত্রুতা আর বিরুদ্ধাচরণ।

প্রথমেই ছেলের বিয়ের সময় একদল গোঁড়া হিন্দু ক্ষেপে উঠলেন রামমোহনের বিরুদ্ধে। শেষ পর্যন্ত রামমোহনের ছেলের বিয়ে ঠিকই হলো কিন্তু উনি মর্মে মর্মে বুঝলেন, গোঁড়াপন্থীরা ওকে শান্তিতে থাকতে দেবে না।

এর পর শুরু হলো রাধানগর ও আশেপাশের হাজাব হাজার গ্রামবাসীর বিরুদ্ধাচরণ। রামমোহনের বাড়ির চারপাশে দিনরাত্রি তারা ঢাক-ঢোল পেটায়, চিৎকার করে, নানারকম কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করে কিন্তু রামমোহন নীরব থেকেই তাদের উপেক্ষা করেন। তারপর একদিন সবকিছু থেমে যায়।

রামমোহন পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে যতই সোচ্চার ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভের প্রয়োজনীয়তার কথা যতই প্রচার করেন, ততই তাঁর গর্ভধারিণী ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। শেষ পর্যন্ত রামমোহন সপরিবারে গৃহত্যাগ করে রঘুনাথপুরে এক শ্মশানভূমিতে ঘরদোর তৈরি করে বসবাস শুরু করেন। উনি নতুন বাসস্থানের সামনে একটা মঞ্চও

তৈরি করেন। ঐ মঞ্চের চারপাশে খোদাই করে লেখা হয়—'ওঁ তৎসৎ' ও একমেবাদ্বিতীয়ং'।

শেষ পর্যন্ত রামমোহন স্বদেশ ও স্বদেশবাসীব কল্যাণের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বহু জ্ঞানী-গুণী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা তাঁর কাছে আসতে শুরু করলেন।

সাদা ধবধবে সুন্দর দুটি ঘোড়ায় টানা গাড়ি বাড়ির মধ্যে থামতেই একজন কর্মচারী ছুটে এসে আরোহীকে বলে, আজ্ঞে, মহাশয়ের নাম?

রায় মশাইকে বলো, জোড়াসাঁকোর দ্বারকানাথ ঠাকুর এসেছেন।

আপনি দয়া করে ভিতরে এসে বসুন। আমি মুনিবকে খবর দিচ্ছি।

দ্বারকানাথ ঘরে এসে বসতে না বসতেই এক জ্যোতির্ময় পুরুষ তাঁর সামনে এসে হাত জোড় কবে নমস্কার করে বলেন, আমি রামমোহন রায়।

দ্বারকানাথ প্রতি নমস্কার করেই বলেন, আজ্ঞে আমি জোড়াসাঁকোর দ্বারকানাথ ঠাকুর। আমার আগেই আসা উচিত ছিল কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে ব্যস্ত থাকায় সময় পাইনি।

তুমি এসেছ বলে আমি সত্যি খুশি হয়েছি কিন্তু...

রামমোহন কথাটা শেষ করেন না।

দ্বারকানাথ বলেন, কিন্তু কি?

রামমোহন একটু হেসে বলেন, শুনেছি, তোমরা খড়দহ'র গোঁসাইদের শিষ্য।

আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন।

তোমাদের বাড়িতে তো দুর্গাপূজা, কালীপূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা ইত্যাদি হয়, তাই না?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

দ্বারকানাথ মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, আমার মাতৃদেবী অত্যন্ত পুণ্যবতী ও ধার্মিক। আমি তাঁর নির্দেশ ও শিক্ষানুসারে অন্যান্য ব্রাহ্মণদের মতই আচার-বিচার পালন করি। আমি ইহজীবনে মাতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করতেও পারব না, তাঁকে দুঃখ দিতেও পারব না।

তুমি আমাকে বিধর্মী মনে করো না?

কখনই না।

তুমি আমার কাছে এলে কেন?

আপনি মহাজ্ঞানী। তাছাড়া দেশ ও দেশবাসীর কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করা
জন্যই আপনি চাকরি ছেড়ে এখানে এসেছেন।

দ্বারকানাথ না থেমেই বলেন, আমি এসেছি দুটি কারণে।

শুনি কারণ দুটি।

প্রথমত, আপনাকে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছি। দ্বিতীয়ত, দেশ ও দেশবাসী
কল্যাণেব জন্য আপনার নির্দেশ মত আমিও কিছু কবতে পারলে নিজেকে ধন্য ম
করব।

দ্বারকানাথ মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, আপনি ছাড়া কেউই দেশ বা দেশবাসী
কথা ভাবছে বলেও তো মনে হয় না।

রামমোহন উঠে দাঁড়িয়ে দূরের আকাশের দিকে তাকিয়ে বলেন, দ্বারকানা
দেশের মানুষ অশিক্ষা-কুশিক্ষা, অনাচার-ব্যভিচার কুসংস্কারের জন্য পশু-সুল
জীবন যাপন কবছে। ভাবতে গেলে আমার মাথা ঘুরে যায় কিন্তু চুপ করে ব
থাকতে পাববো না।

আমি জানি, দেশ ও দেশবাসীর জন্য অনেক কিছু না করা পর্যন্ত আপনি শান্তি
ঘুমুতেও পারছেন না। যে যুদ্ধে আপনি সেনাপতি, সে যুদ্ধে জয়লাভ অবশ্যম্ভাবী

রামমোহন ওনার দিকে তাকিয়ে একটু হাসেন।

দ্বারকানাথ বলেন, আপনার মত সেনাপতির অধীনে আমি সৈনিক হবার গৌর
অর্জন করতে চাই।

দ্বারকানাথ, তুমি শিক্ষিত, সুপ্রতিষ্ঠিত, নিজের চেষ্টায় ব্যবসা-বাণিজ্যে অভাবনী
সাফল্য অর্জন করেছ, তুমি বিত্তশালী কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা, তুমিও দে
ও দেশবাসীব জন্য অত্যন্ত চিন্তিত।

আজ্ঞে হ্যাঁ, সত্যি আমি চিন্তিত।

তুমি শুধু চিন্তিত না, কিছু কবতেও চাও। তাইতো তোমার সঙ্গে আলাপ ক
শুধু খুশি হইনি, বেশ উৎসাহবোধ করছি। তোমার মত বন্ধুকে সত্যি আমার এক
প্রয়োজন।

বেশ কিছুদিন দ্বারকানাথেব দেখা নেই। বামমোহন সত্যি একটু চিন্তিত না হ
পারেন না। মনে মনে ভাবছেন, কাউকে খবর নিতে পাঠা'বেন নাকি নিজেই একব
জোড়াসাঁকোয় যাবেন।

ঠিক সেই সময় দ্বারকানাথ এসে হাজির।

রামমোহন সাদরে তাঁর অভ্যর্থনা করেই বলেন, তোমাকে এমন বিমর্ষ দেখাচ্ছে কেন? শরীর কি খারাপ?

আজ্ঞে শরীর ঠিকই আছে।

তবে কি বাড়িতে কারুর কিছু...

আমাদের প্রথম সন্তানটি নিতান্তই অকালে চলে গেল।

সে কি!

আজ্ঞে হ্যাঁ।

দ্বারকানাথ মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, মেয়েকে হারিয়ে আমার স্ত্রী আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে দিনরাত কাঁদছে। কিছুতেই তাঁকে শান্ত করা যাচ্ছে না।

রামমোহন সত্যি বিচলিত হন।

আরো দুঃখের বিষয় হচ্ছে, এক দৈবজ্ঞ বলেছেন, আমার স্ত্রীর গর্ভের কোন সন্তানই দীর্ঘজীবী হবে না। ঐ দৈবজ্ঞের কথা শুনে আমার স্ত্রী আরো বেশি কান্নাকাটি শুরু করেছে।

দ্বারকানাথ প্রায় কাঁদতে কাঁদতে বলেন, আপনি বিশ্বাস করুন, আমি স্ত্রীর কষ্ট-দুঃখ সত্যি সহ্য করতে পারছি না। আপনি বলুন, আমি কি করব।

দ্বারকানাথ তোমাকে আর যে পরামর্শই দিই না কেন, দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করার কথা বলব না।

না, না, ও কাজ আমার দ্বারা কখনই হবে না। আমি আমৃত্যু এই স্ত্রীকে নিয়েই সংসার করবো।

রামমোহন কয়েক মিনিট ঘরের মধ্যে পায়চারি করে বলেন, দ্বারকানাথ আমার একটা কথা রাখবে?

অবশ্যই রাখবো।

রংপুরে একজন অসামান্য তন্ত্রসাধক আছেন। তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধাও আছে, আস্থাও আছে। আমার স্থির বিশ্বাস, উনি তোমাদের এই সমস্যার সমাধান করতে পারবেন।

আপনার যখন আস্থা আছে, তখন দয়া করে তাঁকে কলকাতায় আনার ব্যবস্থা করে দিন।

হ্যাঁ, দ্বারকানাথ, আমি কালই রংপুরে খবর পাঠাচ্ছি।

দিন পনের পর দ্বারকানাথকে দেখেই রামমোহন বলেন, তান্ত্রিক সাধকের ক্রিয়া-

কর্মের পর তোমার স্ত্রী কি একটু মানসিক শান্তি পেয়েছেন?

হ্যাঁ, সে খুবই শান্তি পেয়েছে।

দ্বারকানাথ মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, ঐ সাধক আমার স্ত্রীকে বলেছেন, আশা করি তোমাকে আর সন্তান হারাবার দুঃখ পেতে হবে না।

খুবই ভাল কথা।

সাধক একথাও আমার স্ত্রীকে বলেছেন, আমাদের পরবর্তী সন্তান অত্যন্ত দীর্ঘজীবী হবে। এই কথা শুনে আমার স্ত্রী খুব খুশি হয়েছেন।

খুবই স্বাভাবিক। সন্তান দীর্ঘজীবী হবে জানলে মা তো খুশি হবেই।

রামমোহন একটু থেমে বলেন, কাল সকালে ডেভিড হেয়ার নামে আমার এক নতুন বন্ধু আসবেন। সে সময় তুমি উপস্থিত থাকলে খুবই ভাল হয়।

হেয়ার সাহেব কি করেন?

রামমোহন একটু হেসে বলেন, দ্বারকানাথ, এই সংসারে কিছু পাগল আছে যারা নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করে শান্তি লাভ করতে পারেন না। এই পাগলের দলই এমন কিছু কাজ করেন বা করতে চান, যার দ্বারা দেশের কল্যাণ হয়। মানুষের কল্যাণ হয়।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, ডেভিড হেয়ার এইরকমই একটা পাগল।

বাঃ! খুবই ভাল কথা কিন্তু উনিও কি ব্রহ্মজ্ঞান লাভে আগ্রহী?

না, না।

রামমোহন না থেমেই বলেন, হেয়ারের স্থির বিশ্বাস, এ দেশের মানুষ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হলে সমাজ বা দেশের প্রকৃত উন্নতি হওয়া সম্ভব নয়।

সত্যিই তাই।

দ্বারকানাথ না থেমেই বলে যান, আমি ইংরেজদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করে বুঝেছি, বিদ্যায়-বুদ্ধিতে শিল্প-বিজ্ঞানে ওদের সমকক্ষ না হলে দেশের উন্নতি হবে না।

দ্বারকানাথ, আমিও মনেপ্রাণে বিশ্বাস কবি, শুধু অশিক্ষার জন্যই আমাদেব সমাজে এত ব্যাভিচার ও কুসংস্কার। মানুষ শিক্ষিত হলে কি বিশ-পঁচিশ-পঞ্চাশটা বিয়ে করতে পারে?

ঠিক বলেছেন।

এই বহু বিবাহের জন্য ঘরে ঘরে ব্যভিচার চলছে। অতৃপ্ত অখুশি বিবাহিতা মেয়েদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে একদল চরিত্রহীন লম্পট। আধুনিক শিক্ষার প্রসার না হলে এসব কিছুতেই বন্ধ করা যাবে না। অশিক্ষা, কুশিক্ষা, কুসংস্কারের জন্যই

তো সতীদাহ হচ্ছে।

তা ঠিক কিন্তু কোম্পানি তো আমাদের দেশের মানুষকে আধুনিক শিক্ষা দিতে চায় না।

রামমোহন একটু হেসে বলেন, কোম্পানির ধারণা, আমেরিকার লোকজন ইংরেজি শিখেছিল বলেই ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। ওদের আশঙ্কা ভারতের মানুষও ইংরেজি শিখে বিদ্রোহ করতে পারে।

বিচিত্র যুক্তি!

যাইহোক দ্বারকানাথ, তুমি শুনলে অবাক হবে, এই ডেভিড হেয়ার ১৮০০ সালে কলকাতায় আসে ঘড়ির ব্যবসা করতে কিন্তু লোকটা খুব মিশুকে বলে প্রাণ খুলে লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করে বুঝতে পারে, এখানকার অধিকাংশ মানুষই অশিক্ষিত, কূপমণ্ডুক, কুসংস্কারাচ্ছন্ন।

রোগটা তো ঠিক ধরেছেন।

সত্যি রোগ ঠিকই ধরেছে।

রামমোহন মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, হেয়ারের ব্যবসা খুবই ভাল চলছিল কিন্তু সে ব্যবসা বন্ধুকে বিক্রি করে এখন দিনরাত ঘুরে বেড়াচ্ছে আধুনিক শিক্ষা দেবার একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য।

শুনেই তো মানুষটিকে শ্রদ্ধা না করে পারছি না।

দ্বারকানাথ না থেমেই বলে, আপনি আর হেয়ার সাহেব যখন শিক্ষার ব্যাপারে একই মত পোষণ করেন, তখন নিকট ভবিষ্যতেই সুফল ফলতে বাধ্য।

হ্যাঁ, আমিও আশাবাদী কিন্তু কোম্পানি তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগে কাশীতে সংস্কৃত কলেজ ও কলকাতায় মাদ্রাসা খোলা ও চালাবার জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় করলেও ইংরেজি বিদ্যালয় খোলার জন্য তো কোন সাহায্য করবে না।

অর্থের জন্য কোন শুভ কাজ আটকে থাকে না। কোম্পানি বাহাদুর সাহায্য না করলেও অর্থাভাবে আপনাদের উদ্যম ব্যর্থ হবে না।

স্বয়ং রামমোহনের সমর্থন লাভের পর ডেভিড হেয়ার দ্বিগুণ উৎসাহে হাজির হলেন সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড হাইড ইস্টের কাছে। হেয়ারের বক্তব্য শোনার পর স্যার এডওয়ার্ড বললেন, যদি শিক্ষিত ও ভদ্র হিন্দুদের সমর্থন আদায় করতে পারেন, তাহলে একটা আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার ব্যাপারে আমি যথাসাধ্য সহযোগিতা করব।

অনেক হিন্দু নেতাই হেয়ার সাহেবের প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানালেন কিন্তু ও
সোজাসুজি বলে দিলেন, বিধর্মী রামমোহনকে এই উদ্যোগের সঙ্গে জড়িত ক
চলবে না।

ওদের কথা শুনে ডেভিড হেয়ার মনে মনে অত্যন্ত আঘাত পেলেও মুখে কি
বললেন না।

গোঁড়া হিন্দুদের মনোভাবের কথা রামমোহনের কানে পৌঁছলো। উনি হেয়ার
বললেন, এই অভাগা দেশের ছেলেদের আধুনিক শিক্ষা দেবার প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠা
পথে আমি কখনই অন্তরায় হতে পারি না। আপনার এতদিনের প্রচেষ্টা, পরিশ্র
অর্থব্যয় এবং নিষ্ঠার জন্যই এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে চলেছে।

রামমোহন ওর দুটি হাত ধরে বলেন, মিঃ হেয়ার, আপনি আমার বন্ধু হলে
আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি। আমি বিশ্বাস করি, আমার দেশবাসী কোনদিন আপনা
ভুলবে না।

ডেভিড হেয়ার ওকে জড়িয়ে ধরে বলেন, আমি অতি অল্পই লেখাপড়া শিখে
কিন্তু এই কলকাতা শহরে এসে ঘড়ির ব্যবসা কবে যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করেছি
তাই তো এই দেশে একটা আধুনিক বিদ্যালাভের প্রতিষ্ঠান গড়তে পারলেই আ
নিজেকে ধন্য মনে কবব।

হেয়ার সাহেব একটু থেমে বলেন, আপনি শুধু মহাপণ্ডিত না, আপনি আদর্শবা
চরিত্রবান, ঈশ্বর ভক্ত, সত্যবাদী, নিষ্ঠাবান। আপনি এই সমাজের কলঙ্ক, কুসংস্কা
ব্যাভিচার দূর করার জন্য যে যুদ্ধ শুরু করেছেন, তাতে নিশ্চয়ই জয়লাভ করবেন

রামমোহন একটু হাসেন।

আপনি অসাধাবণ হয়েও যে আমাকে বন্ধু মনে করেন, তার জন্য আমি সতি
গর্বিত।

কিছুদিন পবেই ১৮১৭ সালের ২০শে জানুয়ারি হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলো

জগদ্ধাত্রী দেবী স্বামীকে ওভাবে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকতে দেখেই
জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি কোন কারণে চিন্তিত?

একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বামকৃষ্ণ বলেন, হ্যাঁ, গিন্নী, সত্যিই আমি চিন্তিত

হঠাৎ এত চিন্তিত হবার কি কারণ ঘটলো?

দেশ-কাল-পাত্র সব ব্যাপারেই চিন্তিত।

জগদ্ধাত্রী একটু হেসে বলেন, একেবারে দেশ কাল-পাত্র সব ব্যাপারেই চিন্তিত

য় পড়লে?

গিন্নী, বিশ্বাস করো, চিন্তিত না হয়ে উপায় নেই।

রামকৃষ্ণ মুহূর্তের জন্য থেমে যেন আপনমনেই বলেন, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মলে আমাদের এই কৃষ্ণনগর বঙ্গদেশের সভ্যতা সংস্কৃতির পীঠস্থান ছিল।

উনি স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলেন, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আমলেই নবদ্বীপ, গুপাড়া, ত্রিবেণী আর শান্তিপুরেব পণ্ডিতদের খ্যাতি সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। মি ভাবতে পারো, ঐ মহারাজের অনুরোধেই ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর রচনা করেন ন্নদামঙ্গল'-এর মত মহাকাব্য।

জগদ্ধাত্রী দেবী কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির দেওয়ান রাধাকান্ত রায়ের কন্যা। তাই তো ১ মনে শোনেন কৃষ্ণনগরের গৌববময় ইতিহাস।

রামকৃষ্ণ আবার বলেন, শুধু সভ্যতা-সংস্কৃতিব পৃষ্ঠপোষক না, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র দুধর্ম ও সমাজের প্রধান রক্ষক ছিলেন। এঁরই হুকুমে যশোরের পিরালী ব্রাহ্মণ র বৈদ্যদের পৈতে ধারণ বন্ধ হয়।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, গিন্নী, হ্যাঁ।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, যে কৃষ্ণনগর নিয়ে আমাদের গর্বের সীমা ছিল সেই কৃষ্ণনগরের বর্তমান অবস্থার কথা ভাবতেও আমার লজ্জা করে, চোখে ন আসে।

আমাদের এই কৃষ্ণনগরে কি এমন ঘটছে যে তোমার এত দুঃখ? শুনেছি, ানকার রাজা শ্রীশচন্দ্র বেশ ভাল মানুষ।

হ্যাঁ, গিন্নী, শ্রীশচন্দ্রের অনেক সদগুণও যেমন আছে, তেমনি চারিত্রিক দোষও । নেই।

সেকি?

হ্যাঁ, গিন্নী, সত্যিই তাই।

রামকৃষ্ণ একটু ম্লান হেসে বলেন, সূর্য অস্ত যাবার পর শ্রীশচন্দ্র সঙ্গীত, সুরা, াদের নৃত্য ছাড়াও তাদের সঙ্গে লীলাখেলা করেন এক দল তাঁবেদার আর ।সাহেবদের সান্নিধ্যে।

এ রাম রাম!

তুমি 'রাম' 'রাম' করলে কি হয়, যে দেশের সমাজপতি কিশোরী-যুবতী ীদের নিয়ে আনন্দ করেন, সে দেশের অবস্থা কি সুস্থ স্বাভাবিক থাকতে পারে?

জগদ্ধাত্রী দেবীর মুখে আর কথা নেই।

এই শহরে আরো কত কি হচ্ছে, তা তুমি কল্পনা করতে পারবে না।

আরো কি হচ্ছে মানে?

ইংরেজরা আসার সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছু বদলে গেছে। ইংরেজরা নদীর কাছে আদালত চালু করেছে। বাইরের অনেক আমলা, উকিল-মোক্তার এই শহরে এসে বসবাস শুরু করেছে।

তাতে ক্ষতি কি?

রামকৃষ্ণ একটু না হেসে পারেন না। বলেন, এইসব আমলা-উকিল-মোক্তারর পরিবারকে দেশে রেখে এসেছেন। পরিবারকে নিয়ে কর্মস্থলে বসবাস করার রেওয়াজ তো নেই। তাই এরা এখানে উপপত্নী বা রক্ষিতার সঙ্গে বসবাস করছেন

ভগবান! এরা কি মানুষ?

গিন্নী, শুধু এইটুকু শুনেই ঈশ্বরকে স্মরণ করো না। এখনও অনেক কিছু বল বাকি।

এর পর আর কি বলবে?

এইসব আমলা বা উকিল-মোক্তারদের সঙ্গে কোন ব্যাপারে কথাবার্তা শলা পরামর্শ করতে হলে ঐসব উপপত্নী-রক্ষিতাদের বাড়িতে সবাইকে যেতে হচ্ছে

আর তোমাকে বলতে হবে না। এসব আমি শুনতে চাই না।

এসব আমি বলতেও চাই না, শুনতেও চাই না কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি না জানলে তো ঠিক মত সন্তানদের মানুষ করা যায় না।

আমাদের ছেলে দুটো তো খারাপ না। আমাদের চিন্তার কি আছে?

দেখো গিন্নী, তুমি অত্যন্ত ভদ্র ও আদর্শ পরিবারের কন্যা। তুমি নিজেও অত্যন্ত ধার্মিক ও সৎ জীবন যাপন করো। আমাদের লাহিড়ী বংশও অত্যন্ত পবিত্র ও ভদ্র। তাইতো আমাদের জ্যেষ্ঠ সন্তান কেশব শিক্ষিত, ভদ্র ও সদাচারী হয়েছে কিন্তু কনিষ্ঠ পুত্র রামতনু তো নিতান্তই কিশোর।

জগদ্ধাত্রী দেবী পরিতৃপ্তির হাসি হেসে বলেন, আমার কেশবের মত পিতৃ মাতৃভক্ত সন্তান সত্যি দুর্লভ। তুমি ভাবতে পারো, ও আমাকে ঠাকুরের আসনে বসিয়ে আমার চরণ পূজা করে।

শুনে রামকৃষ্ণের মুখেও খুশির হাসি ফুটে ওঠে। বলেন, গিন্নী, তুমি পর পুণ্যবতী বলেই কেশবের মত সুসন্তান গর্ভে ধারণ করেছ।

ওগো, তুমি দেখো, আমার রামতনুও ঠিক কেশবের মতই পিতৃ-মাতৃভক্ত হবে

হ্যাঁ, আমিও তাই আশা করি কিন্তু রামতনুকে এই কৃষ্ণনগরে রাখা সমীচীন হবে না।

কেন?

গিন্নী, অত্যন্ত দুঃখে ও বেদনায় একটা কথা বলতে চাই।

জগদ্ধাত্রী অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে বলেন, আমার রামতনু কি তোমাকে কোন দুঃখ দিয়েছে?

না, না, ও কোন দুঃখ দেয় নি।

তবে?

বলছি, বলছি।

রামকৃষ্ণ দু'এক মিনিট চুপ করে থাকার পর বলেন, দুর্গা পূজা-কালী পূজার সময় যেমন কিশোররা দলবেঁধে মূর্তি দেখে বেড়ায়। ঠিক সেইরকম আজকাল এই শহরের কিশোরের দল বিকেলের দিকে পতিতা পল্লীতে পতিতা দেখতে যায়।

কি সর্বনাশ! কি সর্বনাশ!

রামকৃষ্ণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, এই বিষাক্ত পরিবেশ থেকে রামতনুকে দূরে রাখতেই হবে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই করো।

ঠিক বারো বছর পূর্ণ হবার পর পরই রামতনু কলকাতায় দাদা কেশবচন্দ্রের কাছে এলেন ভাল করে লেখাপড়া শেখার জন্য।

কৃষ্ণনগরে থাকতেই রামতনু পারসী ভাষা শেখেন ; আর সামান্য ইংরেজি শিখেছিলেন। কেশবচন্দ্র সকাল-সন্ধেয় অত্যন্ত যত্ন করে ছোট ভাইকে আরবী, ফারসী আর ইংরেজি শেখাতে শুরু করলেন। কেশবচন্দ্রের স্বপ্ন ছিল, ছোট ভাইকে কোন ভাল ইংরেজি স্কুলে পড়াতেই হবে।

রামতনুর লেখাপড়া আশানুরূপের মতই এগিয়ে চলে কিন্তু কেশবচন্দ্রের দুঃশ্চিন্তা অন্য কারণে। কেশবচন্দ্র তখন থাকেন কলকাতার উপকণ্ঠে ও মহাতীর্থ কালীঘাটের পাশের চেতলাতে। দেশদেশান্তরের লোক আসে এই তীর্থে ; তাছাড়া কালীঘাটের গঙ্গায তখন দূর-দূরান্তর থেকে নানারকম সামগ্রী বোঝাই করে পূর্ববঙ্গের ব্যবসাদারদের শত শত নৌকা আসে। ঐসব সামগ্রী বিক্রি করে ও কলকাতা থেকে অন্যান্য মালপত্র কিনে ব্যবসাদাররা কদিন পরই চলে যায় নিজেব নিজের গ্রামে-গঞ্জে। এই তীর্থযাত্রী আর পূর্ববঙ্গের ব্যবসাদার-মাঝিদেব মনোরঞ্জনের জন্য কালীঘাট আব চেতলায় শত শত পতিতা বাস করে।

কেশবচন্দ্র কাজের জন্য সারাদিন বাড়ির বাইরে থাকেন। ছোটভাইকে দেখাশুনা

করে এক দাসী কিন্তু দাসী যদি সুকুমার মতি রামতনুকে বিপথগামী করে? অথবা যদি আশেপাশের কোন অল্প বয়সী পতিতার সংস্রবে আসে?

না, না, এখানে রামতনুকে রাখা কখনই সমীচীন হবে না। তাছাড়া চেতলা এলাকায় তো কোন ইংরেজি স্কুলও নেই। ওকে কলকাতায় রাখতে হবে।

কিন্তু কলকাতায় কোথায় কার কাছে এই প্রাণ প্রিয় ভাইকে রেখে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়?

ভাগ্যক্রমে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ হলো হেয়ার সাহেবের স্কুলের পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের সাথে। হ্যাঁ, তিনি সাহেবের স্কুলে রামতনুকে ভর্তি করার ব্যাপারে সাহায্য করতে সম্মতি দিলেন। রামতনু চেতলা থেকে এলেন বিদ্যালঙ্কারের হাতিবাগানের বাসায়।

দু'একদিন পরই গৌরমোহন রামতনুকে বললেন, কাল খুব ভোরে উঠবে। তোমাকে নিয়ে হেয়ার সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গ্রে সাহেবের বাড়ি যাবো।

রামতনু সম্মতিতে মাথা নাড়ে।

নামে হিন্দু কলেজ হলেও সবাই বলতো, হেয়ার সাহেবের স্কুল। অভিভাবকরা ছেলেদের ঐ স্কুলে পড়াবার জন্য পাগল। হেয়ার সাহেব যখন যেখানে যান, সেখানেই অভিভাবকরা আর ছেলেরা ওকে ঘিরে ধরে অনুনয়-বিনয় করে ভর্তি হবাব জন্য কিন্তু উনি অত ছেলেকে নেবেন কি করে? স্কুলে জায়গা কোথায়?

হেয়ার সাহেবকে বাধ্য হয়েই বলতে হয়, কি করে ভর্তি করব? আর একজন ছাত্রও নেবার মত জায়গা নেই।

গৌরমোহন এসবই জানতেন কিন্তু সাত সকালে চাঁদপাল ঘাটের কাছে গঙ্গার ধারে গ্রে সাহেবের বাড়িতে হাজির হন রামতনুকে সঙ্গে নিয়ে। বাড়ির সামনে হেয়ার সাহেবের পাল্কি দেখে গৌরমোহন বলেন, বামতনু, এই হচ্ছে হেয়ার সাহেবের পাল্কি। উনি বোধহয় এখুনি বেরুবেন। উনি বেরুলেই আমি ওনাকে অনুরোধ কবব তোমাকে ভর্তি করে নেবার জন্য।

রামতনু চুপ করে থাকে।

হেয়ার সাহেব অত্যন্ত দয়ালু। তাছাড়া তোমাদের মত ছাত্রদের উনি ঠিক নিজের সন্তানের মতই স্নেহ করেন।

বিদ্যালঙ্কার মশায়ের কথা শুনে রামতনু আশান্বিত হয়।

একটু পরেই হেয়ার সাহেব বাড়ির বাইরে আসতেই গৌরমোহনকে দেখে অবাক হন। বলেন, পণ্ডিতমশাই কি ব্যাপার?

রামতনুকে দেখিয়ে উনি নিবেদন করেন, ছেলেটি অত্যন্ত সৎ পরিবারের সন্তান।

খুবই মেধাবী ছাত্র। আপনি দয়া করে ওকে স্কুলে ভর্তি হবার অনুমতি দিলে খুবই বাধিত হবো।

পণ্ডিত, আমি দুঃখিত। একজন ছাত্রও নেবার মত জায়গা নেই।

হেয়ার সাহেব সঙ্গে সঙ্গে পাল্কি চড়ে বেরিয়ে যান।

গৌরমোহন বললেন, রামতনু, তোমাকে কিছুকাল হেয়ার সাহেবের পাল্কির পিছনে পিছনে ছুটতে হবে। হেয়ার সাহেব এখন বেরিয়ে নানা জায়গা ঘুরে বিকেল-সন্ধের দিকে বাড়ি ফিরবেন। তুমি যদি বেশ কিছুদিন ওর পাল্কির পিছন পিছন ঘুরতে পারো, তাহলে উনি তোমার আগ্রহ দেখে নিশ্চয়ই স্কুলে ভর্তি করে নেবেন।

রামতনু খুব ভোরে উঠে তৈরি হয়ে সামান্য কিছু মুখে দিয়েই বিদ্যালঙ্কারের হাতিবাগানের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। এক-দেড় ঘণ্টা হাঁটার পর গঙ্গার ধারে হেয়ার সাহেবের বাংলোয় পৌঁছায়। তারপর সারাদিন ছুটে বেড়ায় হেয়ার সাহেবের পাল্কির পিছন পিছন।

হেয়ার সাহেব যেখানে সেখানে ওকে দেখে অবাক হলেও মুখে কিছু বলেন না।

এইভাবে বেশ কিছুদিন কেটে গেল।

সেদিন সন্ধের দিকে বাড়ি ফিরে পাল্কি থেকে নেমে হেয়ার সাহেব রামতনুকে দেখে চমকে ওঠেন। মনে মনে বলেন, ইস, ছেলেটার চোখ-মুখ একেবারে শুকিয়ে গেছে। সেই সকাল থেকে এই সন্ধে পর্যন্ত পাল্কির সঙ্গে সঙ্গে ছুটে বেড়ালে তো চোখ-মুখ শুকিয়েই যাবে। তাছাড়া নিশ্চয়ই খুব ক্ষুধার্ত।

হেয়ার সাহেব সস্নেহে বলেন, তুমি কিছু খাবে? তোমাব নিশ্চয়ই খুব খিদে পেয়েছে।

রামতনু জানে, সাহেবের বাড়িতে খেলে ওর জাত যাবে। তাই খিদের জ্বালায় জ্বলে-পুড়ে গেলেও মুখে বলে, না, আমার খিদে পায়নি।

হেয়ার সাহেব না হেসে পারেন না। উনি তো জানেন, খ্রীস্টানের খাবার হিন্দুরা খায় না।

তুমি তো সকাল থেকে আমার পাল্কির পিছনে ছুটে বেড়িয়েছ। সারাদিন তোমার কিছু খাওয়া হয়নি। হাতিবাগানে পণ্ডিতের বাড়িতে পৌঁছতে তো রাত হয়ে যাবে। তুমি কিছু খেয়ে যাও।

না, না, আমি খাবো না।

আমার বাড়িতে তোমাকে খেতে হবে না। পাশেই হিন্দুস্থানী মিঠাইওয়ালার দোকান আছে। ঐ দোকানে কিছু মিঠাই খেয়ে বাড়ি যাও।

না, বামতনু আর আপত্তি করে না।

হেয়ার সাহেবের নির্দেশে মিঠাইওয়ালা ওকে এক পেট মিঠাই খাওয়ায়।

রামতনু খুশি হয়ে হাতিবাগানে ফিরে যায়।

এইভাবে মাস দুয়েক পাল্কির পিছনে ছুটে বেড়াতে দেখে হেয়ার সাহেব বুঝলেন, ছেলেটি সত্যি সত্যি পড়াশুনা করতে চায়। এ বেচারীকে আর কষ্ট দেওয়া যায় না।

রামতনু হেয়ার সাহেবের স্কুলে ভর্তি হলেন।

খবর শুনেই কেশবচন্দ্র ছুটে আসেন চেতলা থেকে বিদ্যালঙ্কারের হাতিবাগানের বাসায়। আদরের স্নেহের ছোট ভাইকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলেন, রামতনু, তুই সত্যি ভাগ্যবান। হেয়ার সাহেবের ইস্কুলে যখন ভর্তি হয়েছিস, তখন আর চিন্তা নেই।

কেশবচন্দ্র একটু থেমে বলেন, হেয়ার সাহেব সাক্ষাৎ দেবতা। তা না হলে উনি অত বড় ঘড়ির ব্যবসা ছেড়ে আমাদের দেশে আধুনিক শিক্ষা দেবার জন্য পাগল হয়ে ওঠেন?

রামতনু চুপ করে দাদার কথা শোনে।

এই ইস্কুল খোলার জন্য হেয়ার সাহেব মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কত মানুষের দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়িয়েছেন।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, হেয়ার সাহেবের দূরদর্শিতার কথা ভাবলেও অবাক হতে হয়। ইস্কুল খুলেই ওঁর মনে হলো, ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তক তো এ দেশে নেই।

রামতনু অবাক হয়ে বলে, দাদা, আগে পাঠ্যপুস্তক ছিল না?

না, ভাই।

কেশবচন্দ্র একটু থেমে বলেন. আগে শুধু রামায়ণ-মহাভারত চৈতন্যচরিতামৃত, কবি কিঙ্কনের চণ্ডী, অন্নদামঙ্গল, গুরুদক্ষিণা বা বিদ্যাসুন্দর ইত্যাদি কয়েকটি বই ছিল। এসব তো অল্পবয়সী ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তক হতে পারে না।

পাঠ্যপুস্তক কি হেয়ার সাহেবই চালু করলেন?

অবশ্যই।

উনি না থেমেই বলেন, ইস্কুল খোলার সঙ্গে সঙ্গে হেয়ার সাহেব বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রদের উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের জন্য একটা সোসাইটি তৈরি করলেন।

রামতনু একটু হেসে বলে, এইভাবে আমাদের পাঠ্যপুস্তক লেখা হলো?

হ্যাঁ, ভাই।

রামতনু আবার একটু হেসে বলে, জানেন দাদা, সাহেব আমাদেব খুব ভালবাসেন। প্রত্যেক দিন উনি ইস্কুল ঘুরে ঘুরে দেখেন, ঠিক মত পড়াশুনা হচ্ছে কিনা। তাছাড়া কার শরীর খারাপ, কে পড়াশুনায ফাঁকি দিচ্ছে বা কামাই করছে, সবকিছুর খবর নেন।

তাই নাকি?

রামতনু হাসতে হাসতেই বলে, ছুটির পর সাহেব আমাদের সঙ্গে রোজ বল খেলেন আর কিছু না কিছু খেতে দেন।

বলিস কিরে?

দাদা, আপনি শুনলে অবাক হবেন, যেসব ছাত্ররা অপরিচ্ছন্ন হয়ে ইস্কুলে আসে, হেয়ার সাহেব তাদের প্রত্যেককে পরিষ্কাব-পরিচ্ছন্ন করে দেন রোজ।

রামতনু, তাহলে বুঝতেই পারছো হেয়ার সাহেব ছাত্রদের কত ভালবাসেন।

রামতনু হাসতে হাসতে বলে, হেয়ার সাহেব তো বিয়ে করেন নি ; ছেলেমেয়েও নেই। আমরাই তো ওঁর সন্তান।

হ্যাঁ, ভাই, তোমরাই ওঁর সন্তান।

কেশবচন্দ্রের দীর্ঘ পত্রে সব বৃত্তান্ত জেনে রামকৃষ্ণ ও জগদ্ধাত্রী দেবী যেমন আনন্দিত, তেমনি নিশ্চিন্ত হন।

রামকৃষ্ণ এক গাল হেসে বলেন, শুনেছি পারস্য দেশের বসবার মাটিতে অভাবনীয় ভাল গোলাপ ফুল হয়। হেয়ার সাহেবের ইস্কুলও বসরার মাটির মত। তুমি দেখো, তোমার রামতনু একদিন শিক্ষায়-দীক্ষায়-আদর্শে বসরার গোলাপের মতই প্রস্ফুটিত হবে এবং সমাজের দশজনের একজন হবে।

জগদ্ধাত্রী দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে বলেন, আমার রামতনু কত বড় পণ্ডিত হবে বলতে পারি না ; তবে তার গর্ভধারিণী বলে জোর করে বলতে পারি, সে এখানকার আমলা-উকিল-মোক্তারদের মত চরিত্রহীন আদর্শহীন হবে না।

উনি স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলেন, আমার রামতনু নিশ্চয়ই চরিত্রবান আদর্শবান হবে।

ছয়

কবিরাজ মশাই অত্যন্ত মনযোগ সহকারে বেশ কিছুক্ষণ নাড়ি ধরে বসে থাকার পর দীর্ঘশ্বাস ফেলে মেজ কর্তার দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেন, বড়কর্তা চলে গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির সব নাবী-পুরুষ আর আত্মীয়-স্বজনরা কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো। কান্নাকাটি শুনে আশেপাশের প্রতিবেশীরাও ছুটে এলেন। তাদেরও অনেকে অশ্রুপাত না কবে পারেন না।

ঘণ্টাখানেক পর বাড়ির পুরুষরা নিজেদের একটু সামলে নেবার পরই সৎকারের বিষয়ে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়। তারপর শুরু হয় বড়কর্তার সৎকার ও বড় বৌঠানের সতী হবার উদ্যোগ আয়োজন। সেই সূর্যোদয়েব পর পরই বড় কর্তার প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেলেও শবযাত্রা শুরু হলো মধ্যাহ্নের পর।

যাত্রা পথে মেজকর্তা ছোট ভাইয়ের শ্যালককে চাপা গলায় প্রশ্ন করেন, মুকুন্দ সিদ্ধির শরবত ঠিক মত হয়েছে তো?

মুকুন্দ এক গাল হেসে বলে, এমন শরবত বানিয়েছি যে খেতে খেতেই আপনার বড় বৌঠান ঢলে পড়বেন।

সিদ্ধির পরিমাণ বেশ বেশি দিয়েছ তো?

সে আর বলতে!

বৌঠানের খেতে খারাপ লাগবে না তো?

কখনই না।

মুকুন্দ মুহূর্তের জন্য থেমে দাঁত বের কবে হাসতে হাসতে বলে, যেমন সিদ্ধি দিয়েছি, তেমনই মালাই-পেস্তা-বাদাম মিশিয়েছি। হাজার হোক জীবনের শেষ খাওয়া ; আমি কি যা তা ওনাকে খাওয়াতে পারি?

ছ'টি ঢাক, ছ'টি ঢোল, বারোটি কাঁসর বাজিয়ে শবযাত্রা পৌঁছল গঙ্গাতীরে। চিতা তৈরি দেখে মেজকর্তা পরশুরামকে প্রশ্ন করেন, হ্যাঁরে, দুটো মানুষ এক সঙ্গে থাকতে পারবে তো?

পরশুরাম পরিতৃপ্তির হাসি হেসে বলে, আমার তৈরি চিতায় একসঙ্গে পাঁচ-ছ'জনকে চড়ালেও ভেঙে পড়বে না।

চিতার পাশের বাঁশগুলো ভাল করে পুঁতেছিস?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

সতীর গায় আগুন লাগলেই উঠে বসে পালাবাব চেষ্টা করবে।

মেজকর্তা, আমি তো এই কাজ নতুন করছি না যে আপনি চিন্তিত হচ্ছেন?

পরশুরাম মুহূর্তের জন্য থেমে হাতের বাঁশ দেখিয়ে বলে সতী উঠে বসারই চেষ্টা করুক আর চিতা থেকে পালাবার চেষ্টা করুক, এর এক ঘায়ে সতীকে শুইয়ে দেব।

ও আবার বলে, সতীকে ও বড়কর্তার চিতা আর চার কোণের চারটে বাঁশের সঙ্গে এমন করে বেঁধে দেব যে নড়া-চড়াও করা সম্ভব হবে না।

ওদিকে পুরোহিত মশাই ক্রিয়া-কর্ম শুরু করেই বলেন, সতীকে গঙ্গাস্নান করিয়ে অঙ্গে পট্ট বস্ত্র জড়িয়ে এখানে আনার ব্যবস্থা করুন।

মুকুন্দ আর তিন-চারজন দূর সম্পর্কের আত্মীয় ও প্রতিবেশী বড় বৌঠানকে গঙ্গাস্নান করিয়ে দেন। পট্ট বস্ত্র জড়িয়ে দেওয়া হয় ওর শরীরে।

তারপর মুকুন্দ সরবতের পাত্রটি বড় বৌঠানের মুখের সামনে ধরে বলে, চটপট পূজার প্রসাদ খেয়ে নিন।

সদ্য বিধবা কাঁদতে কাঁদতে বলেন, আমার কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না।

তা বললে তো হবে না। পূজার প্রসাদ তো খেতেই হবে।

মেজকর্তার ইশারায় বৃদ্ধ পুরোহিত ওখানে গিয়ে বলেন, মা লক্ষ্মী, ওটা তোমাকে পান করতেই হবে। শাস্ত্রের নির্দেশ। তুমি এই পবিত্র শরবত পান না করলে শাস্ত্রমতে ক্রিয়াকর্ম করা যাবে না।

অনুরোধ-উপরোধের পর নানা রকম ভীতি প্রদর্শনও করা হয়। অসহায় সদ্য স্বামীহারা বিধবা শরবত পান করতে বাধ্য হন।

মুকুন্দর মুখে সেকি খুশির হাসি।

সত্যি অভাবনীয় নেশায় বড় বৌঠান কয়েক মিনিট পরই ঢলে পড়েন।

কয়েকজন ওনাকে চিতায় রাখার উদ্যোগ করতেই মেজকর্তা বলেন, একটু অপেক্ষা করো। নেশাটা ভাল করে জমতে দাও।

পুরোহিত ঐ চৈতন্যহীন নেশাগ্রস্তার মাথায় গঙ্গা জলের ছিটা দিতে দিতে কি সব মন্ত্র পড়েন। তারপর বলেন, সতীকে চিতায় স্থাপন করুন।

সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন বড় বৌঠানকে চিতায় প্রাণহীন বড়কর্তার দেহের পাশে রাখতেই পরশুরাম তার কথামত দায়িত্ব পালন করে।

পুরোহিত ফুল-বেলপাতা আর আতপ চাল সতীর দেহে ছিটিয়ে দিতে দিতে চিতা প্রদক্ষিণ করেন সাত বার। তারপর উনি মেজকর্তাকে বলেন, এবার অগ্নি সংযোগ করুন।

উপস্থিত সবাই চিৎকার করে ওঠে, ঢাকি-ঢুলীরা, যত জোরে পারো বাজাও।

ছ'টি ঢাক, ছ'টি ঢোল আর বারোটি কাঁসর বাজতে শুরু করতেই মেজকর্তা চিতায় অগ্নি সংযোগ করেন।

দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে চিতা।

সতীর নেশা কেটে যায়। নড়া-চড়া করে পালাবার চেষ্টা করতেই পরশুরামের হাতের বাঁশ সজোরে তাকে আঘাত করে বার বার। ঢাক-ঢোল-কাঁসরের শব্দ আর উপস্থিত সবার চিৎকারে শোনা যায় না সতীর আর্তনাদ। তারপর?

তারপর আর কি?

শাস্ত্রমতে বড় বৌঠানকে সতী করে আনন্দে গৌরবে সবার মুখেই খুশির হাসি ফুটে ওঠে।

কলকাতায় তখন রোজই দু'একটা সতীদাহ হচ্ছে পথের ধারে গঙ্গার পাড়ে। যাতায়াতের পথে কত লোক সে দৃশ্য দেখে শুধু দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বলে, জয় মা সতী!

কিশোরীমোহন বাড়ি ফিরেই সগর্বে বলেন, আজ আমার কি সৌভাগ্য যে সতীদাহ দেখলাম। এমন পুণ্যের কাজ দেখাও ভাগ্যের কথা।

সামনে পাঁচ গিন্নী থাকলেও উনি শুধু চুনীবালাকেই বলেন, বুঝলে বড় গিন্নী, আমি দেহরক্ষা করলে তুমি তো সতী হবে কিন্তু সতী হলে কি পুণ্য হয়, তা কি জানো?

চুনীবালা শুধু মাথা নেড়ে বলেন, না।

কিশোরীমোহন একটু হেসে বলেন, তোমার দেহে সাড়ে তিন কোটি লোম আছে। সতী হলে তুমি সাড়ে তিন কোটি বছর স্বর্গবাস করবে।

স্বামীর কথা শুনে অন্য গিন্নীরা চুপ করে থাকলেও সপ্তদশী জবা একটু গলা চড়িয়ে চোখ দুটো বড় বড় করে বলে, বাপরে বাপ! একেবারে সাড়ে তিন কোটি বছর স্বর্গবাস।

কিশোরীমোহন দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বলেন, হ্যাঁ, নতুন গিন্নী, সাড়ে তিন কোটি বছর স্বর্গবাস এবং তা আবার স্বামীর সঙ্গে স্বর্গবাস।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, কিন্তু সবাই তো এই পুণ্য অর্জন করতে পারে না ; শুধু পরম সৌভাগ্যবতী প্রথমা স্ত্রীরাই এই পুণ্য অর্জনের অধিকারিণী।

কোন গিন্নী কোন মন্তব্য না করলেও কিশোরীমোহন না থেমেই বলে যান, আমি এই রকমই এক মহা পুণ্যবতী সতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছি বলেই কোম্পানির

সাহেবদের কৃপা লাভ করে মহা সুখে সংসার করছি। আমার বিমাতাদের গর্ভের সন্তানরা যে কি দুরবস্থার জীবন কাটাচ্ছে। তা তো তোমরা সবাই জানো।

কিশোরীমোহন খেয়ে দেয়ে সামান্য একটু বিশ্রাম করেই বেরিয়ে গেলেন। সংসারের কাজকর্ম সেরে পাঁচ গিন্নী যথারীতি একসঙ্গে খেতে বসলেন কিন্তু চুনীবালার মুখে কোন কথা নেই। যে মানুষ রোজ খেতে বসে কত কথা বলেন, তাঁকে অমন চুপ করে থাকতে দেখে অন্যরা অবাক।

কুসুমকুমারী বলে, বড়দি, তোমার কি হয়েছে? আজ সকাল থেকেই তুমি কেমন যেন আনমনা হয়ে আছো।

চুনীবালা বলেন, রোজ রোজ কি বক বক করতে ভাল লাগে?

তা হতে পারে কিন্তু তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তুমি সব সময় কি যেন চিন্তা করছো।

তখন উনি বিশেষ কিছু না বললেও সেদিন রাত্রে শোবার পর চুনীবালা দুই সতীনকে বলেছিলেন, কর্তা সতীর স্বর্গবাসের কথা যতই বলুন না কেন, জীবন্ত পুড়ে মরতে কার ভাল লাগে বলতে পারিস?

ঠিক বলেছ বড়দি। কি করে যে একটা জীবন্ত মানুষকে পুড়িয়ে মারা হয়, আমি ভাবতেই পারি না।

তোরা জানিস না, পুড়িয়ে মারার আগে কি করা হয়?

ওরা দু'জনেই এক সঙ্গে বলে, বড়দি, কি করা হয়।

যে সতী হবে, তাকে মারাত্মকভাবে নেশা করানো হয়।

সেকি?

তোরা অবাক হচ্ছিস কিন্তু সত্যি নেশা করানো হয়।

এক সতীন প্রশ্ন করে, কিভাবে নেশা করায়?

অন্য সতীন প্রশ্ন করে, কে নেশা করায়?

চুনীবালা একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, সতীকে পুড়িয়ে মারার জন্য একদল আত্মীয়-স্বজন মহানন্দে মারাত্মক সিদ্ধির শরবত তৈরি করে। গঙ্গার ঘাটে পুরুতমশাই কিছু অং-বং-চং মন্ত্র বলে ঐ শরবত সতীকে খাইয়ে দিতে বলেন।...

যে সতী হবে, সে যদি ঐ শরবত খেতে না চায়?

আত্মীয়-স্বজনরা জোর করে খাইয়ে দেবে।

তারপর?

তারপর সতী নেশার ঘোরে বেহুঁশ হলেই স্বামীর চিতায় শুইয়ে আগুন লাগিয়ে দেবে।

ইস!

একটু পরেই ঐ সতীন বলে, কিন্তু গায় আগুন লাগলে তো নেশা চলে যা(

হ্যাঁ, নেশা চলে যায় ; সতী পালাতেও চেষ্টা করে কিন্তু পালাতে পারে ন

চুনীবালা একটু ম্লান হাসি হেসে বলেন. কিছু আত্মীয়-স্বজনরা সতীকে পিটি মেরে...

বড়দি, তুমি চুপ করো। আর বলো না। শুনেই আমার মাথা ঘুরছে।

অন্য সতীন বলে, কোন শালা পণ্ডিত যেএই নিয়ম চালু করেছে, তা ভগবা জানেন।

চুনীবালা গম্ভীর হয়ে বলেন, তবে তোদের আমি বলে দিচ্ছি, কর্তা আমার আ দেহরক্ষা করলেও আমি সতী হবো না। আমাকে নেশা করিয়ে পুড়িয়ে পিটি মারতে দেব না।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব কিন্তু সাড়ে তি কোটি বছর স্বর্গবাসের লোভে পুড়ে মরব না।

চুনীবালার গর্ভে পর পর দুটি কন্যা সন্তান হবার পর কিশোরীমোহন পু সন্তানের আশায় দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন।

দু'এক বছর না, পুরো সাত বছর স্বামীর সঙ্গে সহবাস করেও দ্বিতীয়া স্ত্রী গর্ভব হলেন না।

কিশোরীমোহন তৃতীয়বার দার পরিগ্রহ করলেন।

বছর দুয়েক এই স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করার পরই উনি গর্ভবতী হলেন এ যথাকালে আবার এক কন্যাসন্তানের জন্ম হলো। কিশোরীমোহন সত্যি হতাশ হ

আত্মীয়-স্বজনেরা অনুরোধ-উপরোধ আর পরামর্শ উনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও আ দু'টি বিয়ে করলেন। পঞ্চম ও সর্বকনিষ্ঠা স্ত্রী জবাকে যখন উনি বিয়ে করেন, ত ওর বয়স ছিল পনের। তারপর দেখতে দেখতে চারটে বছর কেটে গেল কিন্তু এখন জবা গর্ভবতীও হলো না।

জবা গর্ভবতী না হলেও কিশোরীমোহন ওকে সৌভাগ্যবতী মনে করে জবাকে বিয়ে করার এক সপ্তাহ পরই হাবার্ট সাহেব হঠাৎ কিশোরীমোহনে বললেন, আই মাস্ট সে টুমি ভালো ওয়ার্কার আছে। লাস্ট ওয়ান ইয়ারে সল্ট বিক্রি করে খুব ভাল প্রফিট হয়েছে ; অ্যান্ড ফল দ্যাট ক্রেডিট ইজ ইয়োর্স। শুধু টুমা জন্য এত লাভ হলো।

কিশোরীমোহন সাহেবের মুখে প্রশংসা শুনে গদ গদ হয়ে বলেন. সার, ইউ মনিব, ইউ গড, ইউ লর্ড। আপনার হুকুম মেনে চলাই তো আমার কাজ।

কিশোরী!

ইয়েস সার!

টুমি এভরি মান্থ কুড়ি টাকা বেশি মাইনে পাবে।

কিশোরীমোহন আনন্দে খুশিতে স্তম্ভিত হয়ে বলেন, সার, ওয়ান জাম্প টোয়েন্টি রুপিজ! এক লাভে কুড়ি টাকা বাড়িয়ে দিলেন! সার, ভগবান যীশু আপনার কল্যাণ করুন।

না, শুধু সে বছব না, প্রত্যেক বছরই কিশোরীমোহনের মাইনে বাড়ে ; বাড়ে দায়-দায়িত্ব সম্মান। তবে সাহেবের খুশি হবার বিশেষ কারণ ছিল।

সেদিন কিশোবীমোহনকে দেখেই হাবার্ট সাহেব প্রশ্ন করেন, টুমার কি হয়েছে? শরীর খারাপ নাকি মন খারাপ?

সার, শরীর ঠিকই আছে কিন্তু মন ভাল নেই।

হোয়াই?

সার, ফাইভ ওয়াইফ, নো সন।

মাই গড! টুমার পাঁচটা ওয়াইফ আছে?

ইয়েস সার।

হাবার্ট সাহেব একটু হেসে বলেন, ইউ আর এ লাকি ফেলো।

সার, নো লাকি ফেলো, নো সন।

ইউ হ্যাভ ডটার্স?

ইয়েস! ওনলি ডটার্স ; নো সন।

কিশোরীমোহন একটু না থেমেই বলেন, আপনি আমার দেবতা ; আপনাকে আমি মিথ্যে বলব না। আমার ইচ্ছা ছিল না পাঁচটা বিয়ে করার কিন্তু করতে বাধ্য হয়েছি একটা ছেলেব আশায়।

হাবার্ট সাহেব দু'এক মিনিট ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে কি যেন চিন্তা করেন। তারপব বলেন, কিশোরী, সত্যি করে বলো তো তুমি কোন বউকে সবচেযে বেশি ভালবাসো, বেশি পছন্দ করো।

কিশোরীমোহন হাত কচলে সলজ্জ হাসি হেসে বলেন, সাহেব, সত্যি কথা বলতে কি আমি আমার ছোট দুটো বউকেই বেশি ভালবাসি।

তোমার কোন বউ সব চেয়ে সুন্দরী?

সাহেব, ওরা দু'জনেই অসম্ভব সুন্দরী। সার, ওদের দেখলেই প্রাণ জুড়িয়ে যায়।

রিয়েলি?

সায়েব, আমি মা কালীর নামে দিব্যি করে বলতে পারি, ওদের মত সুন্দরী খু
কমই দেখা যায়।

আচ্ছা!

হ্যাঁ, সাহেব, ঠিকই বলছি।

তোমার ফোর্থ ওয়াইফের মেয়ে হয়েছে?

না, সাহেব, ও হতভাগীর ছেলে মেয়ে কিছুই হয়নি।

আই সী।

হাবার্ট সাহেব আবার পায়চারী করতে করতে মনে মনে কি যেন চিন্তা-ভাবন
করেন। এইভাবে পাঁচ-সাত মিনিট কেটে যায়। তারপর উনি বলেন, কিশোরী।

ইয়েস সাহেব।

আমি প্রত্যেক রবিবার ব্যারাকপুরের যে চার্চে যাই, সেখানে মাদার মেরীর কাছে
প্রার্থনা করে অনেকেরই ছেলে হয়েছে।

বলেন কি স্যার?

হ্যাঁ, কিশোরী ঠিকই বলছি।

হাবার্ট সাহেব একটু থেমে বলেন, টুমি খ্রীস্টান হলে তুমিই তোমার বউকে নিয়ে
ঐ চার্চে যেতে পারতে কিন্তু টুমি যেতে পারবে না বলে আমিই তোমার ওয়াইফকে
নিয়ে ঐ চার্চে যাবো।

সার, ভেরি গুড! ভেরি হ্যাপি!

গুড! তুমি রবিবার সকাল দশটার মধ্যে তোমার ওয়াইফকে আমার কোঠিতে
পৌঁছে দিও।

নিশ্চয়ই পৌঁছে দেব।

হাবার্ট সাহেবের কথায় অবাধ্য হবার সাহস ছিল না কিশোরীমোহনের। হাজার
হোক ওরই কৃপায় সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবন কাটছে। ওর হুকুম তামিল না করলে হয়তো
লাথি মেরেই তাড়িয়ে দেবেন কিন্তু ওকে খুশি করলে হয়তো একদিন মুন্সী বা
দেওয়ানও হতে পারেন।

কিশোরীমোহন এসব বুঝতে পারেন কিন্তু বাড়িতে কি করে বলবেন, জবাকে
সাহেবের কাছে নিয়ে যাবেন?

উনি সত্যি চিন্তায় পড়েন। সারা দিন রাত্তির চিন্তা করেও কোন কূলকিনারা পান

না।

পরের দিন হঠাৎ মাথায় এলো, বাড়িতে বলতে হবে। সাহেবের মা এসেছেন। ঐ বুড়ী জবাকে নিয়ে যেতে বলেছেন।

হ্যাঁ, কিশোরীমোহন বাড়িতে তাই বললেন।

তবে শনিবার রাত্রে শোবার পর কিশোরীমোহন জবাকে বলেন, দেখ নতুন বউ, শুধু মাত্র সাহেবের কৃপায় আমি আজ বেশ ভালোভাবেই সংসার চালাতে পারছি। সাহেব কৃপা না করলে আমি এমন সুন্দর বাড়িও তৈরি করতে পারতাম না।

জবা চুপ করে ওর কথা শোনে।

তোমার চোদ্দ পুরুষের ভাগ্য যে সাহেব তোমাকে ওর কুঠীতে নিয়ে যেতে বলেছেন।

সাহেবের মা বলেন নি?

হ্যাঁ, বলেছেন কিন্তু দেখছি, ঐ বুড়ী কেবলই নেমন্তন্ন খেতে নানা জায়গায় যাচ্ছেন। কখনও কখনও উনি কলকাতার বাইরেও যাচ্ছেন দু'চারদিনের জন্য।

কিশোরীমোহন মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, নতুন বউ, সব সময় মনে রেখো, সাহেব রাজার জাত। এদের হুকুম তামিল করা, এদের খুশি করাই আমাদের কাজ। এদের অবাধ্য হলে আমাদের মহা সর্বনাশ হবে।

জবা বলে, কিন্তু আমি সাহেবের কাছে গিয়ে কি করব? আমি তো জীবনে কোন সাহেবকেই দেখি নি। একে পরপুরুষ, তার উপর সাহেব। আমি ওর সঙ্গে কথা বলব কি করে?

কিশোরীমোহন একগাল হেসে বলেন, রাজার জাত কখনও পরপুরুষ হয়? ওরা তো সাক্ষাৎ দেবতা। ওদের সেবা করা, খুশি করা তো পুণ্যের কাজ।

আমি তো জানি না কি করে সাহেবকে সেবা করতে হয় বা খুশি করতে হয়।

তুমি কিছু চিন্তা করো না। শুধু একটা কথা মনে রাখবে।

কি কথা?

সাহেবের সব কথা শুনবে ; কখনই সাহেবের অবাধ্য হবে না।

কিন্তু আমার যে খুব ভয় করছে।

কিশোরীমোহন একটু হেসে বলেন, আরে দূর! ভয় কি! আমার সাহেব সত্যি সাক্ষাৎ দেবতা। সত্যি বলছি, উনি খুব ভালমানুষ।

উনি না থেমেই বলেন, আমি হলপ করে বলতে পারি, সাহেবকে তোমার ভাল লাগবেই।

কিন্তু আমাকে যদি সাহেবের ভাল না লাগে?

তোমাকে ভাল লাগবে না, তাই কি কখনও হতে পারে?

সব শেষে কিশোরীমোহন বলেন, তবে দেখো, সাহেবের কোন কথাই যেন তোমার দিদিরা বা অন্য কেউ না জানতে পারে।

রবিবার।

সাত সকালে উঠে চান-টান করে জবা সেজেগুজে নিতেই অন্য সতীনরা হাসতে হাসতে বলে, দেখিস জবা, সাহেবের মায়ের নেমন্তন্ন খেয়ে আমাদের ভুলে যাস না।

যাইহোক, দুর্গানাম জপ করে কিশোরীমোহন জবাকে নিয়ে রওনা দেন।

সাহেবের কুঠীতে পৌঁছে জবাকে বারান্দায় বসিয়ে কিশোরীমোহন ভিতরে গিয়ে সাহেবকে বলেন, সাহেব, গুড মর্নিং। মাই ফিফথ্ ওয়াইফ কাম।

হোয়ার ইজ ইওর ওয়াইফ?

বারান্দায় বসে আছে।

জলদি ইধার লে আও।

কিশোরীমোহন প্রায় ছুটে গিয়ে জবাকে সঙ্গে নিয়ে সাহেবের ঘরে আসে। ভয়ে লজ্জায় জবা এক হাত ঘোমটা টেনে মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

কিশোরী।

হ্যাঁ, সাহেব।

হাবার্ট সাহেব হাসতে হাসতে বলেন, টুমার ওয়াইফের মুখ দেখিতে পারছে না।

কিশোরীমোহন সঙ্গে সঙ্গে জবার মাথা থেকে ঘোমটা খুলে দিতেই সাহেব একটু হেসে বলেন, মাই ডিয়ার সুইট গার্ল, তুমি মুখ তুলে আমার দিকে তাকাও।

জবার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে স্বামীর সতর্কবাণী—মনে রেখো, সাহেব রাজার জাত। ওদের হুকুম তামিল করা, ওদের খুশি করাই আমাদেব ধর্ম। তাইতো শত দ্বিধা লজ্জা সত্ত্বেও জবা মুখ উঁচু করে সাহেবের দিকে তাকায়।

কাম অন মাই ডিয়ার সুইট গার্ল!

ব্যস! সঙ্গে সঙ্গে সাহেব এক হাত দিয়ে জবাকে কাছে টেনে নিয়েই বলেন, কিশোরী, বাড়ি যাও। কাল সকালে এসে ওয়াইফকে নিয়ে যেও।

কিশোরীমোহনের জবাবের অপেক্ষা না করেই সাহেব জবাকে নিয়ে ভিতরের ঘরে যান।

মুহূর্তের জন্য কিশোরীমোহনের মন বেদনায় আর গ্লানিতে ভরে যায়। উনি খুব

ভাল করেই জানেন, হাবার্ট সাহেব একটি নেকড়ে বাঘ। এমন মেয়ে শিকারী সাহেব কলকাতা শহরে খুব বেশি নেই। সাহেব যে জবার সতীত্ব নাশ করবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু বাধা দেবারও কোন উপায় নেই।

অশান্ত মন নিয়ে কিশোরীমোহন বেশ দু'এক ঘণ্টা উদ্দেশ্যহীন হয়ে ঘুরে বেড়ায়। তারপর বাড়ি ফেরে।

স্বামীকে একলা ফিরতে দেখেই চুনীবালা বলেন, জবা কোথায়?

কিশোরীমোহন চাপা হাসি হেসে বলেন, আর বলো না বড় গিন্নী! জবাকে দেখে বুড়ী মেম আনন্দে আটখানা। বলেন, এ তো ঠিক আমার বড় নাতনীর মত। এই মেয়েকে একটা দিন কাছে রেখে প্রাণভরে আদর না করে কিছুতেই ছাড়ব না।

চুনীবালা এক গাল হেসে বলেন, জবা সত্যি ভাগ্য করে এসেছে।

সে কথা আর বলতে!

সেজ গিন্নী বলেন, জবা খাবে কোথায়? ঐ ম্লেচ্ছদের খাবার খেলে তো ওর জাত যাবে।

কিশোরীমোহন একটু হেসে বলেন, সেজ গিন্নী, তুমি আমার সাহেবকে দেখো নি। দেখলে বুঝতে আমার সাহেব অন্য সাহেবদের মত না।

উনি না থেমেই বলে যান, আমার সাহেব যেমন ধার্মিক তেমনিই সাত্ত্বিক। তাছাড়া অভাবনীয় চরিত্রবান। প্রায় সন্ন্যাস জীবন যাপন করবেন বলেই তো বিয়েও করেননি। মাংস স্পর্শ করেন না ; মাছ খান সপ্তাহে এক-আধদিন।

রান্না কে করে?

হিন্দুস্তানী বামুন।

উনি হাসতে হাসতে বলেন, ওব লম্বা টিকি, কপালে সেইরকমই চন্দনের লম্বা তিলক, গলায় মোটা পৈতে।

চুনীবালা বলেন, তোমার সাহেব তো বিচিত্র মানুষ!

ঠিক বলেছ বড় গিন্নী : আমার সাহেব সত্যি বিচিত্র মানুষ। এমন ভাল সাহেব কলকাতায় আর নেই।

পরের দিন সকালে ন'টা বাজতে না বাজতেই কিশোরীমোহন সাহেবের কুঠীতে পৌঁছে যান। ওকে দেখে সাহেবের খাস বেয়ারা রমজান হাসতে হাসতে বলে, বাবুজি, মেযেটাকে নিয়ে যেতে এসেছেন?

কিশোরীমোহন গম্ভীর হয়ে বলেন, হ্যাঁ।

কিন্তু ওকে তো এখন পাবেন না।

কেন?

সাহেব আর ঐ ছোকরিটা তো এই সকাল বেলায় ঘুমুতে গেল।

কিশোরীমোহন অবাক হয়ে বলেন, সকাল বেলায় ঘুমুতে গেল?

হ্যাঁ, বাবুজি সকাল সাড়ে ছ'টা-সাতটার সময় ওরা ঘুমিয়েছে।

কি বলছ তুমি? ওরা সারা রাত ঘুমোয়নি?

রমজান একটু চাপা হাসি হেসে বলে, বাবুজি আপনার এই ছোকরিকে পেয়ে তো সাহেব পাগল হয়ে গেছে! কাল দুপুর থেকে সারা রাত সাহেব ছোকরিকে নিয়ে কি ফুর্তি করেছে, তা আপনি ভাবতে পারবেন না।

তুমি কি করে জানলে?

আমি সাহেবের খাস বেয়ারা বলেই সব কিছু দেখি, সব কিছু জানি। সাহেবের ঘরের পর্দার পিছনেই তো আমি সব সময় বসে থাকি।

কেন?

সাহেব কখন কি হুকুম করবে তার কি ঠিক আছে?

রমজান একটু থেমে বলে, তবে বাবুজি, একটা কথা বলছি।

কি কথা?

আপনার দেওয়া ছোকরিকে পেয়ে সাহেব যা খুশি হয়েছে, তা অন্য কোন ছোকরিকে পেয়ে হয় নি।

তাই নাকি?

হ্যাঁ বাবুজি।

একটু চুপ করে থাকার পর কিশোরীমোহন বলেন সাহেবের সঙ্গে ফুর্তি করতে মেয়েটার লজ্জা করলো না?

রমজান হাসতে হাসতে বলে, সাহেব এমন মজাদার আদমী যে দশ মিনিটের মধ্যেই নতুন ছোকরিদের লজ্জা চলে যায়।

হ্যাঁ, রমজানের কথাই ঠিক হলো। সাহেব আর জবার ঘুম ভাঙলো দুপুর গড়িয়ে যাবার পর।

হার্বার্ট সাহেব কিশোরীমোহনের সামনেই জবাকে দু'হাত দিয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে চুমু খাওয়ার পর বলেন, কিশোরী!

ইয়েস সাহেব!

জভা আমাকে দারুণ আনন্দ দিয়েছে। জভা ইজ এ লাভলি গার্ল! মাত্র এক রাত ওর সঙ্গে কাটিয়ে মন ভরলো না। তুমি এবার শনিবার সকালে ওকে আনবে। জভা আমার কাছে দু'রাত কাটাবে।

শুনেই কিশোরীমোহনের মাথা ঘুরে যায় কিন্তু কিছু বলতে পারেন না।

হাবার্ট সাহেব একটু হেসে বলেন, জভা, শনিবার সকালে আসবে তো?

আপনি যখন হুকুম করেছেন, তখন নিশ্চয়ই আসবো।

হ্যাঁ, এসো ; আমরা খুব মজা করবে। শুধু তোমার জন্য কিশোরীর মাইনে আরো পঁচিশ টাকা বাড়িয়ে দিলাম।

সাহেবের কুঠী থেকে বেরুবার পর দু'জনের কারুর মুখেই কোন কথা নেই। কিশোরীমোহন ওকে নিয়ে গঙ্গার ধারে একটু নিরিবিলিতে বসতেই জবা হাউ হাউ করে কাঁদতে শুরু করে।

কিশোরীমোহন ওর দুটি হাত ধরে বলেন, নতুন বউ, তুমি কাঁদবে না।

জবা কাঁদতে কাঁদতেই বলে, তোমার জন্য আমার সতীত্ব গেল আর আমি কাঁদব না।

শোনো, শোনো, আমার কথা শোনো।

হ্যাঁ, বলো।

শাস্ত্রে বলেছে, ভগবানের মত রাজাদেরও ভক্তি করতে হয়। খুশি করতে হয়। আমার সাহেবও তো রাজার জাত। ওকে খুশি করে তুমি অন্যায় করো নি।

তাই বলে ও আমার সতীত্ব নাশ করবে? এ তো মহাপাপ।

না, নতুন বউ, তোমার কোন পাপ হয়নি। রাজার জাতের সাহেবকে খুশি করে যদি কোন পাপ হয়েই থাকে, তাহলে সে পাপ আমার, তোমার না।

কিশোরীমোহন সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন করেন, আমার সাহেব কি তোমার উপর কোন অত্যাচার করেছেন?

না, তা করবে কেন?

সাহেব খুব মজাদার মানুষ না?

জবা এবার একটু হেসে বলে, একটু বেশি মজাদার।

সাহেব তোমাকে আদর-যত্ন করেছে?

জবা একটু গম্ভীর হয়ে বলে, সাহেব আমার সতীত্ব নাশ করলেও একথা আমি স্বীকার করতে বাধ্য, উনি আমাকে অসম্ভব আদর যত্ন করেছেন।

তাই নাকি?

আমি জীবনে চেয়ার-টেবিলে খাইনি বলে সাহেব নিজের হাতে আমাকে খাইয়ে দিয়েছেন।

বলো কি?

আমাকে খাইয়ে-দাইয়ে দেবার পরই সাহেব খেয়েছেন।

নতুন বউ, দেখছ তো রাজার জাত কেমন হয়।

তাছাড়া সাহেব খুব উদার মানুষ।

জবা একটু শাড়ি সরিয়ে একটু হেসে বলে, দেখো আমার গলায় কি।

কিশোরীমোহন একঝলক দেখেই এক গাল হেসে বলেন, এতো হীরে বসানো সোনার হার।

হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছ।

এতো দারুণ দামী।

মানুষটা একে উদার, তার উপর আমাকে ওর খুব ভাল লেগেছে বলেই এত দামী হার দিয়েছেন।

কিশোরীমোহন হাসতে হাসতে বলেন, তোমাকে যে সাহেবের খুব ভাল লেগেছে, তা তো ওর কথা শুনেই বুঝলাম।

কোন কথা শুনে?

ঐ যে সাহেব বললেন, তোমাকে এক রাত্তিরের জন্য পেয়ে মন ভরে না।...

জবা সলজ্জ হাসি হেসে একবার স্বামীর দিকে তাকিয়েই দৃষ্টি গুটিয়ে নিয়ে বলে তোমার সাহেব যেমন আমুদে, সেইরকমই অসভ্য।

অসভ্য মানে?

সে তোমাকে বলা যাবে না।

দু'এক মিনিট চুপ করে থাকার পর কিশোরীমোহন বলেন, নতুন বউ, একটা সত্যি কথা বলবে?

কেন বলব না? তোমার কাছে তো আমার কিছুই লুকোবার নেই।

সত্যি করে বলো তো, আমার সাহেবকে তোমার ভাল লেগেছে কি না।

হ্যাঁ, সাহেবকে আমার সত্যি খুব ভাল লেগেছে।

জবা না থেমেই বলে যায়, সাহেবের কাছে যে আদর-যত্ন-ভালবাসা পেয়েছি যে ওকে ভাল না লেগে উপায় নেই।

সতীনরা ওর হার দেখে অবাক হয়ে যায়। সবার মুখেই এক কথা, বুড়ী মেম তোকে সত্যি ভালবাসে ; ভাল না বাসলে কেউ এত দামী হার দেয় না।

জবা একগাল হেসে চুনীবালাকে বলে, জানো বড়দি, বুড়ী মেম আসার সময় কর্তাকে বলেছে, জবাকে এক রাত আদর করে মন ভরলো না। ওকে সামনেব শনিবার আবার আমার কাছে নিয়ে আসবে। জবা আমার কাছে দু'দিন থাকবে।

এক সতীন হাসতে হাসতে বলে, দেখিস, জবা, বুড়ী মেমের সঙ্গে আবার বিলেত চলে যাস না যেন।

জবা হাসতে হাসতেই বলে, কপালে থাকলে যেতেও পারি।

হ্যাঁ, শনিবার আবার জবা কিশোরীমোহনের সঙ্গে সাহেবের কুঠীতে যায়।

দু'দিন দু'রাত হাবার্ট সাহেবের সঙ্গে লীলাখেলার পর স্বামীর সঙ্গে ঘরে ফেরার সময় জবা হাসতে হাসতে বলে, কি সাহেব, সামনের শনিবারেও কি আসব?

হাবার্ট সাহেব একটু হেসে বলেন, তোমার কি আসতে ইচ্ছে নেই? দুটো দিন দুটো রাত কি খুব খারাপ কাটালে?

আমার কথা বাদ দিন। আপনি যখন আসতে বলবেন আমি তখনই আসব।

গুড!

সাহেব জবাকে চুমু খেয়ে বলেন, হ্যাঁ, ডার্লিং, তুমি শনিবার নিশ্চয়ই আসবে।

এইভাবে মাস তিনেক চলার পর আবার এক সোমবার মধ্যাহ্নে কিশোরীমোহন স্ত্রীকে নিয়ে যাবার জন্য সাহেবের কুঠীতে হাজির। রমজানকে বলেন, ভিতরে খবর দাও, আমি এসেছি।

রমজান ভিতর থেকে ঘুরে এসে বলল, হ্যাঁ, বাবুজি, খবর দিয়েছি।

ঘণ্টা দুয়েক অপেক্ষা করার পরও জবার দেখা না পেয়ে কিশোরীমোহন অধৈর্য হয়ে ওঠেন। উনি রমজানকে বলেন, তুমি সাহেবকে বলো, আমি একটু দেখা করতে চাই।

রমজান ফিরে এসে বলে বাবুজি, আপনি সোজা সাহেবের ঘরে যান। সাহেব আপনাকে ডাকছেন।

হাবার্ট সাহেবের শোবার ঘরে পা দিয়েই ওদের দু'জনকে উলঙ্গ হয়ে জড়াজড়ি করে শুয়ে থাকতে দেখেই কিশোরীমোহনের মাথা ঘুরে যায়, চোখে অন্ধকার

দেখেন।

জবা স্বামীকে দেখে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে বলে, তুমি ফিরে যাও। আমি আর তোমার সংসারে ফিরব না। সবাইকে বলে দিও, গঙ্গাস্নান করার সময় আমি জলে ডুবে মারা গেছি।

হার্বার্ট সাহেব মুহূর্তের জন্য মুখ ঘুরিয়ে বলেন, কিশোরী!

ইয়েস সাহেব!

তোমাকে আমি মুন্সী করে দিলাম। আরো একশ টাকা মাইনেও বাড়িয়েও দিলাম। যাও, মন দিয়ে কাজ করো।

কিশোরীমোহন ধীর পদক্ষেপে কুঠী থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে মনে মনে বলেন, ধরিত্রী, তুমি দ্বিধাবিভক্ত হও ; আমাকে তোমার কোলে স্থান দাও।

কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই আবার মন আনন্দে নেচে ওঠে। কিশোরীমোহন বিড় বিড় করে বলেন, আমি মুন্সী হয়েছি। আর দু'হাতে না, দশ হাতে আয় করবো।

সাত

গলির মধ্যে গাড়িটাকে ঢুকতে দেখেই এক ভৃত্য দৌড়ে গিয়ে দ্বারকানাথকে বলে, কর্তাবাবু, রাজামশাই আসছেন।

দ্বারকানাথ ত্বরিত পদক্ষেপে বাড়ির সামনের প্রাঙ্গণে আসতেই রামমোহন গাড়ি থেকে নামেন।

দ্বারকানাথ ওঁকে সাদর অভ্যর্থনা করেই বলেন, কি ব্যাপার রাজামশাই? এত সকাল সকাল ..

ওঁকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই রামমোহন বলেন, দ্বারকানাথ, আমার মন বড়ই অশান্ত। নানা দুশ্চিন্তায় আমি সারা রাত ঘুমোতে পারিনি। তাই সকাল হতেই তোমার কাছে ছুটে এলাম।

আপনি উপরে চলুন। তারপর সব শুনছি।

উপরের ঘরে গিয়েও রামমোহন স্থির হয়ে বসতে পারেন না। অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে কয়েক মিনিট ঘরের মধ্যেই পায়চারী করার পর হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে বলেন, দ্বারকানাথ, নানা জায়গা থেকে নানা জনের কাছ থেকে সমাজের যেসব ঘটনা শুনছি, তা সভ্য সমাজের কল্পনাতীত।

দ্বারকানাথ ওঁর দুটি হাত ধরে বলেন, আপনি দয়া করে বসুন। তারপর সব শুনছি।

রামমোহন আসন গ্রহণ করেই বলেন, এত অন্যায়, অবিচার, ব্যভিচারের কথা শুনছি যে আমি আর স্থির থাকতে পারছি না। ঘটনাগুলো শুনলে তুমিও স্থির থাকতে পারবে না।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, আমি যে ঘটনাগুলো বলব, তা শুনেই বুঝতে পারবে আমাদের সমাজের সর্বত্র কত জঘন্য কাজ প্রতিদিন ঘটছে।

রামমোহন গভীর মনযোগ সহকারে সতীদাহর বিরুদ্ধে আরো একটা পুস্তিকা লিখছিলেন। হঠাৎ এক ভৃত্য দৌড়ে এসে তাঁকে বলে, রাজা মশাই, একজন বয়স্কা বিধবা আর তার জ্যেষ্ঠ পুত্র কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আপনার দর্শনপ্রার্থী। দেখে মনে হলো, ওঁরা কোন শোক পেয়েছেন।

লেখা থামিয়ে রামমোহন ভৃত্যের দিকে তাকিয়ে বললেন, কি বললে? বিধবা মহিলাটি কাঁদছেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

ওরা কিজন্য এসেছেন?

আজ্ঞে বিধবা আর তার পুত্র আপনার দর্শনপ্রার্থী।

যাও, যাও ; শিগগির ওদের নিয়ে এসো।

ভৃত্য সঙ্গে সঙ্গে ঐ বিধবা আর তার পুত্রকে ভিতরে নিয়ে আসে। রামমোহনকে দেখেই ঐ বিধবা কাঁদতে কাঁদতে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়েই বলেন, রাজা বাহাদুর, আমার মেয়ের শুধু দু'বছরের শিশুসন্তান ছাড়াও সে অন্তঃসত্ত্বা ছিল কিন্তু তবু ওর শ্বশুরবাড়ির লোকজন সামান্য কিছু সম্পত্তির লোভে ওকে সতী করে মেরে ফেলেছে।

বিব্রত রামমোহন বার বার বলেন, মা, আপনি কাঁদবেন না ; আপনি সংযত হন। আপনি স্থির হয়ে বসুন। আমি আপনার সব কথা শুনব।

না, বৃদ্ধা বিধবার কান্না থামে না। উনি কাঁদতে কাঁদতেই বলে যান, শুনেছি কোম্পানি আইন করেছে, কোন শিশুসন্তানের জননী, ঋতুগ্রস্ত মহিলা বা নাবালিকা বধূকে সতী করা বে-আইনী। তবে কেন, কেন, আমার মেয়েকে ওরা জীবন্ত পুড়িয়ে মারলো!

বৃদ্ধা একবার নিঃশ্বাস নিয়েই বলে যান, আমার আরো তিন কন্যা আছে।

ভবিষ্যতে তাদেরও কি এইভাবে পুড়ে মরতে হবে? এই সর্বনাশা নিয়ম আর কত কাল চলবে?

রামমোহন আর সহ্য করতে পারেন না। কোনমতে অশ্রু সম্বরণ করে উনি বলেন, মা, দয়া করে আপনি স্থির হয়ে বসুন। তারপর আমি আমার কথা বলছি।

বৃদ্ধা মাকে সংযত করে তাঁর পুত্র রামমোহনকে বলেন, রাজামশাই, সহমরণের বিরুদ্ধে আপনি যে পুস্তিকা লিখেছেন, আমি তা পাঠ করেছি। আপনার মতে শাস্ত্রে সহমরণের সমর্থন নেই। তাহলে কেন এই বর্বর প্রথা কোম্পানি বাহাদুর বন্ধ করছে না?

রামমোহন অত্যন্ত ধীর-স্থিরভাবে বলেন, তুমি আমার লেখা পুস্তিকা পাঠ করেছ জেনে খুশি হলাম। আমি ব্যস্ত আছি। খুব বেশি কথা বলার সময় নেই। শুধু এইটুকু বলছি, গোঁড়া হিন্দুদের ভয়ে কোম্পানি এই বর্বর প্রথা বন্ধ করে নি। আমি তোমাকে ও তোমার মাতৃদেবীকে প্রকিশ্রুতি দিচ্ছি যে আমি অন্যান্য সব কাজকর্ম স্থগিত রেখে সতীদাহ বন্ধ করার জন্য প্রাণপাত করবো।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, আমি আশা করি, জোড়াসাঁকোর দ্বারকানাথ ঠাকুর, টাকির সুপ্রতিষ্ঠিত জমিদার বাবু কালীনাথ রায়, তেলিনীপাড়ার খ্যাতনামা জমিদার বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত উদার মহৎপ্রাণ কিছু বন্ধুদের সহায়তায় এই সর্বনাশা কুপ্রথা বন্ধ করার জন্য কোম্পানি বাহাদুরকে বাধ্য করতে সমর্থ হবো।

এই ঘটনাটি বলে রামমোহন একটু থামেন। তারপর একবার বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে বলেন, দ্বারকানাথ, তুমি নিশ্চয়ই জানো, লর্ড ওয়েলেসলীর কাছে দেশের নানা প্রান্তের অনেক ম্যাজিস্ট্রেট রিপোর্ট পাঠিয়ে জানান যে বীভৎসভাবে সতীদাহ চলছে, তা বন্ধ করা দরকার।

দ্বারকানাথ বলেন, ওয়েলেসলী সতীদাহ পুরোপুরি বন্ধ না করলেও বোধ হয় কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।

হ্যাঁ।

রামমোহন মুহূর্তের জন্য থেমে বলে যান, সে সময় কোম্পানি বাহাদুর সতীদাহ সম্পর্কে নিজামত আদালতের পণ্ডিত ঘনশ্যাম শর্মার মতামত জানতে চায়।

ঐ পণ্ডিত কি মতামত দেন।

উনি বলেন যে শিশুসন্তানের মা, গর্ভবতী, ঋতুমতী ও অপ্রাপ্তবয়স্কাকে সহমৃতা

'করা যাবে না।

তাই নাকি?

হ্যাঁ।

রামমোহন সঙ্গে সঙ্গে বলেন, পণ্ডিত শর্মা একথাও জানান যে কোন মাদক দ্রব্য খাইয়ে কোন নারীকে অচৈতন্য করে সতীদাহ করা চলবে না।

কোম্পানি কী ঠিক করলো?

কোম্পানি পণ্ডিত শর্মার মতানুসারে এক আদেশ জারী করে যে ঐ সব কারণ থাকলে সতীদাহ বন্ধ করতে হবে।

রামমোহন জোব্বার পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে তার উপর চোখ বুলিয়ে বলে যান, কোম্পানি বাহাদুরের রিপোর্টে দেখছি, কলকাতাতেই সব চাইতে বেশি সতীদাহ হয়েছে ও হচ্ছে।

সেকি?

দ্বারকানাথ বিস্ময়ের সঙ্গে বলেন, কাশীর মত তীর্থেও কি কলকাতার চাইতে কম সতীদাহ হচ্ছে?

রামমোহন একটু ম্লান হেসে বলেন, হ্যাঁ, দ্বারকানাথ, অনেক কম হয়েছে।

উনি না থেমেই রিপোর্ট দেখে বলেন, গত ১৮১৭ সালে এই কলকাতায় ৪৪২টি সতীদাহ হলেও কাশীতে হয়েছে মাত্র ১৯টি। ১৮১৮ সালে কলকাতায় সতীদাহ হয়েছে ৫৪৪টি : কাশীতে হয়েছে ১৩৭টি।

আশ্চর্য ব্যাপার!

রামোহন একটু হেসে বলেন, দ্বারকানাথ, ভুলে যেও না, প্রদীপের নীচেই অন্ধকার থাকে।

হ্যাঁ, তাই দেখছি।

রামমোহন দ্বারকানাথের দুটি হাত ধরে বলেন, লর্ড ওয়েলেসলী আর লর্ড হেস্টিংস, গোঁড়া হিন্দুদের সমালোচনার ভয়ে ওরা সতীদাহ বন্ধ করলেন না।...

ওদের এত ভয় পাবার কারণ কি?

ইংরেজ মোটামুটিভাবে সারা ভারতবর্ষকে এক করে নিজেদের শাসনাধীনে আনলেও সরকারের শিকড় এখনও খুব গভীরে যায় নি ; তাই ওরা ভয় পেয়েছে।

রামমোহন সঙ্গে সঙ্গেই বলেন, গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্স্ট তো সোজাসুজি জানিয়ে দিলেন, সতীদাহ বন্ধ করা ঠিক হবে না।

রাজামশাই, লর্ড আমহার্স্ট যে এত ভীতু, তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

যাইহোক দ্বারকানাথ, এবার গভর্নর জেনারেল হয়ে এসেছেন লর্ড বেণ্টিঙ্ক।

আমার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়নি কিন্তু শুনছি, এই মানুষটি ভারতবর্ষের জন্য কি
করতে আগ্রহী।

হ্যাঁ, রাজামশাই, আপনি ঠিকই শুনেছেন। আমি কয়েক দিন পূর্বেই লর্ড ও লে
বেন্টিঙ্কের আমন্ত্রণে ওদের সঙ্গে নৈশভোজে যোগদান করি এবং অনেকক্ষ
আমাদের মধ্যে নানা বিষয়ে আলোচনা হয়।

তোমার কি মনে হলো?

মনে হলো, আগের গভর্নর জেনারেলদের চাইতে ইনি আমাদের দেশের প্র
অনেক বেশি সহানুভূতিশীল।

তাহলে তো আশার কথা।

রাজামশাই, লেডি বেন্টিঙ্ক অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মহিলা এবং যথেষ্ট বিচার-বু
আছে বলেই মনে হলো।

তুমি কি সতীদাহ সম্পর্কে ওদের কিছু বলেছ?

না।

দ্বারকানাথ না থেমেই বলেন, তবে আমি ওদের দু'জনকেই বলেছি, প্রকৃ
আধুনিক শিক্ষার অভাবে আমাদের সমাজে অনেক কুসংস্কার, কুপ্রথা চলছে এব
তার ফলে বহু অসহায় মানুষকে নানারকম অত্যাচার সহ্য করতে হচ্ছে।

হ্যাঁ, ঠিক বলেছ।

দেখলাম, লর্ড ও লেডি দু'জনেই আপনার সম্পর্কে খোঁজখবর রাখেন এব
আপনার সঙ্গে দেখা কবতে দু'জনেই বেশ আগ্রহী। আমিও যথাসাধ্য আপনার চিন্তা-
ভাবনার কথা ওদের বলেছি।

ওরা আগ্রহী হলে আমি অবশ্যই দেখা করব।

ভৃত্য অনেকক্ষণ আগেই রামমোহনের সামনে এক গেলাস সরবত রেখে
গিয়েছে। দ্বারকানাথের অনুরোধে সেই সরবত পান করে রামমোহন বলেন,
তোমাকে আরো কয়েকটি বিষয় না জানিয়ে শান্তি পাচ্ছি না।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলুন।

তোমার কাজের ক্ষতি করছি না তো?

দ্বারকানাথ একটু হেসে বলেন, রাজামশাই, ভারতবাসীর পরম সৌভাগ্য যে
আপনাকে আমরা পেয়েছি। আপনি শুধু জ্ঞানী-গুণী-ধার্মিক না ; আপনি ছাড়া আর
কেউ এই দেশের অভাগা মানুষদের সার্বিক কল্যাণের জন্য সমাজ সংস্কার শিক্ষ

সংস্কার বা ধর্ম সংস্কারের মহান ব্রতে জীবন উৎসর্গ করেনি।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, আপনাকে আমি প্রাণ-মন দিয়ে শ্রদ্ধা করি, ভক্তি করি। দযা করে আমার গৃহে পদধূলি দিয়েছেন বলে আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করছি। আমি সারাদিন ধরে আপনার কথা শুনতে রাজি।

রামমোহনও একটু হেসে বলেন, আমি জানি, তুমি আমাকে ভক্তি করো, শ্রদ্ধা করো কিন্তু তোমার মত উদার মহৎ প্রাণ মানুষকে পাশে পেয়ে আমিও নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি।

উনি একবার নিঃশ্বাস নিয়েই বলেন, তাহলে আরো কিছু ঘটনা তোমাকে বলি।

হ্যাঁ, বলুন।

রংপুর কোর্টের পুরনো সহকর্মী জগদানন্দ চক্রবর্তী পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই রামমোহন তাঁকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলেন, ভাই, কেমন আছেন?

আজ্ঞে আপনার আশীর্বাদে ব্যক্তিগতভাবে ভালই আছি।

আগে আপনি বসুন। তারপর সব শুনছি।

জগদানন্দবাবু সামনের চেয়ারে বসতেই রামমোহন ভৃত্যকে ডেকে বলেন, ভিতরে গিয়ে বল, রংপুর কোর্টের জগদানন্দবাবু এসেছেন। শিগগির ওর জন্য জলখাবার নিয়ে আয়।

জগদানন্দবাবু একটু সলজ্জ হাসি হেসে বলেন, আজ্ঞে আপনি ব্যস্ত হবেন না।

ব্যস্ত তো হচ্ছি না। আপনি আমার পুরনো সহকর্মী, কনিষ্ঠ ভ্রাতা তুল্য। আপনি সামান্য কিছু মুখে না দিলে কি আমি শান্তি পাই?

জগদানন্দবাবু একটু হেসে বলেন, আমি শুধু আপনার পুরনো সহকর্মী বা কনিষ্ঠ ভ্রাতা তুল্য না, আমি আপনার এক নগণ্য ভক্তও।

রামমোহন খুশির হাসি হেসে বলেন, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আপনি আমার ভক্ত। রংপুরে থাকার সময় আমার সন্ধ্যাকালীন ধর্মালোচনার আসরে আপনি অনেকের নিন্দা সমালোচনা উপেক্ষা করেও নিয়মিত আসতেন।

যাইহোক জগদানন্দবাবু মিষ্টিমুখ করার পরই রামমোহন বলেন, আপনার পরিবারের সবাই ভাল আছেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

অন্যান্যদের কি খবর?

আপনি কোর্টের পুরনো সহকর্মীদের কথা জানতে চান নাকি উকিলদের?

সবার খবরই জানতে চাই।

আপনার যে খাস বেয়ারা ছিল, সেই ইদ্রিস দেহরক্ষা করেছে।

খুবই দুঃখের কথা। ইদ্রিস যেমন সৎ, সেইরকমই নিষ্ঠাবান কর্মী ছিল।

হ্যাঁ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ইদ্রিসের বড় ছেলে ইকবালের খবর জানেন কি?

আজ্ঞে হ্যাঁ, ও ভালই আছে।

জগদানন্দবাবু একটু হেসে বলেন, ও দুনিয়ার সবাইকে বলে, আপনি ওা চাকরি দিয়েছেন।

আচ্ছা পাগল তো!

আপনি তো আরো অনেককেই চাকরি দিয়েছেন কিন্তু এই পাগল ছেলেটা ছা আর কেউ সেকথা স্বীকার করে না।

রামমোহন একটু হেসে বলেন, আমি আমার কর্তব্য করেছি; ওরা যা ভাল ম করছে, তাই করুক।

উনি না থেমেই বলেন, উকিলবাবুদের খবর কি?

জগদানন্দবাবু একটু হেসে বলেন, যাদের একটু পসার আছে, তাদের খবর খু ভাল।

রামমোহন একটু বিস্ময়ের সঙ্গে বলেন, খুবই ভাল মানে?

জগদানন্দবাবু একবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, প্রায় সব ভাল উকিলবাবু দি কোর্ট আর রাত্রে রক্ষিতাদের নিয়ে মত্ত আছেন।

উনি না থেমেই বলে যান, যেসব উকিলবাবু রক্ষিতাদের পাকা বাড়ি তৈরি ক দিয়েছেন, তারাই এখন রংপুর শহরের সব চাইতে সম্মানিত ব্যক্তি।

বলেন কি?

হ্যাঁ, ঠিকই বলছি।

জগদানন্দবাবু না থেমেই একটু হেসে বলেন, যোগেশ উকিল তো এখন রংপু শহরের অন্যতম দ্রষ্টব্য হয়েছেন।

কেন?

উনিই প্রথম রক্ষিতার জন্য পাকা বাড়ি তৈরি করে দেন।

চমৎকার।

দু'এক মিনিট কেউই কোন কথা বলেন না। তারপর জগদানন্দবাবু বলেন, ং রংপুর না। অন্যান্য জেলার অবস্থাও তথৈবচ।

তাই নাকি?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

জগদানন্দবাবু মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, আমার ছোট ভাই উকিল ; মৈমনসিং কোর্টে প্র্যাকটিশ করছে। আমি ছোট বৌমাকেও তার সঙ্গে পাঠিয়েছি বলে প্রবীণ উকিলরা ওকে প্রতি পদক্ষেপে বিদ্রূপ করেন।

বিদ্রূপ করার হেতু?

আপনাকে বলতে দ্বিধা হচ্ছে কিন্তু তবু বলছি।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলুন।

প্রবীণ উকিলবাবুরা আমার ছোট ভাইকে দেখলেই বলেন, ওহে শ্রীমান, যদি পেশায় সাফল্য অর্জন করতে চাও, তাহলে অবিলম্বে স্ত্রীকে দেশে রেখে এসে কোন রক্ষিতার সঙ্গে বসবাস করো। তা না হলে তোমার ভবিষ্যত অন্ধকার।

রামমোহন একটু উত্তেজিত হয়ে বলেন, জগদানন্দবাবু এবার আপনি থামুন। আমি আর শুনতে চাই না। সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের এইসব পশু প্রবৃত্তির কথা শুনতেও আমার ঘেন্না করে।

উনি একটু থেমে বলেন, কবে যে আমাদের সমাজ এইসব অনাচার ব্যভিচার থেকে মুক্ত হবে, সেই চিন্তায় আমি পাগল হয়ে যাই।

রামমোহন কয়েক মিনিট নীরব থাকার পর বলেন, দ্বারকানাথ, দু'দিন আগে হেয়ার সাহেব আমার কাছে এসেছিলেন।

উনি কি বিশেষ কোন কাজে এসেছিলেন?

না, বিশেষ কোন কাজে আসেন নি। তবে উনি তো মাঝে মাঝেই আসেন এ দেশে শিক্ষা প্রসারের ব্যাপারে আমার পরামর্শ নিতে।

দ্বারকানাথ চুপ করে ওর কথা শোনেন।

রামমোহন বলে যান, হেয়ার সাহেব কথায় কথায় এক ছোকরা ইংরেজ আর তার এক বাঙালি কর্মচারীর কাণ্ডকারখানা শুনে তো আমি আরো দুশ্চিন্তায় পড়েছি।

ঐ ইংরেজ ছোকরা আর বাঙালি কর্মচারী কি করেছে?

দ্বারকানাথ, তুমি তো জানো, চিরকুমার হেয়ার সাহেব তাঁর বন্ধু মিঃ গ্রে'র বাড়িতে থাকেন।

হ্যাঁ, খুব ভাল করেই জানি। গ্রে সাহেবের সঙ্গে আমারও পরিচয় আছে।

আমার সঙ্গে ওঁর পরিচয় নেই কিন্তু শুনেছি, উনি একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক।

হ্যাঁ, সত্যি গ্রে সাহেব একজন ষোল আনা ভদ্রলোক।

ঐ গ্রে সাহেবের বাড়ির কাছাকাছিই হাবার্ট বলে এক ছোকরা থাকে।

ছেলেটি কি করে?

কোম্পানির মাঝারি অফিসার ; তাছাড়া নিজস্ব ব্যবসাও আছে।

ছোকরার ঐ নিজস্ব ব্যবসাতেই কি বাঙালি ভদ্রলোক কাজ করেন?

ঐ হতভাগাকে ভদ্রলোক বলে না।

দ্বারকানাথ একটু হেসে বলেন, কেন?

রামমোহন অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে বলেন, যে হতভাগা ঐ চরিত্রহীন ছোকরা ইংরেজ মনিবকে খুশি করার জন্য নিয়মিত নিজের যুবতী স্ত্রীকে ওর সঙ্গে রাত্রিবাস কবতে নিয়ে আসে, সে কখনই ভদ্রলোক হতে পারে না।

হেয়ার সাহেবের মত দেবতুল্য মানুষের তো এসব জানার কথা না।

হ্যাঁ। ঠিকই বলেছ।

রামমোহন মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, গ্রে সাহেবের ছেলে আব ঐ ছোকরাটি প্রায়ই এক সঙ্গে ময়দানে ঘোড়ায় চড়তে যায়। তাই ঐ ছোকরার সঙ্গে গ্রে সাহেবের ছেলের বিশেষ পরিচয় আছে।

ও বুঝেছি।

ঐ জঘন্য ব্যাপারে বেশি কথা বলতেও আমার ইচ্ছা করছে না। শুধু এইটুকু জেনে রাখো, ঐ মেয়েটি মাঝেমধ্যে ছোকরার সঙ্গে থাকার পর এমনই মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে যে সে আর স্বামীর ঘরে ফিরে যায় নি।

রামমোহন একবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, ঐ মেয়েটি স্বামীর ঘর করার চাইতে ঐ ছোকরার রক্ষিতা হয়ে থাকাই ভাল মনে করেছে।

শুনেই দ্বারকানাথ মুখ বিকৃতি করেন।

দ্বারকানাথ, আমার আর হেয়ার সাহেবের মত হচ্ছে, মেয়েদের শিক্ষিতা না করলে এইসব ব্যভিচার দূর হবে না।

আমারও তাই মত।

মেয়েদের শিক্ষিতা করে বোঝাতে হবে, তারা পুরুষের হাতে খেলার পুতুল না। বাপ কন্যাদায় থেকে মুক্ত হবার জন্য সাত-আট-দশ বছরের মেয়েদের বিয়ে দিচ্ছে পঁচিশ-তিরিশ বছরের ছেলেদের সঙ্গে।...

ঠিক বলেছেন রাজামশাই। সবার আগে বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে হবে।

দ্বারকানাথ না থেমেই বলেন, বারো-তেরো বছরের মেয়েরা মা হয়ে জন্মরুগ্ন সন্তানকে কয়েক মাসের মধ্যেই হারাচ্ছে।

শুধু ওদের সন্তানরা না, ঐসব কচি কচি মায়েরাও তো কয়েক বছরের মধ্যেই

মরছে।

রামমোহন না থেমেই বলেন, বিয়ের পর মেয়েরা তো স্বামীদের ক্রীতদাসী হয়ে বেঁচে থাকে। ওরা যদি লেখাপড়া শিখে প্রতিবাদ করতে পারতো তাহলে কোনো হতভাগা স্বামী দশ-বিশটা বিয়ে কবতে সাহস করতো না।

দ্বারকানাথও উত্তেজিত হয়ে বলেন, এইসব সামাজিক অনাচার ব্যভিচারের আসল ওষুধ হচ্ছে শিক্ষা, শিক্ষা, শিক্ষা। সহমরণের বিরুদ্ধে আপনি যেসব পুস্তিকা লিখেছেন, তাতেও তো আপনি বার বার বলেছেন, মেয়েদের শিক্ষিত না করলে সমাজ ও দেশের কোন কল্যাণ হবে না।

হ্যাঁ দ্বারকানাথ, আমি ঠিক ঐ কথাই লিখেছি কিন্তু পুস্তিকা লিখেই কাজ হবে না। চাই মেয়েদের ইস্কুল ; প্রত্যেকটা গ্রামে-গঞ্জে-শহরে চাই শত শত হাজার হাজার মেয়েদের ইস্কুল।

আপনি আর হেয়ার সাহেব চেষ্টা করলে সব সম্ভব হবে।

রামমোহন একবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, দ্বারকানাথ, আমাদের অনেক কিছু করতে হবে। সামাজিক কুসংস্কার দূর করতে হবে, ছেলেমেয়েদের আধুনিক শিক্ষা দেবার ব্যাপারে ব্যবস্থা করতে হবে, বহু বিবাহ-বাল্য বিবাহের তীব্র বিরোধিতা করে এসব বন্ধ করতে হবে কিন্তু প্রতি পদক্ষেপেই হাজার সমস্যা।

আপনি কি ধরনের সমস্যার কথা বলছেন?

আমরা বলছি, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে হবে কিন্তু তাদের পড়ার মত বই কোথায়? যে বাংলা ভাষা চলছে, তারও সংস্কার দরকার। পাঠ্যপুস্তক দরকার; দরকার ব্যাকরণ, ইতিহাস-ভূগোলের বই।

রামমোহন মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, এত কাজ করার আশু প্রয়োজন যে চিন্তা করতে গেলে মাথা ঘুরে যায় কিন্তু চুপ করেও বসে থাকতে পারি না।

দ্বারকানাথ একটু হেসে বলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনার মাথায় যখন এইসব চিন্তা এসেছে, তখন আপনিই শত কাজের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক, ব্যাকরণ, ইতিহাস-ভূগোল ইত্যাদি বিষয়ের বইও লিখবেন।

হ্যাঁ দ্বারকানাথ, আমি লিখতে চাই কিন্তু মন চঞ্চল থাকলে তো কচি-কাঁচা ছেলেমেয়েদের পাঠ্যপুস্তক লেখা উচিত না। তাছাড়া এইসব বইপত্তর লেখার সময়ও বিশেষ পাই না।

রাজামশাই, আপনি তো সাধারণ মানুষ নন। আপনি যুগপুরুষ। অন্য সবার পক্ষে যা অসাধ্য দুঃসাধ্য, তা শুধু আপনিই পারবেন।

দ্বারকানাথ হাসতে হাসতেই কথাগুলো বলেন।

রামমোহন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, হ্যাঁ দ্বারকানাথ, সবই আমি করতে চাই কিন্তু সর্বাগ্রে সতীদাহ বন্ধ করতে হবে এবং তোমার সাহায্য ছাড়া হিন্দু সমাজেব এই বর্বর প্রথা বন্ধ করা যাবে না।

রাজামশাই, ও কথা বলবেন না। আপনি স্বয়ং রামচন্দ্র আর আমি আপনার এক বানর সেনা। আমি হাসিমুখে আপনার নির্দেশ পালন করতে পারলেই ধন্য হবো।

দ্বারকানাথ মুহূর্তের জন্য থেমে আবার বলেন, তবে সতীদাহ প্রসঙ্গে লর্ড বেন্টিঙ্ক অন্য গভর্নর জেনারেলদের মত আপনাব বক্তব্য সহজে অগ্রাহ্য করতে পারবো না।

কেন?

বেন্টিঙ্ক নিজে অত্যন্ত উচ্চশিক্ষিত। বিলেতে থাকার সময়ই আমাদের দেশ সম্পর্কে অনেক পড়াশুনা করেছেন। তাছাড়া গভর্নব জেনাবেল হবার আগেও ইনি চার বছর মাদ্রাজের গভর্নর ছিলেন। সুতরাং আমাদেব দেশের ভাল-মন্দ বিষয়ে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল।

সে তো ভাল কথা।

এর পর যেদিন আমি গভর্নর জেনারেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব, সেদিন সতীদাহ সম্পর্কে আপনার মতামতের কথা ওনাকে জানাবো।

বিদায় নেবার আগে রামমোহন বলেন, তোমার পুত্র দেবেন্দ্র কেমন আছে?

আজ্ঞে ভাল আছে।

কোন চিন্তা নেই ; তোমার এই পুত্র অত্যন্ত দীর্ঘজীবী হবে।

হঠাৎ রামমোহনের কাছে গভর্নর জেনারেলের এ-ডি-সি এসে হাজির। উনি রামমোহনকে বললেন, আপনি লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের সঙ্গে দেখা করলে উনি খুশি হবেন।

রামমোহন এ-ডি-সি কে বললেন, আমি নানা শাস্ত্রচর্চায় ব্যস্ত আছি। শুধু গভর্নর জেনারেলকে খুশি করার জন্য রাজদরবারে হাজির হবার ইচ্ছা নেই।

একথা শুনেই লর্ড বেন্টিঙ্ক এ-ডি-সি কে বলেন, তুমি ওঁর কাছে যাও। বলবে, মিস্টার উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের সঙ্গে আপনি অনুগ্রহ করে দেখা করলে তিনি অত্যন্ত বাধিত হবেন।

এ-ডি-সি আবার হাজির রামমোহনের কাছে। বললেন, আপনি অনুগ্রহ করে মিস্টার উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের সঙ্গে দেখা করলে উনি অত্যন্ত বাধিত হবেন।

রামমোহন বললেন, উনি যখন আমাব সঙ্গে দেখা করতে এতই আগ্রহী, তখ

আমি নিশ্চয়ই যাবো।

দ্বারকানাথ আবার আমন্ত্রিত হয়েছেন লর্ড ও লেডি বেন্টিঙ্কের নৈশভোজেব আসরে।

সেখানে কথায় কথায় লর্ড বেন্টিঙ্ক বললেন, মিঃ টেগোর, ক'দিন আগে মিঃ রামমোহন রায়ের সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা হলো। আমি বিলেতে বসেই নানা পত্র-পত্রিকায় ওঁর কথা পড়েছি ও ওঁর সম্পর্কে কিছু জেনেছি কিন্তু সেদিন ওঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে আমরা স্বামী-স্ত্রী সত্যি মুগ্ধ হয়েছি।

লেডি বেন্টিঙ্ক বললেন, মিস্টার রামমোহনকে দেখে ও তাঁর কথাবার্তা শুনেই বুঝলাম, উনি একজন অসাধারণ মানুষ।

দ্বারকানাথ একটু হেসে বলেন, হ্যাঁ, সত্যিই উনি একজন অসাধারণ মানুষ।

লর্ড বেন্টিঙ্ক বলেন, একদিকে রামমোহনের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, অন্য দিকে তাঁর অভাবনীয় পাণ্ডিত্য ও ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁর চিন্তা-ভাবনা জেনে আমরা স্তম্ভিত হয়েছি।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, মিস্টার টেগোর, সত্যি কথা বলতে কি, রামমোহনের মত একজন অসাধারণ মানুষ আপনাদের দেশে থাকতে পারেন, তা আমরা স্বপ্নেও ভাবিনি।

লেডি বেন্টিঙ্ক বললেন, প্রত্যেক দেশেই এমন কিছু মানুষ আছেন, যাঁরা কোন না কোন সমস্যা নিয়ে চিন্তিত কিন্তু রামমোহনকে দেখলাম, উনি যেমন বর্তমান সামাজিক, ধার্মিক, শিক্ষার অবস্থা, নারীসমাজের অবস্থা নিয়ে চিন্তিত, সেইরকমই প্রত্যেকটি সমস্যার সমাধানের উপায় সম্পর্কেও অত্যন্ত স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ মতামত জানাতেও দ্বিধা করেন না।

লেডি বেন্টিঙ্কের কথা শুনে দ্বারকানাথ খুব খুশি হন ; বলেন, হ্যাঁ, রামমোহনকে আপনি ঠিকই বুঝেছেন।

একে দ্বারকানাথের সঙ্গে লর্ড ও লেডি বেন্টিঙ্কের ঘন ঘন দেখা-সাক্ষাৎ ও বন্ধুত্ব, অন্য দিকে রামমোহনের সঙ্গে গভর্নর জেনারেলের দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা। গোঁড়া হিন্দু সমাজ শঙ্কিত হয়ে ওঠে। ওরা দ্বারস্থ হলেন শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেবের।

ওঁরা বললেন. মহারাজ, আপনি হিন্দু সমাজের কুল-চূড়ামণি। বিধর্মী রামমোহন তো আমাদের সনাতন হিন্দু ধর্ম ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর। আবার তাঁর প্রধান সাগরেদ হচ্ছে জোড়াসাঁকোর দ্বারকানাথ ঠাকুর।

রাজা রাধাকান্ত গম্ভীর হয়ে বলেন, জানি।

বিদ্যাবাগীশ মশাই বলেন, মহারাজ, দ্বারকানাথ ঠাকুররা তো পিরালী বামুন আমাদের মত বামুনদের সঙ্গে ওদের কোন বিয়ে-থা হয় না। সে যাইহোক শুনেছি দ্বারকানাথ প্রতিদিন সকালে সন্ধ্যা-আহ্নিক ও গৃহ দেবতার পূজা না করে জলস্পর্শ করেন না।

হ্যাঁ, সেইরকমই শুনেছি।

কিন্তু মহারাজ, এই দ্বারকানাথই তো কোট-প্যান্টুলুন পরে সারাদিন সাহেব-মেমদের সঙ্গে ওঠা-বসা খাওয়া করে।

স্মৃতিতীর্থ মশাই নাকে নস্য দিয়েই বলেন, শুধু কি তাই? ম্লেচ্ছ রামমোহনের আত্মীয় সভায় দ্বারকানাথ শুধু নিয়মিত যোগদান করেন না, ওখানে গিয়ে অন্য সদস্যদের সঙ্গে গোমাংসও ভক্ষণ করেন।

রাজা রাধাকান্ত চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, সত্য-মিথ্যা জানি না ; তবে এই ধরনের অভিযোগ আমিও শুনেছি।

বিদ্যানিধি মশাই বলেন, রামমোহন-দ্বারকানাথের বন্ধুত্ব তো মণি কাঞ্চন যোগ ওরা সতীদাহ বন্ধ না করে ছাড়বে না।

বিদ্যাবাগীশ মশাই বলেন, মহারাজ, আপনি এর কিছু বিহিত না করলে ঐ দুই ম্লেচ্ছ হিন্দু ধর্ম ধ্বংস না করে ছাড়বে না।

রাজা রাধাকান্ত বলেন, ওরা দু'চারজনে বললেই তো সতীদাহের মত শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা বন্ধ হতে পারে না। তাছাড়া দেশাচারও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

ঠিক বলেছেন মহারাজ।

সতীদাহের সমর্থনে শাস্ত্রের সমস্ত নির্দেশ লিপিবদ্ধ করুন। তারপর কয়েক শ' বিশিষ্ট ব্যক্তির স্বাক্ষর সমেত গভর্নর জেনারেলকে চিঠি লিখব।

রাজা রাধাকান্ত একটু মুচকি হেসে বলেন, রামমোহন আর দ্বারকানাথকে দেখিয়ে দেব, কত ধানে কত চাল!

দু' পক্ষের মধ্যেই পুরোপুরি যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল।

তারপর?

১৮২৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক সতীদাহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে সরকারী আদেশ জারী করলেন।

এর ঠিক মাস ছয়েক আগেই বীরসিংহের ন'বছরের ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণ শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছেন।

আট

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির লন্ডনস্থ কর্তাদের সমালোচনায় ব্যর্থতার গ্লানি নিয়েই বিদায় নিয়েছেন লর্ড আমহার্স্ট। নতুন গভর্নর জেনারেল হয়ে এসেছেন লর্ড উইলিয়ম ক্যাভেনডিস বেন্টিঙ্ক।

বেন্টিঙ্ক প্রথম ভারতে আসনে মাদ্রাজের গভর্নর হয়ে। দ্বিতীয়বার আসেন ভেলোর বিদ্রোহের সময়। তৃতীয়বার একেবারে গভর্নর জেনারেল হয়ে।

ইনি ঠিক পূর্বসূরীদের মত ছিলেন না, ছিলেন স্বতন্ত্র প্রকৃতির। গুলি-গোলা কামান-বন্দুক সৈন্যসামন্তের বদলে ইনি কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক বুদ্ধিকেই সম্বল করে দেশ শাসন করতে পছন্দ করতেন। তাইতো কোন যুদ্ধ না করেও ইনি কাছাড়, জয়ন্তীয়া (আসাম), মহীশূর, পাঞ্জাব প্রভৃতি এলাকা কোম্পানির দখলে আনেন নানা উপায়ে। তাছাড়া কোম্পানির কর্মচারীদের দুর্নীতি দমন করে কোম্পানির আয় বৃদ্ধি করেন। লর্ড বেন্টিঙ্কের আমলেই শুরু হয় উচ্চপদে ভারতীয়দের নিয়োগ।

এই পর্যন্ত ঠিকই ছিল, কিন্তু বেন্টিঙ্ক সতীদাহ নিষিদ্ধ করায় ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল। হিন্দু সিপাহীরা মনে করলো খ্রীস্টান ইংরেজরা হিন্দু ধর্ম ধ্বংস করতে কৃতসঙ্কল্প। আবার মুসলমান মনে করলো, কোম্পানি যখন হিন্দুদের ধর্ম নষ্ট করছে, তখন ভবিষ্যতে ওদের ধর্মের ব্যাপারেও নিশ্চয়ই হস্তক্ষেপ করবে। সব সিপাহীরাই মনে করলো, কোম্পানি সব হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীকেই খ্রীস্টান করার মতলব করছে।

ওদের মনে সন্দেহের মেঘ আরো ঘনীভূত হলো।

সরল মনের হিন্দু সিপাহীরা জানতেও পারলো না, স্বয়ং রাজা রামমোহন রায়ের মত যুগপ্রবর্তক অশাস্ত্রীয় সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে দীর্ঘ আন্দোলনের জন্যই বেন্টিঙ্ক সতীদাহ নিষিদ্ধ কবেন।

একটার পর একটা এমন ঘটনা ঘটতে থাকে যে সিপাহীরা শান্তিতে থাকতে পারে

না।

একদিন হঠাৎ সিপাহীদের হুকুম জারী করা হলো, চলো আফগানিস্তান। আফগানদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে।

হিন্দু সিপাহীদের মাথায় বজ্রাঘাত! সিন্ধু নদী পার হবো কী করে? সিন্ধু নদীর ওপারেই তো বিদেশ। হিন্দুদের তো বিদেশ যেতে নেই।

কোম্পানির সেনাপতি বললেন, ঠিক হ্যায়। তোমাদের সিন্ধু নদী পার হতে হবে না। বেলুচিস্তান-পারস্যের সীমানার মরুভূমির ভিতর দিয়েই চলো কান্দাহার।

হাজার হোক কোম্পানির সিপাহী। যুদ্ধ করতে এদের কোন আপত্তি নেই। সুতরাং মরুভূমির মধ্যে দিয়েই চলো কান্দাহার।

আফগানিস্তানে পৌঁছেই হিন্দু সিপাহীদের মাথায় হাত। হা ভগবান! এখানে তো সবাই মুসলমান! ওরাই তো জল আনছে, রান্নাবান্না করার চাল-গম এনে দিচ্ছে। বাধ্য হয়েই হিন্দু সিপাহীরা ওদের আনা জল খায়, ওদের এনে দেওয়া উপকরণ দিয়েই রান্নাবান্না করে খায়। যুদ্ধের সময় তো না খেয়ে থাকা যায় না।

তুমুল যুদ্ধের পরও কোম্পানির বিশাল সেনাবাহিনী আফগানদের পরাজিত করতে পারে না। ইংরেজ সেনাপতিরা মাথা হেঁট করে ভারতে ফিরে আসে।

আফগানিস্তান থেকে ফিরে আসার পর হিন্দু সিপাহীদের বর্জন করলো ওদের পরিবার-পরিজন ও সমাজ। না, না, ওরা আর হিন্দু নেই, মুসলমান হয়ে গেছে। যারা ওদের সঙ্গে ওঠা-বসা খাওয়া-দাওয়া করবে, তাদের জাত যাবে, ধর্ম যাবে।

বাধ্য হয়ে একদল হিন্দু সিপাহী ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হলো। আবার কেউ কেউ পুণ্যতীর্থ কাশীধামে গিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করে কোন মতে সমাজে টিকে গেল। তবে এক দল হিন্দু সিপাহী গর্জে উঠলো ইংরেজ অফিসারদের বিরুদ্ধে—বলো, কেন তোমরা আমাদের আফগানদের দেশে নিয়ে গিয়ে ধর্মচ্যুত করলে? তোমরা কি জানো না, যুদ্ধে আমরা প্রাণ দিতে দ্বিধা করি না কিন্তু প্রাণের চেয়ে ধর্ম আমাদের কাছে অনেক প্রিয়?

সুবাদার সীতারাম বিদ্রোহ না করলেও তার সিপাহী পুত্র বিদ্রোহ না করে পারে না।

ইংরেজ কর্নেল সাহেব রেগে লাল। চিৎকার করে বলেন, সুবাদার সীতারাম!

জী কর্নেল সাব।

তুমিই গুলি করে তোমার ছেলেকে খতম করো। এ হারামীকে আমি বেঁচে থাকতে দেব না।

কর্নেলের হুকুম শুনেই সীতারামের মাথা ঘুরে যায়।

ভাগ্যক্রমে অন্য একজন সুবুদ্ধিসম্পন্ন ইংরেজ অফিসার ঐ বীভৎস কাণ্ড ঘটতে দেন না।

নো, নো, সুবাদার সীতারাম, তোমাকে গুলি করে ছেলেকে হত্যা করতে হবে না। তুমি এখান থেকে যাও।

হ্যাঁ, সুবাদার সীতারাম ওখান থেকে বিদায় নিতেই কর্নেলের ইশারায় এক ইংরেজ অফিসার গুলি করে সীতারামের ছেলেকে চরম শিক্ষা দেন। গুলি খেয়ে মরতে হয় আরো কিছু হিন্দু সিপাহীকে।

এইসব ঘটনায় মুসলমান সিপাহীরাও খুশি হলো না। খুশি হবে কেন? ওদের ধর্ম আলাদা হলেও একই সুখ-দুঃখ ভোগ করতে হয় হিন্দু-মুসলমান সিপাহীদের। থাকতে হয় পাশাপাশি, যুদ্ধক্ষেত্রে আহত বা নিহত হতে হয় সব ধর্মের সিপাহীকেই। তাছাড়া হিন্দু সিপাহীদের মত মুসলমান সিপাহীরাও যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত হয় না কিন্তু ধর্ম যে প্রাণের চাইতেও প্রিয় ও গর্বের।

তবে একটা ব্যাপারে দু'ধর্মের সিপাহীরাই খুশি। আগে ওদের স্থির বিশ্বাস ছিল, ইংরেজ সেনাপতিদের কেউ কোনদিন পরাজিত করতে পারবে না। আফগান যুদ্ধের আগে ভরতপুর আর নেপালে ইংরেজ সেনাপতিদের সমর কৌশল ব্যর্থ হয় আর এবার তো এশিয়ার একটি দেশের সেনাবাহিনীর হাতে নিদারুণ পরাজয় বরণ করে ইংরেজ সেনাপতিদের আফগানিস্তান থেকে কোনক্রমে পালিয়ে আসতে হয়েছে।

সে যাইহোক, রেলগাড়ি আর টেলিগ্রাফ চালু হওয়ার জন্য সিপাহীরা মনে করে, এসব কিছুই হচ্ছে হিন্দু-মুসলমানদের ধর্ম নষ্ট করার জন্য।

আরে ভজনলাল!

হাঁ চাচা, বোলো।

সব সব্বোনাশ হয়ে গেল।

কেন চাচা?

আরে ঐ যে পুপ ঝিক ঝিক গাড়ি চলতা হ্যায়...

হাঁ, হাঁ, রেলগাড়ি।

ঐ রেলগাড়ির ডিব্বাতে চামার-ডোম-অচ্ছুতদের পাশেই আমাদের মত ব্রাহ্মণদের বসতে হবে।

কি বলছেন চাচা?

ভজনলাল, আমি ঠিকই বলছি।

ইসকা মতলব রেলগাড়ি চড়লেই তো আমাদের জাত যাবে।

আরে বেটা শালা আংরেজরা আমাদের খ্রীস্টান করার জন্যই রেলগাড়ি আর টেলিগ্রাফ চালু করেছে।

হা ভগবান! আমরা হিন্দুস্থানেও হিন্দু থাকতে পারবো না!

এ সুবাদার ভাইয়া!

হা মনসুর, বোলো।

মালুম হ্যায় টেলিগ্রাফ চালু হুয়া।

সুনা হ্যায, মীরটকে খট্ খট্ করেগা তো ফোরন দিল্লী সে খবর চলা যায় গা।

জী ভাইয়া, ঠিক সুনা হ্যায়।

সুবাদার মনসুর মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, এইসব চালু করার আসল মতলব হচ্ছে এখানে আমরা কিছু গণ্ডগোল করলেই দিল্লীতে টেলিগ্রাফ যাবে।

তাতে কি হলো?

আরে ভাইয়া, দিল্লী থেকে ফৌজ এসে আমাদের ঠাণ্ডা করবে।

এ তো বহুত চিন্তা কা বাত হ্যায়।

হাঁ ভাইয়া, বহুত চিন্তা কা বাত হ্যায়।

এদিকে কোম্পানির কাজে যত ইংরেজ সাহেব এসেছে, তার দ্বিগুণ তিনগুণ পাদ্রী এসেছে এই দেশে। এরা স্কুলে, হাসপাতালে, জেলখানায় ছাড়াও প্রকাশ্য হাটে-বাজারে শুধু খ্রীস্টধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার করছে না, প্রাণ ভরে নিন্দা ও উপহাস করছে হিন্দু-মুসলমান ধর্মকে। ওরা বলছে, সভ্য মানুষের জন্য খ্রীস্টান ধর্ম আর বর্বব অসভ্যদের হচ্ছে হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম।

হিন্দুরা ধর্মের কথা বলে মন্দিরে, মুসলমানরা ধর্মের কথা শোনে মসজিদে ; কিন্তু হিন্দু পুরোহিত বা মুসলমানদের ইমাম কখনই হাটে-বাজারে স্কুলে-হাসপাতালে গিয়ে নিজেদেব ধর্ম প্রচারও করে না, অন্য ধর্মের নিন্দাও করে না। খ্রীস্টান পাদ্রীরা সে সৌজন্যের ধার ধারে না।

দেশের হিন্দু-মুসলমানরা সত্যি চিন্তিত হয়।

না, পাদ্রীরা শুধু স্কুল-হাসপাতাল-জেল আর হাটে-বাজারে খ্রীস্টধর্ম প্রচার ও হিন্দু-মুসলমান ধর্মের নিন্দা করেই খুশি হতে পারে না। ওরা সেনা ছাউনিতে হিন্দু-

মুসলমান সিপাহীদের কাছেও খ্রীস্ট ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার করে আর বিদ্রূপ উপহাস করে সিপাহীদের ধর্ম নিয়ে।

শুধু কি তাই?

সিপাহীরা দেখে পাদ্রীদের আহার-বাসস্থান-অর্থ আর যানবাহন দিয়ে কোম্পানি সাহায্য করছে প্রতিনিয়ত। ওরা হাটে-বাজারে গেলে দেখতে পায়, পাদ্রীরা খ্রীস্ট প্রচার করার সময় পুলিশ তাদের পাহারা দিচ্ছে। কখনও কখনও স্বয়ং জজ-ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত এসে পাদ্রীদের পাশে বসে থাকছেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

সিপাহীরা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছয় যে ইংরেজরা শুধু এই দেশ দখল করতে আসে নি ; ওরা সব হিন্দু-মুসলমানদেরও খ্রীস্টান করতে বদ্ধপরিকর।

সিপাহীদের অসন্তোষ আর দুঃশ্চিন্তার শেষ নেই।

সতীদাহ নিষিদ্ধ হবার পরও রামমোহন আত্মসন্তুষ্ট হতে পারেন না। হাতে কত কাজ, কত দায়িত্ব। বেদ বিদ্যালয় আর ইংরেজি বিদ্যালয় চালাতে হচ্ছে নিজ ব্যয়ে। লিখতে হচ্ছে কত বই ; সাধারণ পাঠ্য, গৌড়ীয় ব্যাকরণ, ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যার জন্য খগোল আর জ্যামিতি। সম্পাদনা করতে হচ্ছে সংবাদ কৌমুদী পত্রিকা ; লিখতে হচ্ছে নারীশিক্ষা, নারীকল্যাণ, নারীশক্তি, আধুনিক শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে প্রবন্ধ-নিবন্ধ।

হঠাৎ একদিন মনে হলো, বাংলা, গদ্য লেখার পদ্ধতিরও সংস্কার অত্যন্ত জরুবী। ইংরেজিতে যদি 'কমা' 'সেমিকোলন' ব্যবহার হতে পারে, তাহলে বাংলায় হবে না কেন? 'কমা' 'সেমিকোলন' ব্যবহার করলে তো গদ্য লেখা অনেক অর্থবহ হবে।

না, রামমোহনের নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই কিন্তু কোন কাজ অসম্পূর্ণ রাখার পাত্রও উনি না।

এইসব কাজ চলতে চলতেই রামমোহনের মনে হয়, নানা কারণে সত্বর বিলেত যাওয়া দরকাব। রাজা রাধাকান্ত দেবের দল সতীদাহ নিষিদ্ধ করার বিরুদ্ধে প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করেছে। ঐ আপীলের শুনানির সময় অবশ্যই তাঁরে প্রিভি কাউন্সিলে উপস্থিত থাকা দরকার।

তাছাড়া ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নতুন সনন্দ বিষয়ে ইংরেজ সরকার বিবেচনা করছে। এই নতুন সনন্দের উপরই নির্ভর করবে, ভবিষ্যতে কোম্পানি কিভাবে ভারতবর্ষ শাসন করবে ও ভারতবাসীরা কি ধরনের সুযোগ-সুবিধা-অধিকার ভোগ করবে। সুতরাং ভারতবাসীর সমস্যা ও সমাধানের কথাও ইংরেজদের জানানো খুবই

জরুরী।

কিন্তু চারদিকে শত্রু। আধুনিক ও ইংরেজি শিক্ষার বিরুদ্ধে এক দল সোচ্চার ; ধর্ম সংস্কারের বিরুদ্ধে গোঁড়া হিন্দুরা খড়্গহস্ত ; নারী জাতিকে তাদের নায্য অধিকার ও উপযুক্ত শিক্ষা দেবার ব্যাপারেও ঘোরতর বিরোধিতা করছে বহুজন। সুতরাং নিজের দলবল একটু ভারী না করে বিলেত যাবেন কি করে?

ইতিমধ্যে দিল্লীর নিকটবর্তী এক জমিদারির রাজস্বের একাংশ থেকে দিল্লীর বাদশাকে বঞ্চিত করে কোম্পানি। এই ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হওয়ায় দিল্লীর বাদশা বাহাদুর ঠিক করলেন, স্বয়ং ইংলন্ডের সম্রাটের কাছে সুবিচার প্রার্থনা করবেন কিন্তু সম্রাটকে কে উপযুক্তভাবে তাঁর দাবি পেশ করতে পারবেন?

আবার কে? রামমোহন।

দিল্লীর বাদশা বাহাদুর রামমোহনকে রাজা উপাধিতে ভূষিত করে তাঁকে তাঁর প্রতিনিধিস্বরূপ ইংলন্ডের দরবারে পাঠাবেন বলে সিদ্ধান্ত নিলেন এবং রামমোহন হাসিমুখে এই গুরুদায়িত্ব পালন করতে স্বীকৃতি জানালেন।

ব্যস! সঙ্গে সঙ্গে ঝড় উঠলো সমগ্র হিন্দু সমাজে।

বামুনের ঘরের ছেলে হয়ে কালাপানি পার হবে?

ছি! ছি!

শুধু কি তাই? ঐ ম্লেচ্ছদের দেশে গিয়ে তো নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণ করতে হবে।

রাম! রাম!

ওরে বাপু, যে হতভাগা সতীদাহ বন্ধ করে, দেব-দেবীর মূর্তি পূজা করে না, আত্মীয়সভার সদস্যদের গোমাংস খেতে উৎসাহ দেয়, সে কি আর হিন্দু আছে?

ও যবন! ও ম্লেচ্ছ!

শুধু গোঁড়া হিন্দুরা না, আত্মীয়-স্বজনরাও ক্ষেপে উঠলেন।

আমবা সমাজে মুখ দেখাবো কি করে? কি করে বিয়ে দেব ছেলেমেয়েদের? তাছাড়া সমাজ যদি আমাদের একঘরে করে?

ষোল বছরের যে কিশোর পিতার সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় গৃহত্যাগ করে ভারতবর্ষের নানা রাজ্য পরিক্রমার পর চিরতুষারাবৃত হিমালয় অতিক্রম করে তিব্বত যেতে পারে, সে এই পরিণত বয়সে বিলেত যেতে দ্বিধা করবে?

তাছাড়া ওরা কি জানেন না, নিন্দা, বিদ্রূপ, তিরস্কার ও সমালোচনায় সিদ্ধান্ত থেকে পিছিয়ে আসার পাত্র রামমোহন নন?

বিলেত যাত্রার দু'দিন আগে রামমোহন এলেন দ্বারকানাথের সঙ্গে দেখা করতে।

দ্বারকানাথ ওঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করে ঘরে নিয়ে যান।

রামমোহন আসন গ্রহণ করেই বলেন, তুমি তো জানো, আমি পরশু বিলেত যাত্রা করছি?

আজ্ঞে হ্যাঁ, জানি।

তাই তোমার কাছ থেকে বিদায় নিতে এলাম।

আজ্ঞে আমি তো জাহাজ ঘাটেই আপনাকে বিদায় জানাতে যাবো। বিদায় নেবার জন্য আপনার কষ্ট করে আসার দরকার ছিল না।

দ্বারকানাথ, তুমি জাহাজ ঘাটে উপস্থিত থাকলে আমি অবশ্যই খুশি হবো। এসেছি শুধু বিদায় নিতে না ; কতকগুলি জরুরী কথা বলতে।

হ্যাঁ, বলুন।

সর্বপ্রথমে আমার ব্রাহ্ম সমাজের কথা বলব।

হ্যাঁ, বলুন।

তুমি সন্ধ্যা-আহ্নিক ও গৃহদেবতার পূজা না করে জলস্পর্শ করো না। তুমি আমার ব্রাহ্ম সমাজেও যোগ দাও নি। কিন্তু তবুও তুমি আত্মীয় সভা-ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে আমার সমস্ত কাজে ও উদ্যমকে শুধু সমর্থন করো নি, দু'হাতে অর্থসাহায্য করেছ।

রাজামশাই, ওকথা বলে আমাকে লজ্জা দেবেন না। আমি তো বলেছি, আপনি আমার রামচন্দ্র আর আমি আপনার নগণ্য এক বানর সেনা। আমি তো আপনাকে প্রণামী হিসেবেই যৎকিঞ্চিত দিয়েছি কিন্তু আমার আরো অনেক কিছু করা উচিত ছিল।

না, দ্বারকানাথ, তুমি যৎকিঞ্চিত করো নি। তুমি স্বেচ্ছায় হাসিমুখে নিঃস্বার্থভাবে যা করেছ, তা আমি জীবনেও ভুলব না।

রামমোহন মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, তোমার সাহায্য সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতার জন্যই আমি সতীদাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে সফল হলাম।

আমাদের দেশে কোটি কোটি লোকের বাস কিন্তু শুধু আপনিই গর্জে উঠেছিলেন সতীদাহের বিরুদ্ধে। আপনার ন্যায়-নিষ্ঠা যুক্তি-তর্কের কাছে ভেসে গেছে গোঁড়া হিন্দুদের চক্রান্ত। তাইতো বেন্টিঙ্ক সাহেব আপনার মত ও পরামর্শ গ্রহণ না করে পারেন নি।

তোমার এইসব কথা মেনে নিয়েও বলব, তুমি নিজে গোঁড়া হিন্দু হয়েও আমার মতামতকে সমর্থন করে গভর্নর জেনারেল ও তাঁর স্ত্রীকে বুঝিয়েছ বলেই সতীদাহ

বন্ধ হলো।

রামমোহন একবার নিঃশ্বাস নিয়েই বলেন, সতীদাহ বন্ধের ব্যাপরে তুমি যে কি অভাবনীয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছ, তা শুধু আমিই জানি।

রাজামশাই, আপনার অনুপস্থিতিতে আমার কি কর্তব্য তাই বলুন।

দ্বারকানাথ, ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করেও বড়ই দুশ্চিন্তা নিয়ে বিলেত যাচ্ছি।

দুশ্চিন্তা হচ্ছে কেন?

সমাজের নিজস্ব ঘড়বাড়ি নেই, অর্থ নেই ; কি করে যে আচার্যের মাসোহারা দেওয়া হবে, তাও জানি না। অথচ আমার কাছে এখন এত অর্থ নেই যে....

ওঁকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই দ্বারকানাথ বলেন, আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, সমাজের আচার্যের মাসোহারার ব্যবস্থা আমি করব। তাছাড়া প্রয়োজন হলে ঘরবাড়ির জন্যও যথাসাধ্য করব।

দ্বারকানাথ না থেমেই বলেন, আপনি দয়া করে দুশ্চিন্তা করবেন না। অনেক গুরুদায়িত্ব নিয়ে বিলেত যাচ্ছেন। সুতরাং এখন অন্য চিন্তা করবেন না।

দ্বারকানাথ, তুমি যে আমাকে কি নিশ্চিন্ত করলে, তা বলতে পারব না।

রামমোহন মুহূর্তের জন্য থেমে একটু হেসে বলেন, আমি জানি তোমার অনেক আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু পরিচিতজনেরা তোমার নিন্দায় সোচ্চার।

দ্বারকানাথ একটু হাসেন।

তুমি হাসছ কিন্তু আমি সত্যি কথাই বললাম। ওরা বলে, তুমি ভোগ বিলাসে মত্ত, তুমি নর্তকীদের নৃত্য দেখো, তুমি মদ্যপান করো, তুমি অখাদ্য-কুখাদ্য খাও, তুমি ম্লেচ্ছদের সঙ্গে ওঠা-বসা করো ও আরো কত কি!

রামমোহন একবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেন, যদি তোমার বংশধররাও এই অপবাদ দেয়, তাতেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই কিন্তু আমি তো মনে-প্রাণে জানি, দেশের প্রত্যেকটি সৎকার্যে তুমি কিভাবে অর্থসাহায্য ও সহযোগিতা করেছ।

রাজামশাই, এ তো আমার কর্তব্য।

দ্বারকানাথ, আমি শুধু তোমাকে ভালবাসি না, নানা কারণে আমি তোমাকে শ্রদ্ধাও করি।

আপনি কি বলছেন?

দ্বারকানাথ, আমি ঠিকই বলছি। তুমি এই বঙ্গদেশে জন্মেও বঙ্গবাসীর মত অলস, কর্মবিমুখ, পরশ্রীকাতর, কুসংস্কারাচ্ছন্ন কূপমণ্ডুক হওনি। তুমি তোমার বিদ্যা-বুদ্ধি দিয়ে ও অভাবনীয় পরিশ্রম করে বিপুল অর্থ উপার্জন করেছ।

রামমোহন মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, আমি চারপাশে যেসব গণ্যমান্য ধনীদের

দেখি তারা প্রায় সবাই অসৎ উপায়ে ও কোম্পানির সাহেবদের মোসাহেবী করে বিপুল অর্থের অধিকারী হয়েছেন। আর তুমি ইংরেজদের সঙ্গে সমান তালে পাল্লা দিয়ে জাহাজের কোম্পানি, ব্যাঙ্ক ও খনির মালিক হয়েছ।

উনি একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, এ যে কত বড় কৃতিত্বের কথা, তা আমি বুঝতে পারি। তোমার ভবিষ্যত বংশধরদের মধ্যে কেউ বা অন্য কোন বঙ্গবাসী একশ' বছর পরেও তোমার মত কৃতিত্ব অর্জন করবে কিনা সন্দেহ হয়।

দ্বারকানাথ নীরবে রামমোহনের কথা শোনেন।

রামমোহন একটু হেসে বলেন, সব শেষে একটা কথা বলব।

হ্যাঁ, বলুন।

তুমি তো দেখেছ, আমাকে পদে পদে কত শত্রু, কত সমালোচক ও বিরোধীদের মুখোমুখি হতে হয়েছে কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে আমি আমার কাজ করেছি। উনি মুহূর্তের জন্য না থেমেই বলেন, তুমিও সমালোচক ও বিরোধীদের উপেক্ষা করেই স্ব-নির্দিষ্ট পথে এগিয়ে যাও। ভুলে যেও না, এই অভাগা দেশে যে কাজ করে না, তার শত্রু নেই, নিন্দুকও নেই। এখানে ভাল কাজ করলেই নিন্দিত হতে হবে।

দ্বারকানাথ একটু হাসেন।

রামমোহন আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, আবার বলছি, আমার স্বপ্ন সাধনার ব্রাহ্ম সমাজকে একটু দেখো।

শুধু সমাজ না, আপনার অন্যান্য সবকিছুই আমি যথাসাধ্য দেখাশুনা করব, আপনি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন।

দ্বারকানাথ, আমি আসি। আবার কবে আমাদের দেখা হবে জানি না। যাইহোক তুমি সুস্থ থাকো, দীর্ঘজীবী হও এবং দেশ ও দশের কল্যাণ করো।

দ্বারকানাথ ওঁকে প্রণাম করে বলেন, আপনি আশীর্বাদ করুন, আমি যেন আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারি।

আমি দিবারাত্রি মনে মনে তোমাকে আশীর্বাদ করি।

রামমোহন ঘর থেকে বেরিয়ে কয়েক পা এগিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে বলেন, ভাল কথা দ্বারকানাথ, শুনলাম, বেন্টিঙ্ক সাহেব এখানে একটা মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার কথা ভাবছেন।

আমি একদিন কথায় কথায় বেন্টিঙ্ক সাহেবকে বলছিলাম, এখানে ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, টাইফায়েড, কলেরা, বসন্ত ইত্যাদি রোগে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যায়। শিশুরা জন্মের পর পরই মারা যাচ্ছে অথচ আধুনিক চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নেই।

ঠিক বলেছ।

আমি বেন্টিঙ্ক সাহেবকে অনুরোধ করেছি। মেডিক্যাল কলেজ খোলার ব্যাপারে উদ্যোগী হতে।

উনি রাজি হয়েছেন?

হ্যাঁ হয়েছেন ; তবে বলেছেন, আমাদেরও অর্থসাহায্য দিতে হবে।

রামমোহন একটু হেসে বলেন, তুমি নিশ্চয়ই অর্থসাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছ?

রাজামশাই, কলকাতায় ভারতের প্রথম মেডিক্যাল কলেজ হবে আর আমি কিছু করব না, তা তো হয় না। আমি নিশ্চয়ই যথাসাধ্য অর্থসাহায্য করব।

রামমোহন আবার একটু হেসে বলেন, তোমাকে কি শুধু শুধু আমি ভালবাসি ও শ্রদ্ধা করি!

১৫ই নভেম্বর ১৮৩০ ; সোমবার।

রাজা রামমোহন রায় কলকাতা বন্দর থেকে আলবিয়ান জাহাজে বিলেত যাত্রা করলেন। সঙ্গে নিয়ে গেলেন তার পালিত পুত্র রাজারাম, রামরত্ন মুখোপাধ্যায় আর রামহরিদাসকে। তাছাড়া নিয়মিত দুধ খাবার জন্য দুটি দুগ্ধবতী গাভীও ওদের সঙ্গে বিলেত রওনা হলো।

ঠিক চার মাস ২৩ দিন পর 'আলবিয়ান' পৌঁছলো লিভারপুল। রামমোহন উঠলেন র‍্যাডলিস হোটেলে।

নয়

ডাঃ গ্রান্টের 'ইন্ডিয়া গেজেট' পত্রিকায় সুবিখ্যাত জার্মান দার্শনিক ক্যান্টের গ্রন্থের সমালোচনা পড়ে পণ্ডিতসমাজ চমকে উঠলেন। কি অসামান্য পাণ্ডিত্য ও বিচারবুদ্ধি এই সমালোচকের!

কিন্তু কে এই হেনরী ভিভিয়ান ডিরোজিও?

কেউ কস্মিনকালে এর নাম পর্যন্ত শোনে নি। অনেকেই ডাঃ গ্রান্টকে প্রশ্ন করেন, কে এই ডিরোজিও? কি করে? কোথায় থাকে? বয়স কত?

ডাঃ গ্রান্ট সবাইকেই বলেন, আমার সঙ্গে মিঃ ডিরোজিও'র পরিচয় হয় নি।

সুতরাং উনি কি করেন বা বয়স কত, তা বলতে পারবো না। তবে উনি ভাগলপুর থেকে আমার পত্রিকায় প্রকাশের জন্য মাঝে মাঝে কবিতা ও প্রবন্ধ পাঠিয়ে দেন।

ডাঃ গ্রান্ট একটু হেসে বলেন, ডিরোজিও'র কবিতা আর প্রবন্ধ পাঠ করে আমি মুগ্ধ হয়ে যাই। উনি সত্যি গুণী মানুষ।

হেনরী ভিভিয়ান ডিরোজিও কলকাতা শহরের এন্টালী পদ্মপুকুরে মামলালীর দরগা নামের এক বাড়িতে ১৮০৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি জাতিতে পর্তুগীজ ফিরিঙ্গী। এঁর বাবা এক সওদাগরী অফিসে বেশ উচ্চপদে কাজ করতেন এবং ফিরিঙ্গী সমাজে বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন।

এই সময় ডেভিড ড্রমন্ড নামে এক স্কটিশ সাহেব কলকাতার ধর্মতলায় এক স্কুল খোলেন। কবি, সাহিত্যিক ও দার্শনিক বলে ওঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল কিন্তু গোঁড়ামীর জন্য খ্রীস্টানদের অনেককেই উনি পছন্দ করতেন না। তাছাড়া ইনি ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারায় বিশেষ প্রভাবিত ছিলেন। সাহেবরা মনে করতেন, ওঁর স্কুলে পড়লে ছেলেরা নাস্তিক হবে। তাই ঐ স্কুলে অনেকেই ছেলেদের পড়াতেন না।

ড্রমন্ড চাইতেন, তার স্কুলের ছাত্ররা স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে শিখুক এবং বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন হোক। বালক ডিরোজিওকে ড্রমন্ড সাহেবের স্কুলেই ভর্তি করলেন ওর বাবা। ডিরোজিও পড়াশুনা শেষ করলেন মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে।

তারপর কিছুদিন বাবার অফিসে কেরানীগিরি। কিন্তু কেরানীগিরি করতে ভাল না লাগায় ডিরোজিও চলে গেলেন ভাগলপুরে মাসীর কাছে। আপনমনে ঘুরে বেড়ান গঙ্গার ধারে। তাছাড়া কখনও ইংরেজি সাহিত্য ও দর্শনের বই পড়েন বা কবিতা ও প্রবন্ধ লেখেন।

গঙ্গার এক চড়ায় গাছপালা ঘেরা ঝঙ্গীরা আশ্রমে এক ফকির ছিলেন। ঐ ফকিরকে নিয়েই ডিরোজিও লিখলেন 'Takin of Jhungeera' নামে কাব্যগ্রন্থ। এই কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ হতেই কলকাতার গুণী-জ্ঞানীরা কবির প্রতিভা দেখে বিস্মিত না হয়ে পারলেন না। কবিতার বই ছাপার জন্য ডিরোজিও যখন ভাগলপুর থেকে কলকাতা এসেছেন, ঠিক তখনই হিন্দু কলেজে এক শিক্ষকের পদ খালি হয় এবং ডিরোজিও ঐ পদে নিযুক্ত হন। সেটা ১৮২৮ সালের মার্চের কথা।

উনিশ বছরের এই তরুণ শিক্ষককে পেয়ে হিন্দু কলেজের ছাত্ররা আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল। সত্যি কথা বলতে কি চুম্বক যেমন লৌহচূর্ণকে আকর্ষণ করে, ডিরোজিও ঠিক সেইরকমভাবেই আকৃষ্ট করতেন ছাত্রদের। ছাত্ররা মুগ্ধ হয়ে ক্লাসে

তাঁর পড়া শোনে কিন্তু ছুটির পরও ছাত্ররা তাঁকে মুক্তি দেয় না। ডিরোজিওর চার পাশে ওরা ভীড় করে।

ডিরোজিও ছাত্রদের স্বাধীন চিন্তায় উৎসাহ দেবার জন্য কোন না কোন বিষয়ে তর্ক শুরু করে দেন। আর বলেন, আমি যা বলব, তোমরা তাব বিরুদ্ধে বলবে ; আবার তোমরা যা বলবে, আমি তার বিরুদ্ধে বলব।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে ঐ তর্ক-বিতর্কের খেলা। কখনও কখনও ছাত্ররা হেরে যায়, কখনো আবার ডিরোজিও হেরে যান কিন্তু ফলাফল যাইহোক, সবাই খুশি হয়।

ডিরোজিও সাহিত্য ও ইতিহাসের শিক্ষক হলেও ছাত্রদের সঙ্গে অন্যান্য অনেক বিষয়েই আলাপ-আলোচনা তর্ক-বিতর্ক করেন। এই আলাপ-আলোচনা তর্ক-বিতর্কের আসরে দিন দিনই ছাত্রদের ভীড় বাড়ে। ডিরোজিও যাদের ক্লাশ নেন না, তারাও আসে ; না এসে পারে না।

যেখানে শিক্ষক মহাশয় সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্ম, সমাজ, জীবনযাত্রা, সংস্কার-কুসংস্কার ইত্যাদি সব বিষয়ে ছাত্রদের সঙ্গে মন খুলে আলাপ-আলোচনা তর্ক-বিতর্ক করেন, সেখানে ছাত্ররা যোগদান না করে থাকবে কি করে?

তাছাড়া ডিরোজিও যে ছাত্রদের সঙ্গে ঠিক বন্ধুর মতই মেলামেশা ওঠা-বসা করেন।

হেয়ার সাহেব ডিরোজিওর সঙ্গে ছাত্রদের গভীর হৃদ্যতা দেখে খুব খুশি হন।

এক দল ছাত্র তো মাঝে মাঝেই ডিরোজিওর বাড়িতে গিয়েও হাজির হয়। রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখার্জি, মহেশ ঘোষ ও আরো কয়েকজন প্রায় প্রতিদিনই ডিরোজিওর বাড়িতে যায়। ডিরোজিও মা আর বোন এমিলিয়ার সঙ্গে ছাত্রদের পরিচয় করিয়ে দেন। ডিরোজিওর মা বা এমিলিযা ওদের কিছু খেতে দেন। ছাত্ররা হাসি মুখে সেসব খায়। তারপর চা আসে সবার জন্য।

ছাত্রদের বাড়িতে তো চা নিষিদ্ধ পানীয় কিন্তু ডিরোজিওর বাড়িতে চা খেতে ছাত্রদের বেশ ভালই লাগে।

সেদিন রামতনুও বন্ধুদের সঙ্গে ডিরোজিওর বাসভবনে গিয়েছে। এমিলিয়া সকলের জন্যই চা আনেন কিন্তু বিধর্মী ফিরিঙ্গীর বাড়িতে রামতনু তো কোন খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করতে পারে না। বন্ধুরা ওকে পীড়াপীড়ি করে কিন্তু রামতনু কিছুতেই রাজি হয় না।

রামতনু বুঝলেন, তার বন্ধুরা এখানে এসে বিনা প্রতিবাদে নিষিদ্ধ খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করে।

দক্ষিণারঞ্জন ছিলেন এইসব নিষিদ্ধ খাদ্য-পানীয় গ্রহণের ব্যাপারে সব চাইতে

উৎসাহী। অনেক ইংরেজদেব বাড়িতেই তার যাতায়াত ছিল।

সেদিন রামমোহনের বন্ধু অ্যাডাম সাহেবের উদ্যোগে রেভারেন্ড হাউ সাহেবের হাওড়ার বাড়িতে একদল ছাত্র আমন্ত্রিত হয়েছে।

মিস হাউ প্রত্যেক আমন্ত্রিত ছাত্রের হাতে এক গেলাস শেরি দিচ্ছেন। দক্ষিণারঞ্জনের পরামর্শমতো উনি রামতনুকেও এক গেলাস শেরি দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণারঞ্জন ওর কানে কানে বলে—'ইংরেজদেব বাড়িতে আমন্ত্রিত হবার পর মহিলারা কিছু খেতে বা পান করতে দিলে, তা খেতে হয়; না খেলে ঐ মহিলাকে অপমান কবা হয়। তুমি যদি শেরি পান করতে না চাও, তাহলে অন্তত ওষ্ঠে স্পর্শ করো।'

রামতনু নিরুপায় হয়ে তাই করলেন।

ব্যাপটিস্ট মিশনের উইলিযাম অ্যাডাম রামমোহনের দ্বাবা প্রভাবিত হয়ে ত্রীশ্বরবাদ ত্যাগ করে একেশ্ববাদ গ্রহণ করেন ও তাঁর বিশেষ ঘনিষ্ঠ অনুগামী হন। রামমোহন নানা বিষয় আলাপ-আলোচনার জন্য মাঝে মাঝে অ্যাডামকে নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানান। পাশ্চাত্য প্রথায় নৈশভোজের আগে রামমোহন একটু সুরাপান করতেন ও তাঁর অতিথিদেরও সুবাপানে আপ্যায়িত করতেন। এই খবব ছড়িয়ে পড়তেই গোঁড়া হিন্দুরা আরো বেশি উল্লসিত হয়ে রামমোহনের নিন্দায় মেতে ওঠেন।

ডিরোজিও ছাত্রদের নিয়ে যে আকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন সেখানেও এই সুরাপানের বিষয় আলোচিত হয়। ছাত্র বক্তাদেব কথা শুনে ডিরোজিও বলেন, এক দল অশিক্ষিত মূর্খ টিকিনাড়া বামুন সমগ্র হিন্দু সমাজকে পঙ্গু কবে রেখেছে। ওরা জানে না অতীতে মুনি-ঋষি থেকে শুরু করে সব হিন্দুই গোমাংস ভক্ষণ ও সুরাপান করতেন এবং সেই সময়ই ছিল হিন্দুদের পরম গৌরবময় যুগ।

শুনে ছাত্ররা চমকে ওঠে।

ডিরোজিও তাঁর প্রাণ প্রিয় ছাত্র-শিষ্যদের বলেন, যে সমাজে প্রতি পদে পদে বাধা, প্রতি মুহূর্তে মূর্খ বামুনরা হুঁশিয়ারী দিচ্ছে এটা খাবে না, ওটা খাবে না, একে স্পর্শ করবে না, ওকে স্পর্শ করবে না, এদের সঙ্গে মিশবে না, ওদেব সঙ্গে মিশবে না, দেশের মধ্যে বন্দী থাকো, কখনই সমুদ্র পাড়ি দেবে না। এসব বিধিনিষেধ না মানলেই তোমার জাত যাবে, ধর্মচ্যুত হবে।

ডিরোজিও মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, হাতে-পায় এতগুলো শিকল বাঁধা থাকলে সমাজ এগুবে কী করে? কী করে মানুষ আগামী দিনের উপযুক্ত হবে? কী করে

মানুষ নতুন চিন্তা করবে?

আকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের সভায় ডিরোজিও সভাপতিত্ব করলেও স
বক্তাই ছাত্র। তাদের বক্তৃতায় তখন আগুন ঝরছে ; তাদের কণ্ঠে শুধু এক
ধ্বনি—ভেঙে চুরমার করে দাও সব বন্ধন, ঝাঁটা মেরে বিদায় করো সব কুসংস্কার

কারা এইসব ছাত্র?

উমাচরণ বসু, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘো
রাধানাথ সিকদার, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামতনু লাহিড়ী ও হি
কলেজের আরো অনেক কৃতী ছাত্র।

এই অ্যাসোসিয়েশনের সভার খ্যাতি এমনই ছড়িয়ে পড়ে যে মাঝে মা
ডেভিড হেয়ার, বিশপ কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর মিলস, লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কে
প্রাইভেট সেক্রেটারী কর্নেল বেনসন ও আরো অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি ছাত্রদের বক্তৃ
শুনতে হাজির হতেন।

সেদিন অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের সভায় ডিরোজিওকে অত্যন্ত বিম
দেখায়, তাঁর প্রিয় ছাত্রদের হৃদয় উদ্বেল হয়ে ওঠে।

স্যার, আপনার কি শরীর খারাপ?

মুখে না, শুধু মাথা নেড়ে ডিরোজিও বলেন, না।

স্যার, আপনার মা বা ভগ্নী ভাল আছেন তো?

এবারও ডিরোজিও মাথা নেড়ে বলেন, হ্যাঁ, ভাল আছেন।

স্যার, কলেজে কি কেউ কিছু বলেছেন যার জন্য আপনার মন খারাপ?

ডিরোজিও খুব জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, আমি অন্য কারণে বিষণ্ণ

স্যার, আমাদের বলুন, কি কারণে আপনার মন বিষণ্ণ।

হ্যাঁ, বলছি।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর ডিরোজিও খুব গম্ভীর হয়ে বলেন, যে হিন্দু সমা
যুগ যুগ ধরে জমাট বাঁধা অন্ধকারে ডুবে ছিল, যে সমাজে কুসংস্কারের জন্য ল
লক্ষ হিন্দু নারীকে স্বামীর চিতায় জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে, সেই সমাজে
অচলায়তন ভাঙতে এগিয়ে এলেন রাজা রামমোহন রায়।

ছাত্ররা চুপ।

ডিরোজিও বলে যান, এই মহাপুরুষ সমগ্র হিন্দু সমাজের বিরোধিতা ও শত্রুত
অগ্রাহ্য করে দীর্ঘ দিন সংগ্রাম করেছেন বলেই বেন্টিঙ্ক সাহেব সতীদাহ বন্ধ করতে
বাধ্য হলেন।

উনি একটু ম্লান হেসে বলেন, এই মহাপুরুষের মহাসংগ্রামে মাত্র কয়েকজ

বিশিষ্ট বাঙালিই তাঁকে সমর্থন করেছেন এবং এদেব মধ্যে যিনি সব চাইতে বেশি রামমোহনকে সমর্থন ও সাহায্য করেছেন তিনি দ্বারকানাথ টেগোর। দ্বারকানাথ ইজ অলসো আ গ্রেট ম্যান অ্যান্ড আ গ্রেট সোল!

ছাত্ররা একটি শব্দ উচ্চারণ করে না। নীরবে ওঁর কথা শোনে।

আজ হয়তো অনেকেই বুঝতে পারছে না, রামমোহন এই সমাজের কুসংস্কার ও কুশিক্ষা দূর করার জন্য কি অকল্পনীয় অভাবনীয় কাজ করলেন আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি, ভবিষ্যতে এই মহাপ্রাণ মহামানুষকে দেশবাসী পূজা করবে যুগপ্রবর্তক বলে।

ডিরোজিও আবার একটু থামেন। একবার বুকভরে নিঃশ্বাস নিয়ে বলেন, তোমরা বোধহয় শুনেছ, রাজা রামমোহন রায় হাজার রকম দেব-দেবীর পূজার পরিবর্তে হিন্দুদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বেদ ও উপনিষদ শিক্ষা ও স্বয়ং ব্রহ্মার উপাসনার জন্য ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

কয়েকজন ছাত্র বলল, হ্যাঁ, স্যার, শুনেছি।

আমি গতকালই শুনলাম, রাজা যখন উপাসনা করে গাড়িতে বাড়ি রওনা হতেন, তখন তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে গোঁড়া হিন্দুরা ইঁট-পাথর ছুঁড়তো। সত্যি বড় বেদনার কথা, লজ্জার কথা।

ডিবোজিও একটু হেসে বলেন, সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হলো ভগবান যীশুর কথা। নতুন ধর্ম প্রচার করার জন্য শত্রু ও নিন্দুকরা যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করে মারে। সুতরাং রাজা রামমোহনের মত মহামানবকে যে তাঁর শত্রুরা ইট-পাথর ছুড়ে মারবে, তাতে তো অবাক হবার কিছু নেই।

ডিরোজিও গর্জে উঠে বলেন, এই পৃথিবীতে যখনই যে মহাপুরুষ মানুষের কল্যাণে, সমাজের কল্যাণে নতুন বাণী, নতুন মতবাদ প্রচার করেছেন, তখনই তাঁদের এই ধরনের বীভৎস শত্রুতার মুখোমুখি হতে হয়েছে।

ডিরোজিওর ছাত্ররা চুপ করে বসে থাকে না। তারা হাসি মুখে, স্বেচ্ছায়, সর্বজন সমক্ষে পুরনো বিধি-নিষেধ আর কুসংস্কার ভাঙতে শুরু করে।

ছাত্রবা শুরু করে মদ্যপান, বিদ্রোহ করে হিন্দু ধর্মের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে, অনেকে প্রকাশ্যে গোমাংস পর্যন্ত খেতে শুরু করে।

রামমোহনের বিশিষ্ট শিষ্য নন্দকিশোর বসু। সেদিন উনি হেদুয়াব পাশ দিয়ে হেঁটে যাবার সময় হিন্দু কলেজ কমিটির এক সদস্যেব সঙ্গে দেখা।

কুশলবার্তা বিনিময়ের পর নন্দকিশোর বলেন, আমার পুত্র রাজনারায়
আপনাদের কলেজে পড়ে। তাকে চেনেন কি?

বিলক্ষণ চিনি।

উনি না থেমেই বলেন, রাজনারায়ণ অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র এবং ভবিষ্যতে বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল করবে বলে কলেজের অনেকেই মনে করেন।

নন্দকিশোর একটু হেসে বলেন দয়া করে শ্রীমানের প্রতি একটু খেয়াল রাখবে

এবার ঐ সদস্য একটু অর্থপূর্ণ হাসি হেসে বলেন, আমি বা কলেজ কমিটির অ
সদস্যদের ছাত্রদের প্রতি খেয়াল রাখার দিন বোধহয় শেষ হয়ে এলো।

তার মানে?

কলেজের ছাত্ররা এখন ডিরোজিওকে দেবজ্ঞানে শ্রদ্ধা করে। শুধু ওর কথায়
ছাত্ররা ওঠা-বসা করে।

শুনেছি, ডিরোজিও শুধু অত্যন্ত পণ্ডিত না, খুব ভাল শিক্ষকও।

ঐ সদস্য আবার একটু হেসে বলেন, হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন। তবে ডিরোজি
ছাত্রদের শুধু সাহিত্য ও ইতিহাসেরই শিক্ষক না।

উনি আর কিসের শিক্ষক?

আপনি জানেন না, উনি ছাত্রদের মদ্যপান করতেও শিক্ষা দেন।

নন্দকিশোর সঙ্গে সঙ্গে কোন কথা না বললেও ঐ সদস্য মৃদু হেসে বলেন, শ্রী
রাজনারায়ণও যে মদ্যপান করে, তা আপনি জানেন না?

আজ্ঞে আমি তা জানি না, তবে আমি ওকে আজই জিজ্ঞাসা করব।

বাড়ি ফিরে এসেই নন্দকিশোর পুত্রকে তাঁর ঘরে ডেকে পাঠান।

রাজনারায়ণ এসেই বলে, বাবা, আপনি আমাকে ডেকেছেন?

হ্যাঁ।

কিছু বলবেন?

হ্যাঁ, বলব।

নন্দকিশোর পুত্রের মুখের দিকে চেয়ে বলেন, তুমি কি মদ খাও?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

নন্দকিশোর সঙ্গে সঙ্গে আলমারী থেকে একটা মদের বোতল আর দুটি গেল
বের করেন। দু'টি গেলাসে মদ ঢালার পর একটি গেলাস রাজনারায়ণের হাতে দি
বলেন, খাও।

নন্দকিশোর নিজেও অন্য গেলাসে চুমুক দেন।

পিতার দেখাদেখি রাজনারায়ণও তার গেলাসে চুমুক দেয়।

এবার নন্দকিশোর বলেন, শোনো রাজনারায়ণ, এবার থেকে শুধু আমার সঙ্গে আমার ঘরে বসেই মদ খাবে। অন্য কোথাও অন্য কারোর সঙ্গে মদ খাবে না।

বৃন্দাবন ঘোষাল একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ। প্রতিদিন প্রত্যুষে গঙ্গাস্নান করে কোশাকুশি হাতে নিয়ে শহরের ধনীদের বাড়িতে বাড়িতে যেতেন কিছু প্রাপ্তির আশায়। ঘোষাল মশাই শহরের নানা খবরও ধনীদের জানাতেন।

কিছুদিন ধরে ইনি ধনীদের বলছেন, হিন্দু কলেজের শিক্ষক ম্লেচ্ছ ফিরিঙ্গী ডিরোজীও ছাত্রদের বুঝিয়েছেন, ঈশ্বর বলে কিছু নেই, পিতামাতাকে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য নয়, ভাই-বোনের বিয়েতে কোন দোষ নেই, গোমাংস ভক্ষণ বা মদ্য পান করা কখনই অন্যায় হতে পারে না।

দিনের পর দিন ঘোষাল মশায়ের এই প্রচারের প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে বিশেষ দেরি হলো না। হিন্দু কলেজ কমিটির কিছু সদস্য ডিরোজিওর নিন্দায় মুখর হয়ে উঠলেন।

হেয়ার সাহেব একটু হেসে ওদের বলেন, ডিরোজিও অত্যন্ত ভাল শিক্ষক। ওঁর জন্য ছাত্ররা দিন দিন উন্নতি করছে ও সব চাইতে বড় কথা ছাত্ররা স্বাধীনভাবে নানা বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে শিখছে।

হেয়ার সাহেব একা কি করবেন? কলেজ কমিটির কিছু গোঁড়া হিন্দু সদস্যদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আদেশ জারি হলো ডিরোজিও ছাত্রদের ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়ে কোন আলোচনা করতে পারবেন না। আর ছাত্ররা স্কুলঘরে কিছু খাবার খেতে পারবে না।

এইসব সমালোচনা ডিরোজিওকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারে না। উনি যথারীতি ছাত্রদের বলেন, ভুলে যেও না ফরাসী দেশে বিপ্লব হয়েছে। মানুষের মুক্ত চিন্তার প্লাবন এসেছে সমগ্র ফরাসী দেশে। সুতরাং তোমরাও ওঠো, জাগো ; ভেঙে ফেলো গোঁড়ামির অচলায়তন, ছিঁড়ে ফেলো বিধি-নিষেধের শৃঙ্খল। দূর করো অজ্ঞানতা কুসংস্কারের অন্ধকার।

হিন্দু কলেজে মাত্র তিন বছর শিক্ষকতা করেই ডিরোজিওকে চাকরি ছাড়তে হলো কেশব সেনের ঠাকুর্দা রামকমল সেনের মতো গোঁড়া হিন্দু সমালোচকদের

চাপে কিন্তু, তিনি ছাত্র ও ভক্তদের মনে যে আগুন জ্বালিয়েছেন, তা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো সমাজের দিকে দিকে।

একদিকে রামমোহনের চিন্তাধারার মহাপ্লাবন, অন্য দিকে ডিরোজিওর ছাত্র-ভক্তদের ইয়ং বেঙ্গলের বিদ্রোহ তোলপাড় করে তোলে সমগ্র সমাজকে।

রামতনু তখন প্রথম শ্রেণীতে পড়েন। অত্যন্ত মেধাবী ও কৃতী ছাত্র। হেয়ার সাহেব বুঝলেন রামতনুর বৃত্তি লাভ করা উচিত। তাইতো উনি ওকে পাঠিয়ে দিলেন কমিটি অব পাবলিক ইন্সট্রাকশনের সেক্রেটারী ডার উইলসনের কাছে। ডার উইলসন তাঁর সংস্কৃত শাস্ত্রে পণ্ডিত বন্ধু প্রিন্সেপকে বললেন, রামতনুর পরীক্ষা নিতে।

প্রিন্সেপ সাহেব রামতনুকে নানা পরীক্ষা করে অত্যন্ত খুশি হলেন ও রামতনু ২৬ টাকা বৃত্তি পেলেন।

বৃত্তির টাকা পেয়েই রামতনু তার দুই ছোট ভাই রাধাবিলাস ও কালীচরণকে কৃষ্ণনগর থেকে কলকাতায় আনলেন লেখাপড়া শেখাবার জন্য। মাসে মাসে ২৬ টাকা বৃত্তি পেলেও বাসা ভাড়া করে তিনজনের খাওয়া-পরা ও লেখাপড়ার খরচ চালানো সত্যি দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। একবার তো ভাইদের অনাহারের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেবার জন্য রামতনু বাধ্য হয়ে বন্ধুবর কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে সাত-আট টাকা ধার করতে বাধ্য হন।

সে যাইহোক, খরচ কমাবার জন্য রামতনু তখন ছোট দুই ভাইকে নিয়ে দুর্গন্ধময় পরিবেশের এক বস্তিতে থাকেন। এখানে আসার কিছুদিন পরই হঠাৎ রামতনু ওলাওঠা রোগে আক্রান্ত হন।

হেয়ার সাহেবের কানে খবর পৌঁছতেই তিনি যথারীতি ওযুধ-পথ্য নিয়ে ছুটে এলেন। শুরু করলেন রামতনুর চিকিৎসা ও সেবাযত্ন।

দু'টি দিন কোথা দিয়ে কিভাবে যে কেটে গেল, তা শুধু হেয়ার সাহেব আর রামতনুর দুটি ছোট ভাই জানলো। রামতনু সুস্থ হবার পরই হেয়ার সাহেব বিদায় নিলেন।

শুধু বামতনু না, অন্য যে কোন ছাত্র অসুস্থ হলেই হেয়ার সাহেব ছুটে যেতেন তার চিকিৎসা ও সেবাযত্নের জন্য। আর ওঁর পাল্কিতে তো সব সময়ই ওষুধ-পথ্য আর কিছু খাবার-দাবার থাকতো ছাত্রদের জন্য।

হেয়ার সাহেব ছাত্রদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছিলেন। হঠাৎ এক বিধবা তার পুত্রকে নিয়ে হাজির।

ঐ বিধবা কোন ভূমিকা না করেই হেয়ার সাহেবের দুটি পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলেন, সাহেব, আমি দীন দরিদ্র। আমাদের দু'বেলা আহার জোটে না। তুমি দয়া করে আমার ছেলেকে তোমার ইস্কুলে ভর্তি করে নাও।

হেয়ার সাহেব বিধবাকে ঐভাবে কান্নাকাটি করতে দেখে অত্যন্ত বিচলিত হন কিন্তু বাধ্য হয়েই বলেন, মা, এখন তো ইস্কুলে জায়গা নেই। আপনি পরে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

ঐ বিধবা কাঁদতে কাঁদতেই ছেলের হাত ধরে বিদায় নেন।

স্কুলের বেয়ারা কাশী ছিল হেয়ার সাহেবের বিশেষ বিশ্বস্ত। ওকে সামনে দেখেই হেয়ার সাহেব বললেন, কাশী। তুই ঐ বিধবার পিছন পিছন গিয়ে দেখে আয় তো সত্যি উনি অভাবগ্রস্ত কিনা। আর হ্যাঁ, ভাল করে ওঁর বাড়িটা চিনে আসবি।

কিছুক্ষণ পরে কাশী ফিরে এসে বলে, হ্যাঁ, সাহেব সত্যি ঐ বিধবা খুবই গরিব, খুবই দুঃখী। পাড়ার লোকজন বলল, ওরা রোজ খেতেও পায় না।

হেয়ার সাহেব কালবিলম্ব না করে তখনই কাশীকে নিয়ে ঐ বিধবার সীতারাম ঘোষ লেনের বাড়িতে হাজির। বিধবা হেয়ার সাহেবকে দেখে অবাক।

হেয়ার সাহেব ওনার হাতে চারটি টাকা দিয়ে বললেন, মা, আপনাকে আমি মাসে মাসে চারটি টাকা দেব। আশা করি ঐ টাকায় আপনাদের দুইজনেব খাওয়ার খরচ চলবে।

হেয়ার সাহেব না থেমেই বলেন, মা, আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, আমি আপনার ছেলেকে ইস্কুলে ভর্তি করে নেবো।

বিধবা আনন্দে খুশিতে চোখের জল ফেলতে ফেলতে বলেন, সাহেব, তুমি মানুষ না, তুমি দেবতা।

শুধু এই বিধবা না, কলকাতা শহরের আরো কত দরিদ্রকে হেয়াব সাহেব এইভাবেই সাহায্য করতেন! শুধু শুধু ছাত্ররা কি ওঁকে দেবতাব মত ভক্তি করতো?

রামমোহনকে দেওয়া প্রতিশ্রুতিমত দ্বারকানাথ ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের মাসোহারা নিজের পকেট থেকেই দিচ্ছেন। উপরন্তু বাৎসরিক ব্রাহ্মণ বিদায়ের পুরো খরচাটাও তিনি স্বেচ্ছায় বহন করছেন।

দ্বারকানাথ সত্যি একজন বিচিত্র মানুষ ছিলেন। কোন তুচ্ছ দৈন্য ক্ষুদ্রতাকে তিনি পছন্দ করতেন না। প্রথম জীবনে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যথেষ্ট অর্থ উপার্জনেব পরই

তিনি বিলাস-ব্যসনে মেতে ওঠেন। তারপর তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্যের যত প্রসার ও শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে, বিলাস-ব্যসন আনন্দ উপভোগের মাত্রাও ততই বেড়েছে।

দ্বারকানাথ তাঁর বেলগাছিয়া ভিলাকে স্বপ্নরাজ্যে পরিণত করেন। শোনা যায়, ফরাসী সম্রাটের ভার্সাই প্রাসাদের মতই ছিল এই বেলগাছিয়ার ভিলা। সেখানে কত বিশ্ববিখ্যাত শিল্পীর সৃষ্ট তৈলচিত্র ও বহুমূল্য শিল্পসামগ্রী। চারিদিকে বিশাল বাগান। বাগানে কত বিচিত্র ধরনের ফোয়ারা। তাছাড়া ঐ বাগানের মধ্যেই বড় বড় পুকুরে নৌকাবিহারের অপূর্ব ব্যবস্থা।

উনি বেলগাছিয়া ভিলায় প্রায়ই পার্টি দিতেন। আমন্ত্রিত হতেন গণ্যমান্য সাহেব-মেমসাহেব, কলকাতা শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ছাড়াও কত পরিচিত সাধারণ মানুষ। হ্যাঁ, মদের বন্যাও বইতো ঐসব পার্টিতে। তাছাড়া কত রকমের পরম উপাদেয় খাবার-দাবার।

এইসব পার্টি নিয়ে তখন সারা শহরে কত গল্প, কত গুজব, কত সমালোচনা। দুর্নাম রটলো, দ্বারকানাথ কলকাতায় মদের স্রোত বইয়ে দিচ্ছেন। বাগবাজারের রূপচাঁদ পক্ষী ছড়া কেটে বলতো—

'বেলগাছিয়ার বাগানে হয়
ছুরি কাঁটার ঝনঝনি,
খানা খাওয়ার কত মজা,
আমরা তার কি জানি?
মদের কত গুণাগুণ
আমরা তার কি জানি?
জানেন ঠাকুর কোম্পানি।'

তখন বিলেত থেকে নানা কোম্পানির জাহাজে মদ আমদানি হতো। দ্বারকানাথের নিজস্ব জাহাজ কোম্পানি কার-টেগোর কোম্পানির জাহাজেও মদ আসতো। ইচ্ছা করলে উনি অনেক কম দামে সে মদ কিনতে পারতেন কিন্তু না, তা তিনি করতেন না।

তখন কলকাতা শহরে মদের ব্যবসা ছিল সাহেবদের একচেটিয়া। তাদের এই একচেটিয়া ব্যবসা ভাঙার জন্য দ্বারকানাথ এক অনুগত বাঙালি ব্যবসায়ীকে দিয়ে ধর্মতলা স্ট্রিটে মদের দোকান খুললেন এই উদ্দেশ্যে যে মদের ব্যবসা করেও বাঙালিরা লাভবান হোক। দ্বারকানাথ ঐ বাঙালি দোকান থেকেই খুচরো দামে প্রচুর

মদ কিনতেন।

দ্বারকানাথ নিজে বিশেষ মদ্যপান করতেন না। রামমোহনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হবার পর দ্বারকানাথ নৈশভোজের আগে এক গেলাস শেরি পান করতেন।

কলকাতায় মদের বন্যা বইয়ে দেবার জন্য দ্বারকানাথের বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনে স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বলেছিলেন—"আমি তাঁকে বিলক্ষণ জানি—এসব কথা নিন্দুকের কথা। প্রকৃত কথা এই যে তিনি দেখালেন যে দেশে মদের আমদানি তো বেড়েই চলল, তবে তার লভ্যাংশ য়ুরোপীয়রা সবটুকু উপভোগ না করে আমাদের দেশের লোক যতটুকু উপভোগ করতে পারেন, তাতেই দেশের লাভ। এইজন্য তিনি তাঁর অনুগত বিশ্বনাথ লাহাকে খুচরো মদ বিক্রয়ের জন্য প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিলেন।"

মজার কথা সে সময় গোটা হিন্দু সমাজের ধনীরা বহু অর্থ ব্যয় করে বাড়িতে দুর্গাপূজা করতেন এবং আমন্ত্রিত সাহেব মেমদের মদ্য মাংসে আপ্যায়ন করতেন। অতিথিদের খুশি করার জন্য বাঈজীর নাচ-গানও হতো ঐ দুর্গাপূজার আসরে, কিন্তু কেউ তাদের নিয়ে ছড়াও কাটেনি, নিন্দাও করেনি।

সে যাইহোক, দ্বারকানাথ বেলগাছিয়া ভিলার পার্টির জন্য যেমন দু'হাতে অর্থ ব্যয় করতেন, ঠিক সেইরকমই অর্থ দান করতেন দেশের দশের কল্যাণে।

অ্যাডাম সাহেব খ্রীস্টধর্মের ত্রীশ্বরবাদ ত্যাগ করে রামমোহনের প্রভাবে একেশ্বরবাদী হবার পর দু'জনে মিলে একটা সংস্থা গড়ে তোলেন এবং দ্বারকানাথ সেজন্য এককালীন চাঁদা দেন আড়াই হাজার টাকা। এছাড়া ব্রাহ্ম সমাজের চরম দুর্দিনে দ্বারকানাথের অর্থসাহায্যেই তা টিকে যায়। দ্বারকানাথ সাহায্য না করলে শৈশবেই ব্রাহ্ম সমাজের মৃত্যু হতো, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

কোন কাজে দ্বারকানাথ অর্থসাহায্য করেন নি?

কী? খবরের কাগজ বের করতে হবে? ঠিক আছে, আমি টাকা দেব।

প্রকাশিত হল 'বেঙ্গল হরকরা'।

বাল্য চিকিৎসক ও বন্ধুবর ডাঃ মন্টগোমেরি মার্টিন স্বাধীন মতবাদ প্রকাশের জন্য সাংবাদিক হতে চান?

দ্বারকানাথ বললেন, আপনার মত ভারত হিতৈষী সাংবাদিক হলে তো দেশের মানুষের দুঃখ-কষ্টের কথা কাগজে ছাপা হবে এবং কোম্পানির দৃষ্টিগোচরে আসবে।

শুরু হলো বেঙ্গল হেরল্ড।

কার টাকায় শুরু হলো বেঙ্গল হেরল্ড?

প্রসন্নকুমার ঠাকুর, ডাঃ মার্টিন ও আরো দু'জন ছাড়া দ্বারকানাথ। এবং অন্য অংশীদারদের চাইতে দ্বারকানাথই সব চাইতে বেশি অর্থ বিনিয়োগ করলেন।

এই ডাঃ মার্টিনই এক প্রকাশ্য সভায় বহু ইংরেজ শ্রোতার সামনেই বললেন—'আমাদের সরকার তো নামে মাত্র খ্রীস্টান, কার্যত এ-সরকার মুসলমান সরকারের চেয়ে নিকৃষ্ট।...আমরা লক্ষ লক্ষ টাকা ভারত থেকে শোষণ করি, বিনিময়ে আমরা কি দিই তাদের? দুর্ভিক্ষ আর মহামারী! মহামারী আর দুর্ভিক্ষ! হাজার হাজার গলিত পচিত শব ভেসে যায় নদীতে। দুষিত বাষ্পে বাতাস বিষাক্ত, জল পান করলে বমি হয়। চল্লিশ হাজার বর্গমাইল পরিমাণ অঞ্চলে সব লোকজন উজাড়।'

হ্যাঁ, এইরকম বলিষ্ঠ সাংবাদিকেরই প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন দ্বারকানাথ।

কী সাহেবদের 'জন বুল' পত্রিকা নিয়মিতভাবে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে লিখছে?

দ্বারকানাথ নিজের পকেট থেকে আঠারো হাজার টাকা দিলেন বন্ধুবর মিঃ স্টকলারকে 'জন বুলে'র ছাপাখানা কিনে নেবার জন্য। ঐ ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত হলো উদারনৈতিক দৈনিক ইংলিশম্যান।

বাংলাদেশের এক জেলা জজ বেশ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কলকাতার ডাক্তাররা পরামর্শ দিলেন, কয়েক মাস বিলেতের বাড়িতে গিয়ে থাকলেই সুস্থ হয়ে যাবেন কিন্তু জজ সাহেব যাবেন কি করে?

পাওনাদাররা জজ সাহেবকে বলল, যে এক লক্ষ টাকা আমরা পাবো, তা শোধ না করে বিলেত যাবার চেষ্টা করলেই আপনাকে কয়েদখানায় থাকতে হবে।

জজসাহেব মহাবিপদে পড়লেন। হঠাৎ তাঁর মনে হলো দ্বারকানাথের কথা। শুনেছি, উনি খুব উদার ব্যক্তি ও বিপদগ্রস্ত মানুষকে সাহায্য করতে দ্বিধা করেন না।

জজসাহেব তাঁর সমস্যার কথা জানিয়ে এক বিস্তৃত চিঠি লিখলেন দ্বারকানাথকে।

দ্বারকানাথ ঐ চিঠি পেয়েই খোঁজখবর নিয়ে দেখলেন, জজসাহেব ঠিকই লিখেছেন। উনি সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক পাওনাদারের পুরো প্রাপ্য মিটিয়ে দিয়ে জজ সাহেবের সই করা মুচলেকা আর দলিলপত্র নিয়ে নেন।

এবার দ্বারকানাথ নিজেই জজসাহেবের কাছে গিয়ে ঐসব মুচালেকা দেওয়া কাগজ আর দলিলপত্র ফিরিয়ে দিয়ে বলেন, আপনি বিলেত গিয়ে শরীর ঠিক করে আসুন।

জজসাহেব স্তম্ভিত। ধন্যবাদ জানাতে গিয়ে কেঁদে ফেলেন।

জজসাহেব ওনাকে মুচলেকা দিতে চাইলে দ্বারকানাথ একটু হেসে বলেন, বিলেতে গিয়ে আপনি মারা গেলে তো আপনার মুচলেকা দেওয়া কাগজের কোন মূল্য থাকবে না। আপনি সুস্থ হয়ে এ দেশে ফিরে এসে আমাকে টাকা ফেরত দেবেন।

জজসাহেব অবাক হয়ে ভাবেন, এমন মহৎ উদার মানুষ যে এ দেশে আছেন, তা তো স্বপ্নেও ভাবি নি।

যাইহোক জজসাহেব সুস্থ হয়ে এ দেশে ফিরে এসে দ্বারকানাথের টাকা শোধ করেন।

অক্টারলোনি নামে এক তরুণ ইংরেজ সেনাবাহিনীর অফিসার বিলেত থেকে ভারতে এসেছেন কোম্পানির সেনাবাহিনীতে চাকরি করতে। ভেবেছিলেন, এখানে এসে অনেক টাকা রোজগার করবেন এবং সেই টাকা জমিয়ে তার বাগদত্তা প্রেয়সীকে বিলেত থেকে কলকাতায় আনিয়ে বিয়ে করে আনন্দে দিন কাটাবেন। এখানে আসার পর আশানুরূপ আয় না হওয়ায় তরুণ অক্টারলোনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়লেন ও দুঃখ ভুলবার জন্য খুব বেশি মদ্যপান শুরু করলেন। অক্টারলোনি আগে বিশেষ মদ্যপান করতেন না ; তাইতো ওঁর বন্ধুবা অবাক হয়। বন্ধুদের পীড়াপীড়িতে অক্টারলোনি তাঁর মনবেদনার কারণ বলেন।

বন্ধুরা বলে, তোমাকে দুটোর মধ্যে একটা পথ বেছে নিতে হবে।

তোমরা কোন দুটো পথের কথা বলছো?

হয় তোমাকে কালীঘাটে গিয়ে কালীমাঈকে পুজো দিতে হবে ; তা না হলে তুমি ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের দ্বারকানাথ ঠাকুরের কাছে যাও। তোমার সমস্যা ঠিক মিটে যাবে।

দু'এক মিনিট চুপ করে থাকার পর অক্টারলোনি বলে দ্বারকানাথকে চিনব কী করে?

দেখবে চোগাচাপকান পরা একজন সুপুরুষ ব্যক্তি ডিরেক্টরের দপ্তরে বসে আছেন, তিনিই দ্বারকানাথ।

অক্টারলোনি পরদিনই ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে হাজির। উনি দেখলেন, চোগাচাপকান পরা এক ভদ্রলোক ডিরেক্টরের দপ্তরের একটা বেঞ্চিতে বসে দৈনিক হরকরা পড়ছেন।

দ্বারকানাথ তরুণ ইংরেজ সামরিক অফিসারকে সামনে দেখেই বলেন, আমি আপনার জন্য কি করতে পারি?

দুঃখে আবেগে অক্টারলোনি তার আসার কারণ জানায়।

সঙ্গে সঙ্গে দ্বারকানাথ হরকরার এক কোনা থেকে এক টুকরো সাদা কাগজ ছিঁড়ে লিখে দেন—**Pay Rs 10,000 DT.**

এই কাগজটা নিয়ে নীচে ক্যাশিয়ারের কাছে যাও।

ব্যস! এই কথা বলেই দ্বারকানাথ আবার হরকরা পড়ায় মন দেন।

অক্টারলোনি অবাক! একবার ভাবে মনে হয়, দ্বারকানাথ বোধহয় রসিকতা করছেন।

দ্বারকানাথ ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভাবলেন, বোধহয় ছেলেটি জানে না, কোথায় যেতে হবে। তাই উনি একটা বেয়ারাকে বললেন, এই ছেলেটিকে ক্যাশিয়ারের কাছে নিয়ে যাও।

হ্যাঁ, অক্টারলোনি বেয়ারার সঙ্গে ক্যাশিয়ারের কাছে গিয়ে ঐ কাগজের টুকরো দেয় কাগজের টুকরো দেখে ক্যাশিয়ার বলেন—কি নেবেন? টাকা না নোট?

হতভম্ব অক্টারলোনি বলে, নোট হলেই ভাল হয়।

হাতে এক তাড়া নোট পেয়েই অক্টারলোনি উত্তেজিত হয়ে ব্যাঙ্কের বাইরে পা বাড়াতেই থমকে দাঁড়ায় দ্বারকানাথকে ধন্যবাদ জানাবার জন্য উপরে যায়। ধন্যবাদ জানাবার পর মুচলেকা দিতে চায়।

দ্বারকানাথ একটু হেসে বলেন, দেখে মনে হচ্ছে তুমি ভদ্রবংশের ছেলে। তুমি যদি সত্যি ভদ্রবংশের ছেলে হও, তাহলে তুমি ঠিকই টাকা ফেরত দেবে। যাও ; বিয়ে করে সুখী হও।

অক্টারলোনি কিছুকালের মধ্যেই শুধু ঐ টাকা শোধ করেন নি, উনি যতদিন বেঁচেছিলেন, ততদিন ওর সমস্ত সঞ্চিত টাকা জমা ছিল ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে। উনি সব সময় বলতেন, দ্বারকানাথের মত উদার পরোপকারী মানুষ সত্যি দুর্লভ।

দ্বারকানাথ আহ্নিক ও পূজা শেষ করে উঠতেই একজন কর্মচারী বললেন একজন বিধবা অনেকক্ষণ ধরে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

আমাকে আগে খবর দাওনি কেন?

খবর দিতে এসে দেখি আপনি পূজার আসনে বসেছেন।

উনি কোথায়?

সামনের দরজার পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন।

ওঁকে ডাক দাও।

ঐ বিধবা পাঁচ-ছ বছরের একটি মেয়ের হাত ধরে সামনে এসে দাঁড়াতেই দ্বারকানাথ বলেন, মা, আপনি আমাকে কিছু বলবেন?

বিধবা এক মাথা ঘোমটার আড়াল থেকে বলেন, বাবা আমি বড় দুঃখী, বড় গরিব। টাকার অভাবে দু'দুবার আমার বড় মেয়ের বিয়ে ভেঙে গেছে। আবার বিয়ের ঠিক হয়েছে।

ছেলেটি ভালো তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ, খুবই ভাল।

বিধবা একটু থেমে বলেন, বাবা, আপনি সাহায্য না করলে এবারও বিয়ে ভেঙে যাবে। আপনি দয়া করে..

আপনার বাড়িতে কে কে আছেন?

আমার ভাসুর নেই, দেওর নেই ; আমি আমার তিনটি মেয়েকে নিয়ে থাকি।

কার বাড়িতে থাকেন? কি করে আপনার সংসার চলে?

বাড়িটি খুব ছোট হলেও এটা আমার শ্বশুরের ভিটে। বাড়ির সামনে দুটো দোকান ঘর আছে। যা ভাড়া পাই, তা দিয়ে কোন মতে খাওয়া-দাওয়া হয় কিন্তু মেয়ের বিয়ে দেবার মত একটা টাকাও গচ্ছিত নেই।

দ্বারকানাথ কর্মচারীকে বললেন, দুর্গাচরণকে ডাক দাও।

দুর্গাচরণ আসতেই দ্বারকানাথ বলেন, এই ভদ্রমহিলার নাম-ঠিকানা জেনে নাও। কাল সকালে তুমি ওনার বাড়ি যাবে। কথাবার্তা বলে দেখবে, ওনার মেয়ের বিয়ের জন্য কি করণীয়। কতজন বরযাত্রী আসবেন, কতজন নিমন্ত্রিত হবেন, সেসবও জেনে নেবে। আমাকে কালকেই খবর জানাবে।

দুর্গাচরণ মাথা নেড়ে বলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, জানাবো।

দ্বারকানাথ বলেন, আমার গাড়িতে এঁদের দু'জনকে ওদের বাড়িতে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করো।

এবার উনি ঐ মহিলাকে বলেন, মা, আপনি বাড়ি যান। মেয়ের বিয়ের জন্য আপনাকে চিন্তা করতে হবে না।

ঐ ভদ্রমহিলাকে মেয়েকে নিয়ে গাড়ি থেকে নামতে দেখেই পাড়ার লোক অবাক।

ও বৌঠান, কোথায় গিয়েছিলেন? কার গাড়ি চড়ে এলেন?

গিয়েছিলাম, জোড়াসাঁকোর দ্বারকানাথ ঠাকুরের কাছে মেয়ের বিয়ের সাহায্যের জন্য। উনিই গাড়ি করে পাঠিয়ে দিলেন।

ভদ্রলোক মুখ বিকৃতি করে বলেন, ও বৌঠান! দ্বারকানাথ তো যেমন মাতাল তেমনি চরিত্রহীন।

ঠাকুরপো, তা তো আমি জানি না। শুনেছি, উনি গরীব-দুঃখীকে সাহায্য করেন, তাই...

এই সাত সকালে ঐ মাতালটার সঙ্গে দেখা হয় নি?

উনি না থেমেই বলেন, সারা রাত মদ খেলে কি কেউ সকালে উঠতে পারে?

কিন্তু আমি পৌঁছেই দেখি, উনি পূজায় বসেছেন। ঘণ্টাখানেক পর ওনার পূজা শেষ হতেই আমার কথা হলো।

হা ভগবান! মাতাল দ্বারকানাথ আবার পূজাও করে?

ঐ ভদ্রমহিলা ছোট মেয়ের হাত ধরে বাড়ির দিকে এগুতেই দু'তিনজন একসঙ্গে গলা চড়িয়ে বলেন, মাতালের কথায় বিশ্বাস করে মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে ঠিক বিপদে পড়বেন।

দুর্গাচরণের কাছে সব বৃত্তান্ত শুনেই দ্বারকানাথ বলেন, তুমি সবার আগে আমাদের স্যাকরা দত্তবাবুকে খবর দাও। সব গহনাই যেন মেয়েটির পছন্দ হয়। আর হ্যাঁ, শোনো, শুধু বরযাত্রী আর মেয়ের বাড়ির শতখানেক লোকের খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করলে হবে না।

তবে?

তুমি মেয়ের মাকে বলবে, পাড়ার সবাইকে নেমন্তন্ন করতে।

আজ্ঞে হ্যাঁ, বলব।

তবে জেনে নিও পাড়ার কতজন হবে।

আজ্ঞে হ্যাঁ, জেনে নেবো।

দুর্গাচরণ, তুমি দেখো, বিয়েটা যেন অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে হয়। কোন ত্রুটি না থাকে রান্নাবান্না যেন ভাল হয়। দই আর দু'তিন রকমের মিষ্টির ব্যবস্থাও করো। মোট কথা সবাই খেয়ে যেন খুশি হয়।

আজ্ঞে আপনি চিন্তা করবেন না। সব কিছুই আপনার নির্দেশমত হবে।

বিয়ের দু'দিন আগে দ্বারকানাথ দুর্গাচরণকে বলেন, বিয়ের সব উদ্যোগ-আয়োজন সম্পূর্ণ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

মোট কতজনের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করেছ?

ওরা বলেছেন, মোট শ'তিনেক লোক হবে ; আমি ব্যবস্থা করছি শ চারেক লোকের জন্য।

ঠিক করেছ।

দ্বারকানাথ মুহূর্তের জন্য থেমেই বলেন, ছেলে-মেয়ের কাপড়-চোপড় গহনা ও গাড়ি পৌঁছে গেছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ, চার-পাঁচ দিন আগেই পৌঁছে গেছে।

তোমাকে সাহায্য করার জন্য অন্য দু'চারজন কর্মচারীকে বলেছ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

দুর্গাচরণ না থেমেই বলে, জনা তিনেক চাকর ছাড়াও কাছারি থেকে দু'জন আমার সঙ্গে থাকবে।

ছোটাছুটি করার জন্য কোন গাড়ির ব্যবস্থা করেছ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, তাও করেছি।

আচ্ছা ভাল কথা, বিয়ের লগ্ন কখন?

আজ্ঞে লগ্ন সাড়ে ন'টা থেকে সাড়ে এগারটা।

ঠিক আছে।

পরের দিন কন্যা সম্প্রদান পর্ব শেষ হতে না হতেই বিয়ে বাড়িতে দ্বারকানাথ হাজির। না চোগাচাপকান পরে না ; পরনে নিছক বাঙালির পোশাক। কাঁধে কাশ্মিরী শাল। ওকে দেখেই বিয়েবাড়ির সবাই চমকে উঠলেন।

অভাগিনী বিধবা ছুটে এসে লুটিয়ে পড়লেন দ্বারকানাথের পায়ে। হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, বাবা, আপনি মানুষ না, সাক্ষাৎ দেবতা। আর লোকে বলে আপনি মাতাল চরিত্রহীন। আপনি আমার জন্মজন্মান্তরের দেবতা।

দ্বারকানাথ অত্যন্ত ধীর-স্থিরভাবে বলেন, মা, আপনি উঠুন। আজ আপনি চোখের জল ফেললে আপনার কন্যার অমঙ্গল হবে।

বিধবা আনন্দে চোখের জল ফেলতে ফেলতে বলেন, লোকে বলেছিল, মাতালের কথায় বিশ্বাস করে মেয়ের বিয়ে দিও না ; বিপদে পড়বে। আর আজ? বাবা আপনার কৃপায় আমার মেয়ের বিয়ের বিধিব্যবস্থা দেখে ওরা বোবা হয়ে গেছে। কারুর মুখে কোন কথা নেই।

যাইহোক, ঐ বিধবা শান্ত হবার পর দ্বারকানাথ বলেন, মা, সব উদ্যোগ-আয়োজন ঠিক ছিল তো?

বাবা, আপনি যে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন, সেখানে কি উদ্যোগ-আয়োজন ঠিক না

থেকে পারে। এমন এলাহি ব্যাপার যে হবে, তা তো কেউ ভাবতে পারে নি।

দুর্গাচরণ পাশেই দাঁড়িয়েছিল। তার দিকে তাকিয়ে দ্বারকানাথ বলেন, বরযাত্রী ও অতিথিদের ঠিক মত আপ্যায়ন করা হয়েছে তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

রান্নাবান্না খাবার-দাবার ঠিক ছিল?

আজ্ঞে সবাই খাবার-দাবারের প্রশংসা করেছেন।

কোন কিছু কম পড়েনি তো?

আজ্ঞে না।

আগামীকালের বিধিব্যবস্থা ঠিক রেখেছ তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

দুর্গাচরণ বরের পিতার সঙ্গে ওঁর পরিচয় করিয়ে দিতেই দ্বারকানাথ বলেন, আপনাদের আপ্যায়নে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়নি তো?

ত্রুটি-বিচ্যুতি তো দূরের কথা, আপনার কৃপায় আজ আমরাও ধন্য হলাম।

দ্বারকানাথ গম্ভীর হয়ে বলেন, আমি কৃপা করি না ; আমি কর্তব্য করি।

এবার ঐ বিধবা দ্বারকানাথকে বলেন, বাবা, আমার মেয়ে-জামাইকে আশীর্বাদ করবেন না?

হ্যাঁ, মা, চলুন।

দ্বারকানাথকে নিয়ে মেয়ে-জামাইয়ের সামনে গিয়ে ঐ বিধবা বলেন, তোমরা আমার দেবতাকে প্রণাম করো। বাবার আশীর্বাদের কৃপায় তোমরা সারাজীবন সুখে থাকবে।

নববিবাহিত দম্পতি ওনাকে প্রণাম করতেই দ্বারকানাথ ওদের মাথায় হাত দিয়ে বলেন, ঈশ্বরের কৃপায় তোমরা সুখে শান্তিতে থাকো।

তারপর দ্বারকানাথ মেয়ের গলায় একটা সোনার হার পরিয়ে দিলেন। লম্বায় সে হার মেয়েটির হাঁটু ছাড়িয়ে গেল।

ঐ হার দেখে লোকজনের চক্ষুস্থির।

এবার দ্বারকানাথ একটা বড় হীরা বসানো আংটি পরিয়ে দিলেন জামাইয়ের হাতে।

বিদায় নেবার আগে দ্বারকানাথ ঐ বিধবাকে বলেন, মা, আশা করি ঈশ্বরের কৃপায় আপনার মেয়ে-জামাই সুখে-শান্তিতে থাকবে। আর হ্যাঁ, আমি যদি জীবিত থাকি, তাহলে আপনার অন্য দুই কন্যার বিয়ের সময়েও আমি যথাসাধ্য করবো।

ঐ বিধবা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন দ্বারকানাথকে।

গাড়িতে ওঠার আগে দ্বারকানাথ দুর্গাচরণকে বলেন, বৌভাত-ফুলশয্যার ব্যাপারে যা যা করণীয়, তা হচ্ছে তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ, নিশ্চয়ই হবে।

আর হ্যাঁ, শোনো।

আজ্ঞে বলুন।

মেয়ে-জামাইয়ের কাপড়-চোপড় মিঠাই-মণ্ডা ফুল পাঠানো ছাড়াও এমন খাবার-দাবার আর মিষ্টি পাঠাবে যাতে দু আড়াই শ লোক ভালভাবে খেতে পারেন।

আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই হবে।

দ্বারকানাথ গাড়িতে উঠতেই পাড়ার লোকজন চিৎকার করে ওঠে—জয় দ্বারকানাথের জয়!

দ্বারকানাথ এইরকম শত সহস্র দরিদ্র ও দুঃখীকে সাহায্য করেছেন অকৃপণভাবে।

শুধু কি তাই?

দ্বারকানাথ আরো কত কি করেছেন।

কী? ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটি অন্ধদের সাহায্যের জন্য কিছু করতে চাইছে?

খুব ভাল কথা। এই নাও এক লাখ টাকা।

এর আগে বঙ্গদেশে কোন ধনী ব্যক্তি একসঙ্গে এক লাখ টাকা কোন ব্যাপারেই দান করেন নি। তাইতো দ্বারকানাথ অন্ধদের কল্যাণে লাখ টাকা দান করেছেন শুনেই সমাজের সবাই চমকে উঠলেন।

১৮৩৫।

কলকাতায় মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে প্রথম পদক্ষেপ হলো মতিলাল শীলের জমিতে 'ফিবার হাসপাতাল' প্রতিষ্ঠা।

হাসপাতালের জন্য টাকা?

হ্যাঁ, অনেকেই কিছু কিছু দান করলেন। মুক্ত হস্তে যিনি দান করলেন, তিনি দ্বারকানাথ।

মেডিক্যাল কলেজ খোলার জন্য এই অর্থ দান করেই উনি খুশি হলেন না।

১৮৪৫ সালে দ্বিতীয়বার বিলেত যাবার সময় দ্বারকানাথ নিজের খরচায়

কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের দুজন ছাত্রকে সঙ্গে নিয়ে যান উচ্চতর শিক্ষার জন্য এবং এরা ক'বছর পর সসম্মানে এম.ডি পাশ করেন। এঁরাই ভারতের প্রথম এম.ডি.।

কুষ্ঠরোগগ্রস্তদের দুঃখ-কষ্টের কথা শুনে দ্বারকানাথ বড়ই দুঃখিত হন।
কুষ্ঠ আশ্রমের জন্য এই নাও টাকা।

কলকাতায় জনসাধারণের জন্য কোনো পাঠাগার নেই? পাঠাগার না থাকলে সাধারণ মানুষ ও ছাত্ররা বই পড়বে কোথায়? কোথা থেকে বই ধার নেবে বাড়িতে বসে পড়ার জন্য?

১৮৩৬ সালে দ্বারকানাথ নিজের টাকায় প্রতিষ্ঠা করলেন কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরী। সেদিন কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি, দ্বারকানাথের এই কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরীই ভবিষ্যতে একদিন ভারতের জাতীয় পাঠাগার হবে।

কৃতজ্ঞ দেশবাসী দ্বারকানাথের এক আবক্ষ মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরীতে। সেই আবক্ষ মূর্তি এখন আলিপুরের জাতীয় পাঠাগারের (ন্যাশনাল লাইব্রেরী) প্রবেশপথে শোভা পাচ্ছে।

উত্তর ভারত ভ্রমণকালে কে পুণ্যতীর্থ কাশীর দরিদ্র হিন্দু বিধবা ও সহায় সম্বলহীন ব্রাহ্মণদের দু হাতে অর্থ দান করেন?

দ্বারকানাথ।

বৃন্দাবনের যমুনা নদীর কেশীঘাটে সাধু ও দরিদ্র তীর্থযাত্রীদের জন্য অন্নসত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য কে বিপুল অর্থের তহবিল গড়েন?

দ্বারকানাথ।

মাতৃশ্রাদ্ধের পর কে কলকাতার পঞ্চাশ-ষাট হাজার ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রকে ভুরিভোজে আপ্যায়িত করে তাঁদের প্রত্যেককে উপযুক্ত ভোজনদক্ষিণা দিয়েছিলেন?

দ্বারকানাথ।

এই দ্বারকানাথই তাঁর মায়ের জীবিতকালে মায়ের ইচ্ছানুসারে একবারের জন্যও

সাহেব-মেমসাহেবদের সঙ্গে একত্রে এক টেবিলে বসে খাওয়া-দাওয়া করেন নি। বেলগাছিয়া ভিলার পার্টি থেকে ফিরে এসে উনি বেশ পরিবর্তন ও স্নান করার পর মায়ের দেওয়া খাবারই খেতেন।

সত্যি, দ্বারকানাথ কোন্ সৎ কাজে অকাতরে অর্থ দান করেন নি?

রামমোহনের আত্মীয় সভা-ব্রাহ্ম সমাজ, ডেভিড হেয়ারের স্কুল বুক সোসাইটি, হিন্দু কলেজ থেকে শুরু করে অন্ধ আশ্রম, কুষ্ঠ আশ্রম, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ, ডাক্তারদের উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিলাত নিয়ে যাওয়া, কলকাতায় প্রথম পাঠাগার প্রতিষ্ঠা ছাড়াও আরো কত সৎ উদ্যোগে তিনি অকাতরে অর্থ দান করেছেন!

তাছাড়া কত অসংখ্য দরিদ্র, অসহায় ও বিপদগ্রস্ত মানুষকে যে সাহায্য করেছেন, তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

আবার এই দ্বারকানাথই প্রথম ভারতীয় যিনি জাহাজের কোম্পানির মালিক। তাঁর জাহাজ নিয়মিত কলকাতা-বিলেতের মধ্যে যাতায়াত করতো। এই দ্বারকানাথই খুলেছেন ব্যাঙ্ক, মালিক হয়েছেন রানীগঞ্জের কয়লাখনির। আবার ইনিই উদ্যোগ নিয়েছেন ভারত চীনের মধ্যে নিঃশুল্ক ব্যবসা-বাণিজ্যের, ভারত ও ইউরোপের মধ্যে ডাক ব্যবস্থা চালু করতে, ভারতে রেল লাইন প্রতিষ্ঠা করে যোগাযোগ ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করতে।

আরো আরো কত কি।

কার-টেগোর কোম্পানির জাহাজে যদি চীন থেকে রেশম আমদানি হতে পারে, তবে কাশীর অসামান্য শিল্পমাধুর্যপূর্ণ জরি-দার কিংখাব ও অন্যান্য বিলাসদ্রব্য পাশ্চাত্য দেশে রপ্তানি করা যাবে না কেন?

দ্বারকানাথ কাশীতে থাকার সময় ঐসব কিংখাব ও বিলাস দ্রব্যের দাম-দস্তুর ঠিক করে কলকাতায় তাঁর অফিসে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন পাশ্চাত্য দেশে রপ্তানি করার উদ্দেশ্যে।

প্রথমবার বিলাত গিয়ে দ্বারকানাথ এই কাশীর জরি-দার কিংখাব ও কাশ্মিরী শাল উপহার দেন মহারানী ভিক্টোরিয়াকে।

এই দ্বারকানাথই লন্ডনে আপ্যায়ন করেন চার্লস ডিকেন্স ও থ্যাকারের মত বরেণ্য সাহিত্যিকদের ; প্যারিসে দেখা করেন ঋগ্বেদ সংকলন ও সম্পাদনায় ব্যস্ত ও পরবর্তী

কালের অতি সুপরিচিত ভারতবিদ ম্যাক্সমুলারের সঙ্গে। দ্বারকানাথের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় মহারানী ভিক্টোরিয়া ও তার স্বামী প্রিন্স ফিলিপ-এর সঙ্গে ; স্বয়ং ফরাসী সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে হয় তাঁর হৃদ্যতা।

অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য অনেক দিন ধরেই দ্বারকানাথের শরীর বিশেষ ভাল যাচ্ছে না। ইংরেজ বন্ধুরা বললেন, কিছুদিনের জন্য বিলাত যান। ওখানে দু'এক মাস থাকলেই আপনার শরীর ভাল হবে। তবে দ্বারকানাথ অনেক দিন ধরেই বিলাত যাবার কথা চিন্তা করেছেন নানা কারণে। ওরা কি করে শিল্প-বাণিজ্য চালায় ও কি কি কারণে ইংরেজরা প্রতিনিয়ত এগিয়ে যাচ্ছে, তা দেখা ও জানার দরকার। ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের জন্য বিশিষ্ট ইংরেজদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করাও বিশেষ জরুরী। তাছাড়া ওদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, সমাজ ব্যবস্থা জানা দরকার। আরো অনেক কারণে বিলাত যাওয়া প্রয়োজন মনে হচ্ছে দ্বারকানাথের।

কিন্তু সমস্যা অনেক।

না, না, জাতিভ্রষ্ট সমাজভ্রষ্ট হবার ভয় নেই ওঁর। তবে তাঁর অনুপস্থিতিতে ব্যবসা বাণিজ্যের কি হবে কিছু বলা যায় না। অন্য অংশীদাররা ইচ্ছা করলেই কোম্পানিগুলির টাকা তছনছ করে ওঁকে বিপদে ফেলতে পারে। তাছাড়া অপ্রত্যাশিত কোন সংকট দেখা দিলেও ব্যাঙ্ক ও কোম্পানিগুলি ফেল পড়তে পারে।

এক দিকে এই দুশ্চিন্তা, অন্য দিকে পুত্র দেবেন্দ্রনাথকে নিয়ে অন্য দুশ্চিন্তা। যে বয়সে দ্বারকানাথ নিজেকে শিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন সেই বয়সে দেবেন্দ্রনাথ উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করেছেন। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ও কার টেগোর কোম্পানিতে ঢুকিয়েও দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে ব্যবসায়িক বুদ্ধি বা দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় না পেয়ে দ্বারকানাথ সত্যি হতাশ।

যাই হোক, বিলেত যাবার চিন্তা মাথায় আসতেই দ্বারকানাথ মনে মনে ঠিক করলেন, পৈতৃক দুটি ও তাঁর নিজের কেনা দুটি জমিদারীকে রক্ষা করতেই হবে ভবিষ্যত বংশধরদের স্বার্থে। হ্যাঁ, সেই উদ্দেশ্যেই তিনি এক ট্রাস্ট সম্পাদন করলেন।

এদিকে দ্বারকানাথের বিলাত যাবার সিদ্ধান্ত জানাজানি হতেই আত্মীয়-স্বজন ও গোঁড়া হিন্দু সমাজে ঝড় উঠলো। সবাই বললেন, খবরদার কালাপানি পার হবে না। তুমি জাতিভ্রষ্ট ধর্মভ্রষ্ট ও সমাজভ্রষ্ট হবে।

দ্বারকানাথ হাসতে হাসতে বললেন, ওসব আমি ভয় করি না।

কিন্তু রামমোহন কালাপানি পার হওয়ায় তাঁর কি গতি হলো দেখলে তো? শুধু

বিদেশ-বিভুঁইতেই মরলেন না, তাঁকে দাহ করা গেল না। তাঁকে কবর দিতে হলো।

দ্বারকানাথ আবার হাসতে হাসতে বলেন, কে কবে কোথায় মরবে, তা কে বলতে পারে? বিদেশে মরার ভয়ের তো ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকতে পারি না।

১৮৪২ সালের ৯ জানুয়ারী দ্বারকানাথ তাঁর নিজস্ব জাহাজ "ইন্ডিয়া"-যোগে কলকাতা থেকে বিলাত যাত্রা করলেন। তিনি সঙ্গে নিলেন ভাগনে চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডাঃ ম্যাকগাওনান, তাঁর একান্ত সচিব পরমানন্দ মৈত্র, তিনজন হিন্দু ভৃত্য ও একজন মুসলমান বাবুর্চি।

জাহাজে চড়ার ঠিক আগেই দ্বারকানাথ তাঁর এক কর্মচারীকে বললেন, আমাকে যিনি ইংরেজি শিখিয়েছিলেন সেই শেরবার্ন সাহেবের মাসোহারা যেন ঠিক মত তাঁর কাছে পৌঁছে যায়। খেয়াল রেখো, ওনার যেন কোনো কষ্ট না হয়।

মাত্র কয়েক মাস পরের কথা।

৩১ শে মে মাঝরাত্তিরে হেয়ার সাহেব ভয়ঙ্কর ওলাওঠা রোগে আক্রান্ত হলেন। খবর পেয়েই সাতসকালে ছুটে এলেন হেয়ার সাহেবের স্কুলের প্রাণপ্রিয় ছাত্র ও কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ করা ডাঃ প্রসন্নকুমার মিত্র। দেবপ্রতিম গুরুর চিকিৎসা শুরু করলেন ডাঃ মিত্র। সেবা-যত্নের ত্রুটি রাখে না বন্ধুবান্ধব আর তাঁর প্রিয় কিছু ছাত্র।

কিন্তু রোগের তেজ কমে না।

অপরাহ্নের দিকে হেয়ার সাহেব ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, প্রসন্ন, আর ব্লিস্টার দিও না। আমাকে শান্তিতে মরতে দাও।

কয়েক ঘণ্টা আগেই হেয়ার সাহেব তাঁর খাস বেয়ারাকে বলেছেন, গ্রে সাহেবকে বলো, আমার জন্য কফিন তৈরি করাতে।

না, খাস বেয়ারা সে কথা গ্রে সাহেবকে বলতে পারেনি। শুধু চোখের জল ফেলেছে।

এবার হেয়ার সাহেবের মুখে ব্লিস্টার না দেবার কথা শুনে ডাঃ মিত্র আর উপস্থিত সবাই অঝোরে কাঁদতে শুরু করেন।

ঠিক সূর্যাস্তের সময়ই হেয়ার সাহেব এই পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিলেন।

তারপর?

ভারতে ইংরেজি ও আধুনিক শিক্ষার প্রথম প্রবর্তক, ছাত্রদের দেবতা, দরিদ্র অসহায়ের পরম সুহৃদ, গুণিজনের বিনম্র গুণগ্রাহী ও ভারতহিতৈষী মহাত্মা ডেভিড

হেয়ারের মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই কলকাতার ঘরে ঘরে কান্নার রোল উঠলো ভোর হতে না হতেই শোকমগ্ন হাজার হাজার ছাত্র আর অগণিত নারী-পুরুষ এসে হাজির গঙ্গাতীরের গ্রে সাহেবের বাড়িতে। অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে সবাই তাঁকে শেষবারের মত প্রণাম করে শ্রদ্ধা জানায়। শোকে দুঃখে চোখের জল ফেলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাজা রাধাকান্ত দেবের মতো সমাজের গণ্যমান্যরা।

গ্রে সাহেবের বাড়ির সামনে হাজার হাজার নারী-পুরুষ ও ছাত্রদের ভীড় দেখে কোম্পানির সাহেবরা অবাক।

কিন্তু সমস্যা দেখা দিল হেয়ার সাহেবের মরদেহ সমাধিস্থ করা নিয়ে। খ্রীস্টান পাদ্রীরা বললেন, উনি তো খ্রীস্টানই ছিলেন না। সুতরাং খ্রীস্টানদের সমাধিক্ষেত্রে ওনাকে সমাধি দেওয়া যাবে না।

শেষ পর্যন্ত সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে আলাপ-আলোচনায় স্থির হলো, হেয়ার সাহেবের দান করা হিন্দু কলেজের পাশের জমিতেই সমাধি দেওয়া হবে।

শুরু হলো শোভাযাত্রা। শববাহী গাড়ির পিছন পিছন চলে শোকস্তব্ধ হাজার হাজার ধনী-দরিদ্র নারী-পুরুষ ও হিন্দু কলেজের প্রাক্তন-বর্তমান ছাত্ররা। শোভাযাত্রা বৌবাজারে পৌঁছতেই যেন জনপ্লাবন। যত দূর দেখা যায়, চারদিকে শুধু মানুষ আর মানুষ। চারদিকের বাড়ির বারান্দায় ছাদে, গাছের ডালেও মানুষ ; ওরা শুধু একবার ওঁকে দর্শন করতে চায়।

তারপর?

হিন্দু কলেজ সংলগ্ন কবরে এই মহাত্মার মরদেহ স্থাপন করতে না করতেই হাজার হাজার নারী-পুরুষ শিশু ও ছাত্ররা উন্মাদের মত কাঁদতে শুরু করে। কবরে মাটি দিতে না দিতেই শুরু হলো তুমুল বৃষ্টি। বোধকরি বিধাতাপুরুষও এই মহাত্মার মহাপ্রয়াণে অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না।

অনাচার অবিচার ব্যভিচার কুশিক্ষা কুসংস্কার এবং সর্বোপরি নারী নির্যাতন ও বর্বর সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে রামমোহনের বিদ্রোহ সমাজকে তোলপাড় করে তুললো। ডেভিড হেয়ারের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হলো হিন্দু কলেজ। ব্যবসা-বাণিজ্য ও অসংখ্য জনকল্যাণমূলক কাজে এগিয়ে এলেন কর্মবীর দানবীর দ্বারকানাথ। ডিরোজিও ঝড় তুললেন ছাত্রসমাজে ; ওঁর ছাত্র-শিষ্যরা গর্জে উঠলো কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। ইংরেজি ও আধুনিক শিক্ষার প্রসারে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিলেন লর্ড বেন্টিং

মেকলের সুপারিশে।

তবে ইংরেজি ও আধুনিক শিক্ষার ব্যাপারেও প্রথম উদ্যোগী হন রামমোহন। তিনি লর্ড আমহার্স্টকে বলেন, আপনারা সংস্কৃত ও মাদ্রাসা শিক্ষার প্রসারে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করছেন। আমি জানি আমাদের দেশের জ্ঞানভাণ্ডারে বহু ঐশ্বর্য ও সম্পদ আছে এবং সেই ঐশ্বর্য সম্পদের চর্চা নিশ্চয়ই করতে হবে। তবে ভারতের পক্ষে এখন অত্যন্ত জরুরী ইংরেজি ও আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা। চাই সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, খগোল, জ্যামিতি ও বিজ্ঞানের শিক্ষা।

লর্ড আমহার্স্ট শুধু সতীদাহের ব্যাপারে না, আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার ব্যাপারেও কোন সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নিতে পারেন নি। সিদ্ধান্ত নিলেন লর্ড বেন্টিঙ্ক।

তবে মেকলে মনে মনে আশা করেছিলেন, ভারতীয়দের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার হলেই খ্রীস্টান ধর্ম ছড়িয়ে পড়বে সমগ্র ভারতবর্ষে।

সে যাইহোক, রামমোহন বিলাতে গিয়েও চুপ করে থাকেন নি। বর্বর সতীদাহ প্রথা সম্পর্কে ইংরেজদের সচেতন করে জানান, সতীদাহ বন্ধ করে লর্ড বেন্টিঙ্ক অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। রামমোহনের জন্যই প্রিভি কাউন্সিলে রাজা রাধাকান্ত দেব ও গোঁড়া হিন্দুদের আপীল অগ্রাহ্য হয়।

লর্ড কর্নওয়ালিস আদেশ জারী করেছিলেন যে ভারতীয়রা কখনই উচ্চ পদে নিযুক্ত হবে না। রামমোহন বিলাতে গিয়ে ইংরেজ নেতৃবৃন্দকে বললেন, কোম্পানি ভারত শাসন করবে ভারতীয়দের নায্য দাবী উপেক্ষা করে, তা চলতে পারে না। শিক্ষিত ভারতীয়দের অবশ্যই উচ্চ পদে নিয়োগ করতে হবে।

হ্যাঁ, রামমোহনের এই আন্দোলনের জন্যই কোম্পানির লন্ডন আফিসের ডিরেক্টরা সিদ্ধান্ত নিলেন, উপযুক্ত শিক্ষিত ভারতীয়রা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বা ডেপুটি কালেক্টর হতে পারবে।

মোটকথা তখন সমাজের দিকে দিকে পরিবর্তনের ঢেউ।

রামমোহন দেহরক্ষা করলেন ১৮৩৩ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর। মৃত্যুশয্যার পাশে অন্যান্যদের সঙ্গে ছিলেন ডেভিড হেয়ারের অতি প্রিয় ছোট বোন মিস হেয়ার। তাঁর দেহ সমাধিস্থ হয় ১৮ই অক্টোবর।

রামমোহনের মৃত্যুর ঠিক সাত মাস আগে হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামে জন্ম হয় গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের।

দশ

রাজধানী কলকাতায় নানা বৈপ্লবিক চিন্তাধারার ঢেউ উঠলেও তা তখনো ছড়িয়ে পড়েনি সর্বত্র।

সতীদাহ বন্ধ হলেও বন্ধ হয় নি বহুবিবাহ। তবে হ্যাঁ, আগে যেমন বামুন আর কুলীন কায়েতরা পঞ্চাশ-ষাট-সত্তর বা শতাধিক বিয়ে করতেন, ঠিক তেমন আর হচ্ছে না। এখনও ঘরে ঘরে চার-পাঁচটা বউ সবারই আছে। দুঃখের বিষয় অনেকেই বিধবা। তখন ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, কলেরা, বসন্ত ইত্যাদি আরো কত রোগে নিত্য অকালমৃত্যু ঘরে ঘরে।

ঠিক অকালমৃত্যু না হলেও জনার্দন কবিরাজের মরার বয়স হয়নি। তাছাড়া কোনো রোগেও ভুগছিলেন না। অন্যান্য দিনের মতই সকাল-বিকেল তিরিশ-চল্লিশজন রুগী দেখেছেন। কাকে কি ওষুধ দিতে হবে, তার নির্দেশ দিয়েছেন ভাগনে চিন্তাহরণকে। দিনে-রাত্রে অন্যান্য দিনের মতই খেয়েছেন ; মা ও তিন স্ত্রীর সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলেছেন। তারপর যথারীতি শুয়েছেন। কিছুক্ষণ পরে ছোট বউ হেমলতা ঘরে এলে তার সঙ্গেও কিছু কথা বলেই ঘুমিয়েছেন।

ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠেই কবিরাজ মশাইকে তখনও শুয়ে থাকতে দেখে অবাক। হেমলতা গায় হাত দিয়ে ডাকতে গিয়েই বিকট চিৎকার করে ওঠে, ও বড়দি! শিগগির আসুন। কবিরাজ মশাই কেমন লোহার মত শক্ত হয়ে শুয়ে আছেন।

ওর চিৎকার শুনেই ছুটে এলেন সবাই—কবিরাজ মশায়ের মা, দুই বউ আর চিন্তাহরণ।

চিন্তাহরণ ভাল করে দেখেশুনে বলে, মামা, মাঝরাত্তিরেই চলে গেছেন।

কান্নাকাটিতে ভেঙে পড়লেন সবাই। ছুটে এলো প্রতিবেশীরা। সকালে যেসব রুগী ও তাদের বাড়ির লোকজন এলো, তারাও চোখের জল ফেলে।

মধ্যাহ্নেই কবিরাজ জনার্দন ভটচাজের মরদেহ পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে যায়।

তারপর একদিন থেমে যায় কান্নাকাটি ; শেষ হয় শ্রাদ্ধ-শান্তি।

জনার্দন শৈশবে পিতৃহীন হলেও পিতামহ ভগবতীচরণের স্নেহ-যত্নেই লালিত পালিতহয়েছেন , শৈশব থেকেই পিতামহর কাছে শিখেছেন কবিরাজী।

নাতিকে নিয়ে খেতে বসে ভগবতীচরণ হাসতে হাসতে পুত্রবধূকে বলেন, তোমাকে আমি বলে দিচ্ছি, এই ব্যাটা জনার্দন বিখ্যাত কবিরাজ হবে।

পুত্রবধূও একটু হেসে বলেন, আপনার কৃপা আর আশীর্বাদ থাকলে নিশ্চয়ই হবে।

হবে মানে? ব্যাটা এই এগার-বারো বছর বয়সেই যা শিখেছে, তা দেখেই তো আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি।

জনার্দন যখন পনের-যোল বছরের, তখনই ভগবতীচরণ ওকে মাঝে মাঝে রুগী দেখতে পাঠান এবং ওরই পরামর্শ অনুসারে ভগবতীচরণ ওষুধ দেন। ঐসব রুগীরা দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠায় ভগবতীচরণ যেমন খুশি তেমনই আশান্বিত হন নাতির ভবিষ্যতের কথা ভেবে।

জনার্দন যখন আঠারো বছরের, তখনই একদিন ভগবতীচরণ পাশের তালপুকুর গ্রামের রুগী দেখে ফেরার ঠিক বুড়োশিবতলার সামনে মাথা ঘুরে পড়ে যান ও মুহূর্তের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়।

জনার্দন তখন থেকেই পুরোপুরি কবিরাজী শুরু করে।

এসব অনেক দিন আগেকার কথা।

তারপর একদিন ওর মা ছেলের বিয়ে দিলেন যশোদার সঙ্গে।

যশোদা সত্যি ভাল মেয়ে। রূপে গুণে কাজেকর্মে ওর কোন তুলনাই হয় না। তাছাড়া শাশুড়িকে যেমন শ্রদ্ধা-ভক্তি করে, সেইরকমই সেবা-যত্ন করে। অমন স্ত্রী পেয়ে খুশি জনার্দনও।

সেদিন দুপুরে খেতে বসে জনার্দন হাসতে হাসতে বলে, মা, তোমার পুত্রবধূ সত্যি সৌভাগ্যবতী।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, মা।

জনার্দন মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, আমি দেখছি, তোমার এই পুত্রবধূ আসার পর থেকেই যেমন আমার নাম-ডাক ছড়াচ্ছে, সেইরকমই আমার আয় বাড়ছে।

ওরে জনা, এই মেয়েকে দেখেই আমি বুঝেছিলাম, ও সৌভাগ্যবতী, লক্ষ্মীমন্ত তাইতো ওকে আমি এই সংসারে নিয়ে এলাম।

রাত্রে শোবার পর যশোদা বলে, আপনি দুপুরে খেতে বসে মাকে যা বললেন, তা সত্যি?

হ্যাঁ, সত্যি।

জনার্দন মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, আগে আশেপাশের দু'চারটে গ্রাম থেকে রুগী আসতো। বিয়ের পর থেকেই দেখছি, অনেক দূরের গ্রাম থেকেও রোজই দু'একটা রুগী আসছে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ গো।

আপনার চিকিৎসায় ঐসব রুগীরা ভাল হয়ে যাচ্ছে?

হ্যাঁ।

খুব ভাল।

জানো বউ, আমার আয়ও দিন দিনই বাড়ছে।

জনার্দন দু'এক মিনিট চুপ করে থাকাব পর বলেন, তবে আমার রুগী বাড়া মানেই তো তোমার বেশি পরিশ্রম। ওষুধপত্তর তৈরিব জন্য তোমাকে অনেক বেশি বাটাবাটি ইত্যাদি করতে হবে।

তাতে কি হয়েছে? ওতে আমার কোন কষ্ট হবে না।

হ্যাঁ, সত্যি জনার্দন কবিরাজের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে দূর-দূরান্তরে। রুগী আসার বিরাম নেই। তাছাড়া রুগী দেখার জন্যও ছুটে যেতে হয় এখানে-ওখানে।

জনার্দন কবিরাজের ঘরে খড়ের চালের বদলে টিনের চাল হয়। কবিরাজখানা শুধু বড় হয় না ; ওষুধ তৈরির জন্য ওরই লাগোয়া একটা ঘর তৈরি হয়। যেসব লোকজন রুগী নিয়ে রাত্রের দিকে আসে বা বিকেলের দিকে সেদিনই ফিরতে পারে না, তাদের জন্যও কবিরাজ মশাই বসতবাড়ির কিছু দূরে দু'খানা ঘর তৈরি করেন।

এসব অনেক বছর আগের কথা। তারপর কত কি ঘটে গেল। সাত বছর পরেও যখন যশোদার কোন সন্তান হলো না, তখন মা ও যশোদার অনুরোধে জনার্দন দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন।

না, দ্বিতীয়া স্ত্রী চারুবালারও কোন সন্তান হলো না।

বুড়ী বললেন, জনা, তুই আবার বিয়ে কব।

তুমি কি পাগল হয়েছ? আমি আবার বিয়ে করব কোন দুঃখে?

এই দুই বউ যখন কোন বংশধর দিতে পাবলো না, তখন তো তোকে বিয়ে করতেই হবে।

বুড়ী মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, আমি কি নাতি-নাতনীর মুখ না দেখেই মরব?

জনার্দন একটু বিরক্ত হয়েই বলেন, আমি আবার বিয়ে কবলেই যে তুমি নাতি-নাতনী পাবে, তার কি ঠিক আছে?

এই দুই বউয়ের গণ্ডগোল আছে বলেই তো কোন ছেলেমেয়ে হলো না। এবার যাকে বিয়ে করবি, তার নিশ্চয়ই কোন গণ্ডগোল থাকবে না।

তোমাকে কে বলল?

আমার মন বলছে।

গণ্ডগোল তো আমারও থাকতে পারে।

বুড়ী এক গাল হেসে বলে, দূর বোকা! পুরুষের আবার গণ্ডগোল থাকে নাকি?

তবে শেষ পর্যন্ত বুড়ী ছেলেকে বাধ্য করলেন আবার বিয়ে করতে।

দিন এগিয়ে চলে। ঘুরে যায় বছরের পর বছর।

রাত্রে খেতে বসেই জনার্দন বলেন, হ্যাঁরে, চিন্তাহরণ, আজ ওষুধপত্তর তৈরি করতে হবে নাকি?

হ্যাঁ মামা তৈরি করতে হবে।

আজ কে বাটাবাটি গুঁড়ো-টুড়ো করবে?

আগের দিন তো নতুন মামী করেছেন ; তাই আজ মেজ মামীই করবেন।

জনার্দন আপনমনেই বলেন, আজকাল রুগী বেড়েছে বলে একদিন অন্তরই ওষুধপত্তর তৈরি করতে হচ্ছে।

চিন্তাহরণ একটু হেসে বলে, যেভাবে রুগী বাড়ছে, তাতে হয়ত এবার থেকে রোজই ওষুধপত্তর তৈরি করতে হবে।

এখন এ বাড়িতে অনেক ঘর। তিন বউয়ের তিনটি ঘর। তবে উত্তরের ঘরে যশোদা শাশুড়িকে নিয়েই থাকে। এছাড়া জনার্দনের নিজস্ব একটা ঘর আছে। সে ঘরে প্রচুর পুঁথি-পত্র বইখাতা। ওঁকে নিয়মিতই পড়াশুনা করতে হয়। উনি রাত্রিবাসও করেন এই ঘরে। চিন্তাহরণ থাকে কবিরাজখানার পিছন দিকের একটা ঘরে।

খাওয়া-দাওয়া মিটে যাবার পর পরই যশোদা আর চারুবালা ওদের ঘরে যান। হেমলতা যান কবিরাজের ঘরে।

চিন্তাহরণ কবিরাজখানায় এসেই যেসব লতা-পাতা বাটতে হবে তা গুছিয়ে রাখে; আবার যেসব শিকড় হামান-দিস্তায় গুঁড়ো করতে হবে, তাও ঠিক করে রাখতে না রাখতেই চারুবালা এসে হাজির।

চারুবালা তক্তাপোষের উপর বসে পড়েই বলে, আগের দিন এইসব বাটাবাটি গুঁড়ো-টুড়ো করে গায়-গতরে যে ব্যথা হয়েছিল, তা এখনও যায়নি। আজ আবার দেড়-দু'ঘণ্টা ধরে বাটাবাটি করলে আমি বোধহয় কাল বিছানা ছেড়ে উঠতে পারব না।

হ্যাঁ, মেজ মামী, সত্যি খুব পরিশ্রমের কাজ।

চিন্তে, তুই বিশ্বাস কর, এইসব বাটাবাটি করে পা-উরু-কোমরে বিষের মত ব্যথা হয। ব্যথার চোটে ঘুমুতে পর্যন্ত পারি না।

মেজ মামী, আপনি কষ্ট করে একটু বেটে দিন। তারপর আমি আপনার গা-হাত-পা এমন টিপে দেব যে আর আপনার ব্যথা থাকবে না।

তুই আমার গা-হাত-পা টিপে দিবি কেন?

তাতে কি হয়েছে? আপনি তো আমার মামী।

চিন্তাহরণ না থেমেই বলে, আমি কি আপনাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করি না?

হ্যাঁ, তা করবি না কেন?

আপনাদের সেবা করাই তো আমার কর্তব্য।

চারুবালা একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, ঠিক আছে, তাহলে একটু টিপে দিস।

নানা রকম লতা-পাতা বাটতে, কিছু শিকড়-বাকড় গুঁড়ো করতে আর কিছু কিছু পাতার রস তৈরি করতে চারুবালার প্রায় ঘণ্টা দুয়েক সময় লাগলো।

সত্যি, তারপর উনি যেন উঠে দাঁড়াতে পারেন না।

চিন্তাহরণ বলে, মেজ মামী, ঘরের দরজাটা খোলা রাখবেন। আমি এইসব ঠিকঠাক করে আসছি।

হ্যাঁরে চিন্তে, যদি কেউ দেখতে পায় তুই আমার ঘরে ঢুকেছিস বা বেরোচ্ছিস?

চিন্তাহরণ একগাল হেসে বলে আপনার ঘরের দরজা তো পুব দিকে ; অন্য ঘরের লোকজন দেখবে কি করে?

চারুবালা বাইরের দিকে পা বাড়িয়ে বলেন, ঠিক আছে, তাহলে আসিস।

আপনি যান ; আমি একটু পরেই আসছি।

হ্যাঁ, চিন্তাহরণ একটু পরেই ওর ঘরে যায়।

চারুবালা বলেন, সত্যি বড্ড ব্যথা করছে। দে তো একটু টিপে।

হ্যাঁ, চিন্তাহরণ ওঁর পা টিপে দেয় উরু টিপে দেয়, কোমর টিপে দেয়।

আঃ। কি ভাল লাগছে!

মেজ মামী, সত্যি আপনার ভাল লাগছে?

হ্যাঁ, খুব ভাল লাগছে। তবে কোমরের কাপড় আর নামাবি না।

মেজ মামী, আপনি লজ্জা করছেন কেন? চারপাশ ভালভাবে টিপে না দিলে তো ব্যথা যাবে না।

না, চারুবালা আর কথা বলেন না।

চিন্তাহরণ কোন দ্বিধা না করে চারুবালার সেবা করে প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে।

মেজ মামী, এবার আমি যাই?

যাবি? আচ্ছা যা।

· মাসখানেক পরের কথা।

সেদিন রাত্রে কবিরাজখানায় এসেই চারুবালা বলেন, বুকে-পিঠে এমন সর্দি বসেছে যে নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে।

আপনি মামাকে বলেন নি কেন?

না, না, ওনাকে বলতে আমার ইচ্ছা করে না।

চারুবালা মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, যে স্বামী গত চার বছরের মধ্যে একটা রাতও আমার সঙ্গে কাটায় নি, তাকে অসুখের কথা বলতেও আমার ঘেন্না করে।

দু'এক মিনিট চুপ করে থাকার পর চিন্তাহরণ বলে, মেজ মামী, আমি আপনার বুকে-পিঠে এমন তেল মালিশ করে দেব যে আপনার সর্দি চলে যাবে।

তোকে আরও কষ্ট দেব? তুই মাঝে মাঝেই গা-হাত-পা টিপে দিচ্ছিস বলে তবু হেঁটে-চলে বেড়াতে পারছি কিন্তু তোর তো যথেষ্ট পরিশ্রম হয়।

চিন্তাহরণ একটু হেসে বলে, না, না, মেজ মামী, আমার কোন কষ্ট হয় না।

সে রাত্রে কবিরাজখানার কাজকর্ম সেরে চারুবালা ঘরে যাবার পর পরই চিন্তাহরণ এক বাটি তেল নিয়ে আসে।

মেজ মামী, আপনি শুয়ে পড়ুন।

হ্যাঁ, চারুবালা শুয়ে পড়েন।

চিন্তাহরণ বলে, মেজ মামী, আমি যদি আপনার পাশে বসে তেল মালিশ করি, তাহলে কি আপনার অসুবিধে হবে?

না, না, অসুবিধে হবে না। তুই বসে বসেই তেল মালিশ করে দে।

হ্যাঁ, চিন্তাহরণ ওনার বুকে-পিঠে তেল মালিশ করে দেয়। চারুবালা কিছু বলে না। হাজার হোক পরিপূর্ণ যুবতী। চার বছর স্বামী স্পর্শ করেনি। তাইতো চিন্তাহরণের মত একটা জোয়ানের এই সেবা, এই স্পর্শ ভালই লাগে।

মেজ মামী, ভাল লাগছে?

হ্যাঁ, খুব ভাল লাগছে।

কিছুক্ষণ পর চিন্তাহরণ বলে, মেজ মামী, এবার কোমর-উরু টিপে দিই?

দে।

দশ-পনের মিনিট পর চারুবালা বলেন, এই চিন্তে, ক্লান্ত লাগছে না?

সামান্য একটু।

একটু শুবি?

আমি শুলে আপনার কষ্ট হবে।

না, না, কষ্ট হবে না। আয় আয়।

চারুবালাই ওকে কাছে টেনে নেন।

এর পর যেদিন চারুবালা ঐসব লতাপাতা বাটাবাটি করার জন্য কবিরাজখানা
এলেন, সেদিন চিন্তাহরণ বলে, মেজ মামী, আপনি কি আমার উপর রাগ করেছেন

চারুবালা চাপা হাসি হেসে বলেন, তোর উপর রাগ করবো কেন?

সেদিন তো আমি খুব অন্যায় করেছি।

চারুবালা একটু হেসে ওর গাল টিপে বলেন, তুইও অন্যায় করিস নি, আমিও অন্যায় করি নি। এবার থেকে আমরা মাঝে মাঝেই ঐরকম অন্যায় করবো।

চিন্তাহরণ অবাক হয়ে চারুবালার দিকে তাকায়।

চারুবালা বলেন, অবাক হচ্ছিস কেন? সেদিন তুই আমাকে সত্যি দারুণ আনন্দ দিয়েছিস। তুই মাঝে মাঝেই আমাকে ঐরকম আনন্দ দিবি।

এবার চিন্তাহরণ একগাল হেসে বলে, মেজ মামী, সেদিন আমারও খুব ভাল লেগেছে।

জনার্দন কবিরাজের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে যেসব আত্মীয়-স্বজন এসেছিলেন, শ্রাদ্ধ-শান্তি মিটে যাবার পরই তাঁরা বিদায় নিলেন। ছিলেন শুধু হেমলতার মা আর ছোট মামা হারান।

হেমলতার কান্নাকাটি দেখে যশোদাই ওর মাকে বলেন, মা, আপনি হেমকে নিয়ে যান। ও কিছুদিন আপনার কাছে বা মামা বাড়িতে থাকলে বোধহয় এই আঘাত সামলে নিতে পারবে।

হ্যাঁ, যশোদা, আমিও তাই ভাবছিলাম। আমি কি তোমার শাশুড়িকে কথাটা বলব?

ছেলের মৃত্যুতে মা একেবারে বোবা হয়ে গেছেন। কারুর সঙ্গে কোন কথা বলছেন না। মাঝে মাঝে এমনভাবে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকেন যেন আমাদের চিনতেই পারছেন না।

যশোদা মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, আমার শাশুড়িকে কিছু বলতে হবে না। আপনি স্বচ্ছন্দে হেমকে নিয়ে যান।

ক'দিন পরেই হেমলতা ওর মা আর ছোটমামার সঙ্গে চলে গেল।

দিন কয়েক পরের কথা।

চিন্তাহরণকে খেতে দিচ্ছেন চারুবালা। যশোদা পাশে বসে আছেন।

চিন্তাহরণ বলে, বড় মামী দিদিমাকে সকালে ওষুধ খাইয়েছেন?

মা কিছুতেই ওষুধ খেতে চাইছেন না। জোর করলেই ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছেন।

বড় মামী, যেভাবেই হোক দিদিমাকে ওষুধ খাওয়াতে হবে। ওষুধ না খেলে ওঁর শরীর দিন দিনই খারাপ হবে।

হ্যাঁ, চিন্তে, মা'র শরীর সত্যি দিন দিনই খারাপ হচ্ছে। ওঁর অবস্থা বিশেষ সুবিধে বলে মনে হচ্ছে না।

একে বয়স হয়েছে, তার উপর এই ভয়ঙ্কর শোক পেয়েছেন। শরীর ভাল থাকবে কি করে?

কিছুক্ষণ পর যশোদা বলেন, হ্যাঁরে চিন্তে, সংসার চলবে কি করে?

কেন?

কেন মানে?

যশোদা একটু থেমে বলেন, হেম এখন নেই কিন্তু দু'এক মাস পরই তো ফিরে আসবে। ও ফিরে এলে আমরা পাঁচজন ছাড়াও তিনজন কাজের লোক। তাছাড়া কবিরাজখানার রুগী বা তাদের বাড়ির লোকজনকে তো দু'মুঠো খেতে দিতে হয়।

হ্যাঁ, বড় মামী, সবই জানি।

চিন্তাহরণ একটু থেমে বলে, আপনি কিছু চিন্তা করবেন না। আমি মাসখানেকের মধ্যে ঠিক সব সামলে নিতে পারবো।

যশোদা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, তুই বা কত কাল আমাদের জন্য বেগার খাটবি? তোর নিজেরও তো একটা ভূত-ভবিষ্যত আছে।

চিন্তাহরণ খুব জোরে একবার নিঃশ্বাস ফেলে একটু হেসে বলে, বড় মামী, সত্যি কথা বলতে কি, আমি নেহাতই বানের জলে ভাসতে ভাসতে আপনাদের এখানে এসে উঠেছি লতায়-পাতায় এক অতি তুচ্ছ সম্পর্কের সূত্রে।

ও না থেমেই বলে, মামা বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে আমাকে আশ্রয় দিলেন। কবিরাজখানায় কাজ করতে গিয়ে মামার কাছে বকুনিও খেয়েছি, মারও খেয়েছি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আর আপনাদের স্নেহও পেয়েছি।

চিন্তাহরণ মুখ তুলে যশোদার দিকে তাকিয়ে বলে, সত্যি কথা বলতে কি সাত-আট বছর বয়সের সময় পিসির কাছে বছর দেড়েক পেট ভরে খেতে পাবার পর চোদ্দ বছর আগে আপনাদের কাছে এসেই আবার পেট ভরে খেতে পেলাম।

যশোদা আর চারুবালা, দু'জনেই একটু হাসেন।

বড় মামী, মামার কৃপায় আমিও কবিরাজী শিখেছি। মামা সদ্য গত হয়েছেন ব'
রুগী কম আসছে ঠিকই কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বেশী রুগী আসবে বলেই আম
বিশ্বাস।

চিন্তাহরণ একটু হেসে বলে, এই চিন্তাহরণ যতদিন বেঁচে থাকবে, ততদি
আপনাদের কোনো চিন্তা নেই। সব ঠিক আগের মতই চলবে।

যশোদা একটু হেসে বলেন, সত্যি তুই চিন্তাহরণ।

চারুবালাও একটু হেসে বলেন, হ্যাঁ, বড়দি, ঠিকই বলেছ। চিন্তে সত্যি আমাদে
চিন্তাহরণ।

সত্যি আশ্চর্য ব্যাপার!

জনার্দন কবিরাজের মৃত্যুর মাস দেড়েকের মধ্যেই চিন্তাহরণের কাছেও দিন দিনই
আরো বেশি রুগী আসতে শুরু করে। তাদের কেউ কাছের, কেউ দূরের।

চিন্তাহরণ প্রত্যেকটা রুগীকে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে পরীক্ষা করার পর
বেশ চিন্তা-ভাবনা করে ওষুধ দেয়। কখনও কখনও ওষুধ দেবার আগে বই পুঁ
দেখে নেয়। ওষুধ দিতে হয়তো মামার চাইতে বেশি সময় নেয কিন্তু গভীরভা
বিচার-বিবেচনা না করে চিন্তাহরণ কখনই কাউকে ওষুধ দেয় না, দেবে না।

এই নতুন কবিরাজের ওষুধে রুগীরা বেশ সত্বর সুস্থ হচ্ছে দেখে তাদের বাড়ি
লোকজনও খুশি। সেই খুশিতে কেউ কেউ ছুটে আসে চিন্তাহরণের কাছে।

চিন্তাহরণের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেই পালপাড়ার রাখাল একগাল হেসে
বলে, আপনার ওষুধ একেবারে যাদু দেখিয়ে দিয়েছে। ছেলেটা এতদিন ধরে ভুগছিল
কিন্তু আমরা ভাবতেও পারিনি, আপনার ওষুধে এক সপ্তাহের মধ্যেই ও সুস্থ হয়ে
উঠবে।

চিন্তাহরণ একটু হেসে বলে, আগে আনলে ছেলেটাকে এত কষ্ট পেতে হতো
না।

কবিরাজ মশাই, আমাদের মাথায় যদি অত বুদ্ধি থাকতো, তাহলে আর দুঃখ কি
ছিল?

রাখাল মুহূর্তের জন্য থেমে পাশের এক ঝুড়ি নারকেল দেখিয়ে বলে, গরীব
মানুষ। আপনাকে কি আর দেব? তাই গাছের ক'টা নারকেল এনেছি। দয়া করে
খাবেন।

এসব আনার দরকার ছিল না।

কবিরাজ মশাই, না বলবেন না।

তুমি ভিতরে গিয়ে বড় মামীকে ওগুলো দিয়ে দাও।

রাখাল ঝুড়ি ভর্তি নারকেল নিয়ে ভিতরে যায়।

সেই কোথায় কালীনগর ও মথুরাপুর! সেখান থেকেও রুগী এলো চিন্তাহরণের কাছে।

জৈনুদ্দীনের কাছে তার নতুন বিবির সমস্যার কথা শুনেই চিন্তাহরণ বলে, তোমার বিবিকে নিয়ে ভিতরের বাড়িতে চলো তো।

জৈনুদ্দীন আর তার নতুন বিবিকে নিয়ে চিন্তাহরণ বাড়ির ভিতরে গিয়ে গলা চড়িয়ে বলে, ও বড় মামী। ও মেজ মামী! আপনারা একজন একটু আসুন।

যশোদা রান্না করতে করতে বেরিয়ে এসে বলেন, চিন্তে, ডাকছ কেন?

জৈনুদ্দীনের বউকে একটু দেখতে হবে।

আমি তো রান্না করছি ; দাঁড়াও, চারুকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

চারুবালা আসতেই চিন্তাহরণ ওনাকে একটু পাশে নিয়ে খুব চাপা গলায় বলে, জৈনুদ্দীনের বউয়ের বাঁ স্তনে বোধ হয় একটা ফোঁড়া হয়েছে। আপনি খুব ভাল করে দেখবেন, ফোঁড়ার মুখ হয়েছে কিনা ; একটার বেশি মুখ হয়েছে কিনা, তাও দেখবেন। এছাড়া ফোঁড়ার চারপাশ টিপে দেখবেন, নরম হয়েছে নাকি এখনও শক্ত আছে।

চারুবালা সব শুনে জৈনুদ্দীনের বিবিকে একটু আড়ালে নিয়ে যান।

কয়েক মিনিট পরে চারুবালা ফিরে এসে চিন্তাহরণের কানে কানে কি যেন বলেন।

চিন্তাহরণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, বুঝেছি।

পরে চিন্তাহরণ জৈনুদ্দীনকে বলে, তুমি তোমার নতুন বিবির এ' জায়গায় কি কামড়ে দিয়েছিলে?

আজ্ঞে বোধহয় দাঁত লেগে গিয়েছিল।

খুবই খারাপ কাজ করেছ।

আজ্ঞে আর হবে না।

যাইহোক, আমি যে ওষুধ দিচ্ছি, তা পরিষ্কার ন্যাকড়ায় ভিজিয়ে ওখানে লাগিয়ে দেবে। সারাদিনে অন্তত তিন-চারবার এ' ওষুধ দিতে হবে ; তবে প্রত্যেকবারই পুরনো ন্যাকড়া ফেলে দিয়ে নতুন ন্যাকড়া ব্যবহার করবে।

চিন্তাহরণ মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, আশা করি পাঁচ-সাত দিনের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে। আমাকে খবর দিও, ও কেমন থাকে।

সে আর বলতে!

হ্যাঁ, জৈনুদ্দীন এসেছিল কিন্তু দিন কুড়ি-বাইশ পরে।

সকাল থেকে তিরিশ-পঁয়ত্রিশজন রুগী দেখে ও তাদের ওষুধ দিতে দি
চিন্তাহরণ সত্যি ক্লান্ত। তাছাড়া বেশ খিদেও লেগেছে। কবিরাজখানা বন্ধ করে খে
যাবার যখন উদ্যোগ করছে, ঠিক তখনই গরুর গাড়ির আওয়াজ। চিন্তাহরণ ম
মনে ভাবে, নিশ্চয়ই আমার কোন রুগী এসেছে।

না, রুগী না ; এসেছে জৈনুদ্দীন।

কি জৈনুদ্দীন, তোমার বিবি ভাল আছে?

আজ্ঞে একেবারে ফাস কেলাস আছে।

বলো, আবার কার কি হলো।

আজ্ঞে কারুর কিছু হয় নি ; এসেছি একটু চাল দিতে। খুব ভাল আতপ চাল

চাল আনার কি দরকার ছিল?

কবিরাজ মশাই, সত্যি কথা বলছি, আপনাকে কিছু না দিয়ে শান্তি পাচ্ছিলাম না

আচ্ছা বাড়ির ভিতরে চলো।

চিন্তাহরণের ডাকে যশোদা আর চারুবালা বেরিয়ে আসতে না আসতে
জৈনুদ্দীনের এক কর্মচারী চালের বিরাট বস্তাটা সামনের বারান্দায় এসে রাখে।

চিন্তাহরণ একটু হেসে যশোদাকে বলে, মেজ মামী, জৈনুদ্দীনের বউকে পরী
করেছিলেন বলে এই এক বস্তা চাল ফি পেলেন।

ওঁরা দু'জনেই হাসেন।

জৈনুদ্দীন যশোদার দিকে তাকিয়ে বলে, বড়মা, আমি জানি হিঁদু বিধবারা আত
চাল খায়। তাই আপনাদের জন্য এই একটু আতপ চাল দিয়ে গেলাম। সত্যি বল
বড়মা, খুব ভাল চাল। রান্নার সময় দেখবেন ভুর ভুর করে গন্ধ বেরুচ্ছে। আমাদে
গেরামে এই চাল দিয়েই পায়েস করে।

একি তোমার নিজের জমির চাল?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

চারুবালা বলেন, জৈনুদ্দীন তোমাদের গ্রাম তো অনেক দূর।

আজ্ঞে হ্যাঁ, তা প্রায় কোশ দশেক হবে।

তোমাদের ওখানে কি কোন কবিরাজ-বৈদ্য নেই যে এখানে নিয়ে এলে?

না, আমাদের গেরামেও বদ্যি-কবিরাজ আছে ; তবে ওদের কাছে অল্পবয়সী বি
বা মেয়েদের দেখাই না।

কেন?

ঠিক বিশ্বাস হয় না।

সেকি?

মা, এখানে নতুন কবিরাজ মশাই আপনাকে দিয়ে আমার বিবিকে পরীক্ষা করালেন কিন্তু ওখানে তো ওরা নিজেরাই পরীক্ষা করতো।

জৈনুদ্দীন না থেমেই বলে, কার মনে কি কু-মতলব আছে, তা কি বলা যায়?

যাইহোক দিন দিনই যেমন রুগীর সংখ্যা বাড়ে, সেইরকমই বাড়ে আয়। টাকা ছাড়াও কতজনে কত কি দিয়ে যায়।

সমস্ত রুগী দেখে তাদের ওষুধ দিয়ে চিন্তাহরণের খেতে যেতে বেশ দেরি হয়। বেলা গড়িয়ে যায়।

চিন্তাহরণ খেতে বসার আগেই যশোদার সামনে টাকাকড়ি রেখে বলে, বড় মামী, আজ সকাল থেকে এই আয় হয়েছে।

সেই প্রথম দিনই যশোদা বলেছিলেন, চিন্তে, টাকাকড়ি তোর কাছেই রেখে দে। সব খরচপত্তরই তো তুই করবি। আমি টাকাকড়ি রেখে কী করব?

না, বড়মামী, টাকাকড়ি আপনিই রাখবেন। যখন যা দরকার হবে, আমি চেয়ে নেবো।

হ্যাঁ, সেইরকমই চলছে।

জৈনুদ্দীন চলে যাবার পর চিন্তাহরণ হাত-মুখ ধুয়ে খেতে বসার সময় যশোদার সামনে টাকাকড়ি রাখতেই চারুবালা একটু হেসে বলেন, ও বড়দি, চিন্তেকে বলে দাও, এবার থেকে আমাকে মাসোহারা না দিলে আমি ঐসব খাটাখাটি করতে পারবো না।

চিন্তাহরণ একটু হেসে বলে, মেজ মামী, মাসোহারা দেবাব মালিক বড়মামী, আমি না।

আমি কেন বড়দির কাছে চাইব? বড়দি কি আমাকে খাটাখাটি করায়?

চারুবালা একটু হেসে বলেন, খাটাবে তুমি আর টাকা দেবেন বড়দি?

সেদিন রাত্রে চিন্তাহরণ যখন গা-হাত-পা টিপে দিচ্ছে তখন চারুবালা বলেন, জানিস চিন্তে তুই একটু টিপে না দিলে আজকাল আমার ঘুমই আসে না।

আপনার গা-হাত-পা রোজ টিপে দিতে তো আমার আপত্তি নেই কিন্তু ভয় করে?

কীসের ভয়?

আপনি যে মাঝে মাঝেই বেসামাল হয়ে পড়েন।

সেটা কি খুবই অস্বাভাবিক?

না, তা না কিন্তু...

ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই চারুবালা বলেন, দ্যাখ চিন্তে, আমি পঁচি
বছরের যুবতী। আমার রূপ-যৌবন-স্বাস্থ্য আছে। তোর মামা নেই বলে কি আমার
শরীর থেকে সব কামনা-বাসনা উধাও হয়ে যাবে?

কিন্তু মামা থাকতেও তো আপনি..

আবার ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই চারুবালা বলেন, তোর মামা বেঁচে
থাকতে যখন তোকে নিয়ে ফুর্তি করেছি, তখনও আমি একরকম বিধবা ছিলাম।

চিন্তাহরণ সঙ্গে সঙ্গে কোন কথা বলতে পারে না।

দ্যাখ চিন্তে, একটা কথা জেনে রাখিস, যে দু'বেলা খেতে পায়, সে কখনই চুরি
করে খাবে না।

মেজ মামী, তা আমি বিশ্বাস করি।

চিন্তে, একটা সত্যি কথা বলবি?

নিশ্চয়ই বলব।

আমাকে আনন্দ দিতে কি তোর কোন আপত্তি আছে?

আপত্তি থাকবে কেন?

চিন্তাহরণ না থেমেই বলে, আপনাকে আনন্দ দিয়ে আমি কি কম আনন্দ পাই
মেজ মামী। আমিও সাতাশ-আটাশ বছরের যুবক ; কামনা-বাসনা আমারও আছে

আয়, আমার কাছে আয়।

হেমলতার বাপের বাড়িতে বাপও নেই, ভাইবোনও নেই। এক বড় দাদা আছে
কিন্তু সে কৃষ্ণনগরে এক উকিলের মহুরী। ওখানেই সস্ত্রীক থাকে। তবে সে প্রত্যেক
মাসে মাকে পাঁচ টাকা পাঠায়। হেমলতার বাবার কয়েকজন শিষ্যও ওর মাকে
নিয়মিত কিছু টাকা পাঠিয়ে দেন। তাই হেমলতার মা আর দুই বিধবা পিসীর খাওয়া
পরাব কোন কষ্ট হয় না। কিন্তু সদ্যবিধবা হেমলতা মা আর পিসীদের সান্নিধ্যে কয়েক
দিন কাটাবার পরই হাঁপিয়ে ওঠে। দিন রাত্রি ঐ তিনজনের হা-হুতাশ শুনতে ওর
ভাল লাগে না। তাছাড়া আশেপাশেও এমন কোন সমবয়সী নেই, যার সঙ্গে গল্পগুজব
করে একটু সময় কাটায়।

তবু এইভাবে মাসখানেক কেটে যায়।

সেদিন হঠাৎ হারান এসে হাজির।

ওকে দেখেই হেমলতা একগাল হেসে চিৎকার করে, মা, ছোটমামা এসেছে

বিন্দুবাসিনী ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই বলেন, কিরে হারু, এতদিন আসিস নি

কেন?

শিবমন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবসের উৎসব নিয়ে খুবই ব্যস্ত ছিলাম ; তাই...

বিন্দুবাসিনী একগাল হেসে বলেন, সেই আগের মতই এখনও জমজমাট উৎসব হয়?

তার চাইতে অনেক বেশি জমজমাট উৎসব হয়। কত হাজার হাজার লোক আসে, তা তুমি ভাবতে পারবে না।

বলিস কিরে?

হ্যাঁ, দিদি, ঠিকই বলছি।

বিন্দুবাসিনী আবার একটু হেসে বলেন, তোরও নিশ্চয়ই ভালই আয় হয়?

এবার দক্ষিণা আর প্রণামী মিলে প্রায় দু'শ টাকা পেয়েছি।

হারান না থেমেই বলে, ঐ টাকা দিয়ে মা-র ঘরখানা প্রায় নতুন করে দিয়েছি।

খুব ভাল করেছিস।

বিন্দুবাসিনী একঝলক মেয়েকে দেখেই ভাইকে বলেন, তুই এসে ভালই করেছিস। তুই থাকলে হেম তোর সঙ্গে গল্পগুজব করে ভালই থাকবে। তোরা তো ঠিক পিঠোপিঠি ভাই-বোনের মত বড় হয়েছিস। তোদের দু'জনের মধ্যে তো খুবই ভাব।

হারান বলে, দিদি, আমাকে তো বিকেলেই চলে যেতে হবে। আমি না গেলে কে শিবপুজো করবে?

তাও তো বটে!

এতক্ষণ চুপ করে থাকার পর হেমলতা বলে, মা, আমি ছোটমামার সঙ্গে যাবো। দিদিমা আর ছোটমামার কাছে আমি অনেক ভাল থাকব।

তা আমি জানি।

হেমলতা একটু হেসে বলে, দিদিমাও আমার বন্ধু, ছোটমামাও আমার বন্ধু। দুই বন্ধুকে নিয়ে আমি বেশ ভালই থাকব।

বিন্দুবাসিনী একটু হেসে বলেন, মা আর হারুর সঙ্গে যে তোর খুব ভাব, তা আমি ভাল করেই জানি। ঠিক আছে, তুই হারুর সঙ্গে যা।

হেমলতা সত্যি অঘোরকামিনীর প্রাণপ্রিয় নাতনী। সাত সন্তানের জননী হয়েও পাঁচটি সন্তান শৈশবেই মারা গিয়েছে। বেঁচে শুধু বিন্দুবাসিনী আর হারান। সত্যি কথা বলতে কি, হেমলতা যেন অঘোরকামিনীর খেলার পুতুল। ছোটবেলায় হেমলতা দিদিমার কাছে এলে আব মা-র কাছে ফিরে যেতেও চাইতো না।

সেই আদরের স্নেহের হেমলতা বিয়ের বছর চারেকের মধ্যেই বিধবা হলো শুনে উনি সত্যি বড় আঘাত পেয়েছিলেন। দিনরাত্তির শুধু আপনমনে চোখের জল ফেলতেন। যাইহোক বেশ ক'বছর পর হেমলতাকে কাছে পেয়ে প্রথমে কিছুক্ষণ চোখের জল ফেলার পর অঘোরকামিনী বলেন, দ্যাখ হেম, জন্ম-মৃত্যু তো আমাদের হাতে না ; তাই এসব মেনে নিয়েই আমাদের বেঁচে থাকতে হবে।

দিদিমা, ওসব কথা আমি আর শুনতে চাই না। আগের মত তুমি আর আমি গলা জড়াজড়ি করে গল্প করলেই আমি ভাল থাকব।

হেমলতা মুহূর্তের জন্য থেমে একটু হেসে বলে, তাছাড়া ছোটমামা তো আছেই। তোমাদের কাছে থাকলে আমি সত্যি শান্তিতে থাকতে পারবো।

হ্যাঁ, হেম, তুই আমাদের কাছেই থাকবি। তুই এখানে থাকলে আমি আর হারুও আনন্দে থাকব। হাজার হোক ছোটবেলা থেকে তুই আর হারু তো একই সঙ্গে মানুষ হয়েছিস!

ছোটমামা ছাড়া তো আমার আর কোন বন্ধুই নেই।

হারুও তোর সঙ্গে যেমন প্রাণ খুলে মিশতে পারে, তেমন করে আর কারুর সঙ্গে মিশতে পারে না।

হ্যাঁ, দিদিমা, তা আমি জানি।

হেমলতা এক নিঃশ্বাসেই বলে, তবে দিদিমা, তোমাকে বলে দিচ্ছি, আমি কিন্তু দু'এক মাস থেকেই চলে যাবো না। আমি এখানেই থাকব। মাঝে মধ্যে দু'চারদিনের জন্য মার কাছ্ থেকে ঘুরে আসব।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, থাকবি ; তোকে যেতে বলছে কে?

হ্যাঁ, হেমলতা মামার বাড়িতেই থেকে যায়। দিনগুলো ভালই কাটে।

হেমলতা ঘুম থেকে উঠেই দেখে, ছোটমামার চান করা হয়ে গেছে। একটু পরেই শিবমন্দির যাবে।

ওকে দেখেই হারান একটু হেসে বলে, কিরে মহারানী, তোর ঘুম ভাঙলো? আর কিছুক্ষণ ঘুমোলে ভাল হতো না?

হেমলতাও একটু হেসে বলে, ছোট মামা, ভুলে যেও না, আমি অঘোরকামিনীর একমাত্র আদরের নাতনী! আমি যতক্ষণ ইচ্ছে ঘুমুলেও কেউ কিছু বলবে না।

অঘোরকামিনী কিছু না বললেও এই হারান চক্কোত্তি তো তোর পিঠে দুম দুম করে দু'চারটে ঘুষি লাগাতে পারে।

আমার পিঠে দুটো ঘুষি পড়লে হারান চক্কোত্তির পিঠে চার-ছ'টা ঘুষি পড়বে।

ওরা দু'জনেই এক সঙ্গে হেসে ওঠে।

না, হারান আর দেরি করে না। চিৎকার করে বলে, মা, আমি মন্দিরে যাচ্ছি।

অঘোরকামিনী দুর থেকেই বলেন, হ্যাঁ, আয়।

ষাট-একষট্টি বছর বয়স হলেও অঘোরকামিনী এখনও এক হাতে সংসারের কাজকর্ম করেন। তবে লালুর মা ঘরদোর পরিষ্কার করা, উঠোন নিকোনো, বাসন মাজা ছাড়াও গরুর দেখাশুনা করে।

হেমলতাও সব সময় দিদিমার পাশে পাশেই থাকে। তরকারি কেটেকুটে দেওয়া ছাড়াও মশলা বেটে দেয়।

অঘোরকামিনী বলেন, ওরে দিদি, তুই রোজ রোজ মশলা বেটে দিলে তোর হাত-পায় ব্যথা হবে।

হেমলতা একটু হেসে বলে, ও দিদিমা, কবিরাজ বরের জন্য একদিন অন্তরই এত লতা-পাতা বাটতে হতো যে তোমার রান্নার মশলা তো তার তুলনায় কিছুই না।

ঐসব লতা-পাতা তোর অন্য সতীনরা বাটতো না?

আমি আর মেজদি ঘুরে-ফিরে বাটাবাটি করতাম।

আর তোর বড় সতীন?

বড়দি তো রান্নাবান্না, সংসারের হাজার রকম দায়দায়িত্ব ছাড়াও বুড়ী শাশুড়ির সেবাযত্ন এক হাতে সামলাতেন।

তুই আর তোর মেজ সতীন রান্নাবান্না করতিস না?

না।

কেন?

বড়দি বলতেন, না, না, না, তোদের আর হাঁড়ি ঠেলতে হবে না।

মেয়েটিকে ভাল বলতে হবে।

ও দিদিমা, বড়দি যে কত ভাল, তা তুমি ভাবতেও পারবে না। বড়দি তো মেজদিকে ঠিক নিজের ছোট বোনের মত আর আমাকে তো মেয়ের মতই স্নেহ করেন।

বাঃ! খুব ভাল বলতে হবে।

তোর মেজ সতীন কি রকম?

হেমলতা এক গাল হেসে বলে, মেজদি যেমন হাসিখুশি সেইরকমই রসিক। নিজেও যখন তখন হাসে, অন্যদেরও না হাসিয়ে থাকতে পারে না।

তোর সঙ্গে ঝগড়া-টগড়া করে না?

কে আমার সঙ্গে ঝগড়া করবে?

তোর মেজ সতীন?

এ রাম! আমাদের সতীনদের মধ্যে কোনদিন একটি বারও ঝগড়া হয় নি।

খুব ভাল বলতে হবে ওদের দু'জনকে।

হেমলতা একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, আমাদের তিনজনেরই পোড়া কপাল ; তাই কবিরাজ চলে গেলেন। তা নয়তো আমরা তিনজনেই বেশ সুখে জীবন কাটাতে পারতাম।

হ্যাঁ, দিদি, ঠিকই বলেছিস।

হারান মন্দির থেকে ফিরে এলে ওরা তিনজনে এক সঙ্গে খেতে বসে। খাওয়া দাওয়ার পর ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করেই হারান আবার যায় মন্দিরের ওখানে মন্দিরের চালাতে বসে গ্রামের কয়েকজনের সঙ্গে দাবা খেলে। সন্ধের পর মন্দিরে আরতি শেষ করেই আবার বাড়ি ফেরে।

অঘোরকামিনী কোনকালেই দুপুরে ঘুমুতে পারেন না। আগে সারা দুপুর সেলাই করতেন এটা-ওটা। এখন কদাচিৎ কখনও শুধু কাঁথা সেলাই করেন। তা না হলে আশেপাশের বাড়ির কোন সমবয়সীর সঙ্গে গল্প করেন। তবে হেমলতা আসার পর থেকে ওর সঙ্গেই গল্প করে দুপুরবেলা কাটিয়ে দেন। সন্ধের আগেই হারানের রাতের খাবার ঠিক করে রাখেন। দুধও জ্বাল দিয়ে দেন।

সন্ধে ঘুরে যাবার পর অঘোরকামিনী আহ্নিক করার কিছুক্ষণ পরই উনি আর বসতে পারেন না। হাজার হোক সেই ভোরবেলায় ঘুম থেকে ওঠার পর তো আর এক মিনিটের জন্যও দু'চোখ বন্ধ করেন না। তাই সন্ধের কিছু পরই ওর ঘুম আসে।

উনি এক বাটি দুধ আর আফিমের একটা গুলি খেয়েই বলেন, হেম, আমি শুতে যাচ্ছি। তুই কখন খাবি?

যখন ছোট মামা খাবে, আমিও তখনই খাবো।

একটু বেশি করে খই নিয়ে পুরো দুধটুকু খাবি।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, খাবো। তোমার চিন্তা করতে হবে না।

তোর ঘুম পাচ্ছে না?

হেমলতা হাসতে হাসতে বলে, আমি কি তোমার মত আফিম খেয়েছি যে ঘুম পাবে?

ও না থেমেই বলে, একটু বেশি রাত না হলে আমার ঘুম আসে না। এখন আমি আর ছোটমামা প্রাণভরে গল্প করবো।

হ্যাঁ, তা কর কিন্তু দু'জনেই ঠিক খাওয়া-দাওয়া করিস।

অঘোরকামিনী কাঁথা গায় দিতে দিতে বলেন, তুই ঘরের দরজা বন্ধ করতে ভুলি

না।

না. না, ভুলব না।

অঘোরকামিনী শুয়ে পড়ার পরই হেমলতা হারানের ঘরে যায়।

আয় হেম।

হেম এসে পাশে বসতেই হারান বলে, মা শুয়ে পড়েছে নাকি?

হ্যাঁ, শুয়েছে।

হারান একটু হেসে বলে, সেই ভোরবেলায় পাখি ডাকাডাকি না করা পর্যন্ত মা'র ঘুম ভাঙ্গবে না।

আচ্ছা ছোটমামা, দিদিমা কি আগেও আফিম খেতো?

মা প্রায় দশ-বারো বছর আফিম খায় ; আর আফিম খায় বলেই মা ভাল আছে।

কিন্তু শুনেছি, আফিম খেলে মানুষ মরে যায়।

মা তো আফিম খায় ওষুধ হিসেবে আর কবিরাজের বলে দেওয়া হিসাব মত।

ও!

হারান ওর কোলের উপর মাথা দিয়ে শুয়ে পড়েই বলে, হেম, আমার মাথায় একটু হাত দিয়ে দে। চার বছর তুই আমার মাথায় গায় হাত দিয়ে দিস না।

তুমিও তো চার বছর আমার মাথায় গায় হাত দিয়ে দাও না।

তোকে কাছে পাই নি, তাই দিতে পারি নি।

হেম ওর মাথায় মুখে হাতে হাত বুলিয়ে দেয়।

হারান বলে, তুই গায়-মাথায় হাত দিলে যে কি ভাল লাগে।

সেই আগের মতই ভাল লাগছে?

তার চাইতে অনেক বেশি ভাল লাগছে।

সত্যি?

হ্যাঁ, সত্যি বলছি।

হেমলতা একটু ঝুঁকে পড়ে ওর মুখের সামনে মুখ নিয়ে বলে, অনেক দিন পর তোমার গায় হাত বুলিয়ে দিতে আমারও খুব ভাল লাগছে। মনে হচ্ছে আমরা যেন সেই পুরনো দিনে ফিরে গেছি।

হ্যাঁ, হেম, আমরা সেই পুরনো দিনের মতই হাসব, খেলব, মিশবো।

ছোটমামা, তা কি আর সম্ভব?

কেন সম্ভব না?

হারান না থেমেই বলে, তুই কি আমাকে ভালবাসিস না? আমাকে বন্ধু মনে করিস না?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তোমাকে ভালবাসি, তোমাকে বন্ধুও মনে করি।

আমি কি তোকে ভালবাসি না?

ভালবাসো বৈকি?

তবে আবার কি?

হারান দু'হাত ধরে ওর গলা জড়িয়ে মুখখানা ধরে ওকে একবার চুমু খায়।

আচ্ছা ছোটমামা, আমাকে তোমার চুমু খেতে ভাল লাগে?

খুব ভাল লাগে।

ও মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, হ্যাঁরে হেম, তোর কি খারাপ লাগলো?

আদর করলে, ভালবাসলে কি কারুর খারাপ লাগে?

হেমলতা সঙ্গে সঙ্গেই বলে, ছোটমামা তুমি এবার ওঠো। আমি আর বসে থাকতে পারছি না। পায় ব্যথা করছে।

হারান কোন কথা না বলে ওকে পাশে শুইয়ে দেয়।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর হেমলতা বলে, আমার বিয়ে না হলেই বেশ ভাল হতো। আমরা বেশ আগের মতই আনন্দে দিন কাটাতে পারতাম।

ওসব বিয়ের কথা ভুলে যা। আমরা ঠিক আগের মতই আনন্দে দিন কাটাবো

তাই কি সম্ভব?

কেন সম্ভব না?

আমার বয়স কুড়ি, তোমার বাইশ ; এখন কি আগের মত মেলামেশা সম্ভব?

হারান ওর গলা জড়িয়ে ধরে বলে, আমার কাছে তোর বয়স কোনদিন বাড়বে না, তোর কাছে আমারও বয়স বাড়বে না। আমরা আমরাই থাকবো।

হেমলতা ওর গলা জড়িয়ে বলে, ছোট মামা, তুমি কাছে থাকলে সত্যি আমার বয়স বাড়বে না।

ও সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসেই হারানের হাত ধরে টান দিয়ে বলে, চলো খেয়ে নিই অনেক রাত হয়েছে।

তুই আমাকে একবার চুমু খেলেই আমি উঠব। তুই চুমু না খেলে উঠব না।

হ্যাঁ, হেমলতা ওকে চুমু খেয়েই বলে, হয়েছে তো? এবার চলো।

এইভাবেই প্রায় মাসখানেক কেটে যায়। এর মধ্যে ওদের সম্পর্ক আরো সহজ আরো নিবিড় হয়।

কেমন যেন নেশা ধরে দু'জনেরই। দু'জনেই সারাদিন মনে মনে ব্যাকুল হয়ে থাকে অঘোরকামিনীর আফিম খাবার পরের কয়েক ঘণ্টার জন্য। দিন দিনই দু'জনে এগিয়ে যায় অবশ্যম্ভাবী পরিণতির দিকে।

তারপর?

দু'জনেই হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে মেতে ওঠে সর্বনাশা খেলায়।

পরিণতি?

যা হবার, তাই হলো।

হেমলতা কত কি ভাবে? ছোট মামাকে নিয়ে কোথাও পালিয়ে যাবে?

না, না, তা কি করে সম্ভব? মামার সঙ্গে ভাগ্নী পালিয়ে গেলে দিদিমা বা মা মুখ দেখাবে কি করে?

দিদিমার আফিম খাবে?

না, না, তাও ঠিক হবে না। অসুস্থ হবার পরই লোকজন কবিরাজ ডেকে আনবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেলেঙ্কারির কথা নিশ্চয়ই সবাই জেনে যাবে।

তবে কী করবে?

শেষ পর্যন্ত হেমলতা গলায় শাড়ির ফাঁস লাগিয়ে পিছনের বাগানের আমগাছের ডাল থেকে ঝুলে পড়ে।

সবাই জানলো, বৈধব্যের জ্বালা সহ্য করতে না পেরেই হেমলতা এইভাবে নিজেকে শেষ করলো।

অঘোরকামিনী জীবনে অনেক শোকতাপ পেয়েছেন। প্রতিবারই চোখের জল ফেলেছেন দিনের পর দিন ; কখনও কখনও মাসের পর মাস। কিন্তু এবার উনি এক ফোঁটা চোখের জলও ফেললেন না। একেবারে নীরব। মুখে তার কোন কথা নেই।

মাস দুয়েক পরের কথা।

অঘোরকামিনী হঠাৎ সন্ধের পর হারানের ঘরে এসে হাজির। ওঁর দু'চোখ দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে। হারান ওঁকে দেখেই মনে মনে কেঁদে ওঠে।

অঘোরকামিনী খুব জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, জ্যোতিষ ঠাকুরপো ঠিকই বলেছিলেন।

মুখে কোন কথা না বলে হারান ওঁর দিকে তাকাতেই উনি বলে যান, ঠাকুরপো বলেছিল, তোর অবৈধ সম্পর্কের জন্য মেয়েটির অপমৃত্যু হবে কিন্তু আমি স্বপ্নেও ভাবিনি, তুই তোর নিজের ভাগ্নীর সর্বনাশ করবি।

হারান মাথা নীচু করে থাকে।

অঘোরকামিনী ঘর থেকে বেরুবার আগে একটু বিদ্রূপের হাসি হেসে বলেন, চমৎকার।

উনি সেই রাত্রেই কৌটা ভর্তি আফিম খেয়ে শুয়ে পড়লেন ; অঘোরকামিনীর সে ঘুম আর ভাঙেনি।

এগারো

ভারতবর্ষের ইতিহাসে তখন মহা বিবর্তনের পালা চলছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অক্টোপাসের মত সমগ্র ভারতবর্ষকে গ্রাস করতে ঝড়ের বেগে এগিয়ে চলেছে। মহীশূর ও হায়দরাবাদের মুসলমান শাসকরা ইতিমধ্যেই কোম্পানির সেনাবাহিনীর কাছে পরাজিত হয়েছে : এর পর পতন হলো হিন্দুদের মারাঠা রাজ্য। বহুধা বিভক্ত রাজপুতরাও অধীনস্থ হলো কোম্পানির। লর্ড হেস্টিংস-এর আমল থেকেই দিল্লীর মোগল বাদশা কোম্পানির পেনসন ভোগী হয়ে দিল্লীর লালকেল্লায় প্রায় বন্দী জীবন যাপন করছেন। ১৮২৬-এ আসাম, ১৮৪৩-এ সিন্ধু, ১৮৪৯-এ পাঞ্জাব ও ১৮৪৯-এ নিম্ন ব্রহ্মদেশ কোম্পানির দখলে আসার ফলে ইংরেজ শাসনাধীনে এলো ব্রহ্মদেশ থেকে পেশোয়ার।

একদিকে যেমন নাটকীয়ভাবে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন চলছে, তখন অন্যদিকে সমাজ জীবনেও চলছে নাটকীয় বিবর্তনের যুগ।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃপক্ষ ভেবেছিলেন, ভারতবর্ষের অধিকাংশ মানুষকে খ্রীস্টধর্মে ধর্মান্তরিত করতে পারলে দেশ শাসন করা অনেক সহজ হবে। সুতরাং বিলেত থেকে আনাও পাদ্রীদের।

শত শত না, হাজার হাজার খ্রীস্টান মিশনারী বিলেত থেকে ভারতে এসে ছড়িয়ে পড়লেন উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিমে। সর্বত্র এদের এক দল রাস্তার মোড়ে-মোড়ে, হাট-বাজার থেকে কারাগারের অভ্যন্তরে ও সেনা ছাউনিতে পর্যন্ত মহান যীশুর বাণী প্রচার শুরু করলেন।

না, শুধু মহান যীশুর বাণী প্রচার করেই ওরা খুশি হতে পারলেন না। সঙ্গে সঙ্গে চলল হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে জঘন্য প্রচার। এই দুটি ধর্মই বর্বরোচিত কুসংস্কারে জর্জরিত। এই দুই ধর্ম কখনই মানুষের কল্যাণ করতে পারে না। একমাত্র ভগবান যীশুর খ্রীস্টান ধর্মই কোন অশিক্ষা কুশিক্ষা কুসংস্কারের প্রশ্রয় দেয় না। একমাত্র খ্রীস্টান ধর্মই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং অন্য সব ধর্মই ত্যাগ করা উচিত।

আর হ্যাঁ, শুধু খ্রীস্টান ধর্মই মানুষের মুক্তি আনতে পারে।

আর এক দল মিশনারী মেতে উঠলেন, ভারতবর্ষের মানুষকে আধুনিক শিক্ষা দিতে। দলে দলে ছেলেরা যোগ দিল এইসব পাদ্রীদের স্কুলে। শিক্ষক হিসেবে এইসব মিশনারীরা সত্যি ভাল ছিলেন কিন্তু ওরা স্কুলের কচি-কাঁচা বাচ্চাদের প্রতিদিন বাইবেল পড়াতেন, ভগবান যীশুর মহান জীবনী ও বাণী বলতেন।

সমাজের উপর পাদ্রীদের নিরন্তর খ্রীস্ট ধর্ম প্রচারের প্রভাব পড়তে দেরি হলো

না। বিশেষ করে হিন্দু কলেজের ডিরোজিওপন্থী কিছু ছাত্র মেতে উঠলেন খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করতে। এদের মধ্যে সবার আগে খ্রীস্টান হলেন কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় ও তাঁর সহপাঠী বন্ধু মহেশচন্দ্র ঘোষ।

বাংলা মহাভারতের স্রষ্টা কালীপ্রসন্ন সিংহের পিতামহ শান্তিরাম সিংহের সভাপণ্ডিত ছিলেন পণ্ডিত রামজয় বিদ্যাভূষণ ; এই বিদ্যাভূষণই ছিলেন কৃষ্ণমোহনের মাতামহ এবং এঁরই কলকাতার ঝামাপুকুর অঞ্চলের বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীটের বাড়িতে কৃষ্ণমোহনের জন্ম হয়। কৃষ্ণমোহনের বাবা জীবনকৃষ্ণ সপরিবারে শ্বশুরবাড়িতেই থাকতেন কিন্তু পরে ওখান থেকে চলে যান কাছাকাছি গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনের ভাড়াতে বাড়িতে।

জীবনকৃষ্ণ কুলীন বামুন হলেও বিশেষ লেখাপড়া জানতেন না ; আয় করতেন অতি সামান্য। সংসার চালাবার জন্য কৃষ্ণমোহনের গর্ভধারিণী শ্রীমতী দেবী চরকায় সুতা কেটে, নেটের দড়ি পাকিয়ে পৈতার সুতা তৈরি করে কিছু আয় করতেন। ছেলেকে স্কুলে পড়াবার ক্ষমতা ছিল না জীবনকৃষ্ণের কিন্তু কৃষ্ণমোহন লেখাপড়া করবেনই। শেষ পর্যন্ত এগিয়ে এলেন ভারতবন্ধু ডেভিড হেয়ার। হেয়ার তাঁর স্কুল সোসাইটির ঠনঠনিয়া কালীতলার পাঠশালায় কৃষ্ণমোহনকে ভর্তি করলেন।

কিছুদিনের মধ্যেই হেয়ার সাহেব কৃষ্ণমোহনের প্রতিভার পরিচয় পেয়ে তাঁকে স্কুল সোসাইটির স্কুলে (পরবর্তীকালে হেয়ার স্কুল) নিয়ে এলেন। তারপর হিন্দু কলেজ। তারপর একদিন এই কৃষ্ণমোহনই বাংলা নব্য যুবসমাজের এক অনন্য রত্ন বলে সর্বত্র পরিচিত হলেন। সুলেখক, সুবক্তা সুপণ্ডিত কৃষ্ণমোহন প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 'রিফরমার' পত্রিকার গোঁড়া হিন্দু ধর্ম প্রীতির প্রতিবাদে প্রকাশ করলেন 'এনকোয়ারার।'

এই 'এনকোয়ারার' পত্রিকায় কৃষ্ণমোহনের খ্রীস্টধর্ম গ্রহণের খবর বেরুতেই হিন্দু সমাজে শুরু হলো তীব্র আন্দোলন। নিন্দা ও সমালোচনার ঝড় উঠল দিকে দিকে। কিন্তু ডিরোজিওর প্রাণপ্রিয় ছাত্র ও শিষ্য কৃষ্ণমোহন বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করলেন। বিধাতার বিচিত্র পরিহাসে অভিন্নহৃদয় বন্ধু মহেশ খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করার বছরখানেকের মধ্যেই মারা গেলে কৃষ্ণমোহন প্রথম আচার্য হয়ে বন্ধুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করেন।

এই রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহনের জন্যই হেদুয়ার পাশে এক গির্জা তৈরি হলো। এই গির্জা প্রতিষ্ঠার পরই কৃষ্ণমোহন তাঁর ছোট ভাই কালীমোহনকে খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করেন। কয়েক বছর পর কৃষ্ণমোহন এই গির্জাতেই খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করলেন পাথুরিয়াঘাটার খ্যাতনামা প্রসন্নকুমার ঠাকুরের একমাত্র পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহনকে। এই

জ্ঞানেন্দ্রমোহনই বিয়ে করেন কৃষ্ণমোহনের কন্যা কমলমণিকে।

কৃষ্ণমোহনের পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর 'সর্বার্থ সংগ্রহ' নামে জ্ঞানগর্ভ মহা-কোষ রচনায়। ভারতীয় ভাষায় এইটিই প্রথম এনসাইক্লোপিডিয়া। হিন্দু ষড়দর্শন সম্পর্কে কৃষ্ণমোহনের গবেষণা ও 'আর্যশাস্ত্রের শিক্ষা' তৎকালীন পণ্ডিত সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। পাণ্ডিত্যের জন্য কৃষ্ণমোহনকে সাম্মানিক ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। উনি আরো কত সম্মান পেয়েছেন। সনাতন হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে খ্রীস্টান হলেও এই উদার মহৎ প্রাণ, বিদ্বেষহীন পণ্ডিত কৃষ্ণমোহন সমাজের আপামর সাধারণের পরম শ্রদ্ধেয় ছিলেন।

ডিরোজিওর আরেক প্রাণপ্রিয় ছাত্র ও শিষ্য রামগোপাল ঘোষ ছিলেন এক বিস্ময়কর পুরুষ। না, ইনি খ্রীস্টান হননি। তবে চির প্রতিবাদী এক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে তখনকার সমাজে সমাদৃত হতেন।

এই দেশের রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টির পিছনেও আবার সেই দ্বারকানাথ। ১৮৪২ সালে বিলেত থেকে দেশে ফেরার সময় সঙ্গে নিয়ে এলেন এক অসাধারণ রাজনৈতিক বক্তা ও মানব দরদী জর্জ টমসনকে।

যৌবনেই টমসন বিলাতে দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন শুরু করেন। দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধেই আন্দোলন করার জন্য ইনি পরে যান আমেরিকায়। তারপর আবার ফিরে এলেন বিলাতে। পরিচয় হলো দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে। তাঁরই অনুরোধে ও আমন্ত্রণে ভারতবাসীকে রাজনীতিচর্চায় উৎসাহিত করতে টমসন এলেন কলকাতায়। দ্বারকানাথের উদ্যোগেই টমসন পরিচিত হলেন ডিরোজিওর একদল ছাত্র ও শিষ্যের সঙ্গে।

কলকাতায় আসার কিছুদিনের মধ্যেই টমসন গর্জে উঠলেন সরকারের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে। টমসনের অগ্নিগর্ভ ভাষণ শুনে চমকে উঠলো ইংরেজরা আর আনন্দে খুশিতে অনুপ্রাণিত হয় ডিরোজিওর শিষ্যরা। এই জর্জ টমসনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই রামগোপাল অবতীর্ণ হলেন রাজনৈতিক মঞ্চে।

রামগোপাল বার বার ইংরেজদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছেন। সমাজ-কল্যাণের ক্ষেত্রে ইংরেজরা যখনই বাধা দিয়েছে, তখনই রামগোপালের অগ্নিগর্ভ ভাষণে যেসব বাধা দূর হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে। কাশিমবাজারের মহারাজা কৃষ্ণনাথ মেডিক্যাল কলেজে এক সভার আয়োজন করলেন মহাত্মা হেয়ারের স্মৃতিরক্ষার বিষয়ে আলোচনার জন্য। ঐ সভায় প্রস্তাব উঠলো, হেয়ারের মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হোক।

এই প্রস্তাব শুনেই প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠলেন সমস্ত ইংরেজরা। ওদের সবারই বক্তব্য, হেয়ার এমন কোন মহাপুরুষ নন যে কলকাতা মহানগরীতে তার মর্মরমূর্তি

প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

রামগোপাল ঘোষ বললেন, হোয়াট? হেয়ার মহাপুরুষ নন?

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, ইয়েস টু ইউ কিন্তু আমাদের কাছে উনি ছিলেন জীবন্ত দেবতা, ছাত্রদের অকৃত্রিম বন্ধু, অসহায়ের সহায় ও সর্বোপরি ভারতবন্ধু, ভারত-হিতৈষী, মানব-প্রেমিক।

হাততালিতে ফেটে পড়লো সভাগৃহ। ইংরেজরা চুপ।

রামগোপাল বলে যান, গোঁড়া কূপমণ্ডুক খ্রীস্টান ধর্মযাজকরা এই মহামানবের মরদেহ খ্রীস্টানদের কারখানায় কবর দিতে দেয়নি। এই মহাত্মা মহামানবের মরদেহ হিন্দু কলেজের প্রাঙ্গণে পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে তা এক তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

আবার হাততালি।

উনি বলে যান, মহাত্মা হেয়ারের মর্মরমূর্তি অবশ্যই এই শহরে প্রতিষ্ঠিত হবে হেয়ার সাহেবের পুণ্য পবিত্র সান্নিধ্য-ধন্য শিষ্যদের অর্থে। আমি এক মাসের সম্পূর্ণ আয় এর জন্য দান করে ধন্য হতে চাই। আশা করি এই মহাত্মার অন্য শিষ্যরাও যথোচিত অর্থসাহায্য করে জীবনদেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাবেন।

হেয়ারের শত শত শিষ্য করতালিতে সমর্থন জানালেন এই প্রস্তাবকে।

হ্যাঁ, এই ভাবেই সংস্কৃত কলেজের প্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠিত হয় এই মহাত্মার পূর্ণাবয়ব মর্মরমূর্তি। পরে সংস্কৃত কলেজ ভবনের সম্প্রসারণের সময় এই মূর্তি স্থানান্তরিত হয় হেয়ার স্কুল ও প্রেসিডেন্সী কলেজের মধ্যবর্তী প্রাঙ্গণে।

টমসন সাহেব কলকাতার প্রতিটি জনসভায় শ্রোতাদের বার বার স্মরণ করিয়ে দেন, যখনই সরকারের কোন সিদ্ধান্ত ভারতবাসীর স্বার্থ বিরোধী মনে হবে, তখনই প্রতিবাদ করতে দ্বিধা করবেন না এবং প্রতিবাদ জানাতে হবে সমবেতভাবে। ভারতবাসীকে সংগঠন গড়ে তুলতে হবে এবং এই সংগঠনের মাধ্যমেই সরকারকে আপনাদের বক্তব্য জানাতে হবে ; তা না হলে, সরকার আপনাদের কথায় কর্ণপাতও করবে না।

টমসন সাহেব কলকাতার প্রতিটি জনসভায় মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন, ভুলে যাবেন না, আপনারা নীরব থাকলে ইংরেজ সরকার স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠবেই এবং সরকার নানাভাবে আপনাদের নিপীড়ন করতে উৎসাহী হবে।

এই টমসন সাহেবের অনুপ্রেরণাতেই রামগোপাল ঘোষের মত উৎসাহীরা প্রতিষ্ঠা করেন ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি।

তখন আরো কত কি ঘটে।

রাজা রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুরের মত কয়েকজন অভাবনীয় দূরদর্শিতাসম্পন্ন ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় ডেভিড হেয়ার যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন, তার ঢেউ ছড়িয়ে পড়েছে দেশের দিকে দিকে। ছেলেদের আধুনিক শিক্ষা দেবার জন্য স্কুল হয়েছে বহু শহর-নগর গ্রাম-গঞ্জে। শুধু গণ্য-মান্য-বরেণ্যরা না। সাধারণ দেশবাসীও উৎসাহী হয়ে উঠেছে ছেলেদের আধুনিক শিক্ষা দিতে।

কিন্তু স্ত্রী শিক্ষা?

না, না, অসম্ভব। লেখাপড়া শেখা মেয়েদের স্বামীরা কখনই দীর্ঘজীবী হবে না ; তাদের অকালমৃত্যু হবে।

পুরুষ-শাসিত সমাজে তখন আরো কত কুসংস্কার।

সুদূর অতীত থেকে বৌদ্ধযুগ পর্যন্ত জীবনের সর্বক্ষেত্রে মেয়েরা পুরুষদের সমান অধিকার ভোগ করেছে কিন্তু সব কিছু বদলে গেল ভিন দেশের মুসলমান দস্যু ও গোষ্ঠীদের পুনঃ পুনঃ আক্রমণ ও দেশ দখলের সময়। আলাউদ্দীন খিলজী তো চিতোরের রাণা রতন সিং-এর অসামান্য সুন্দরী স্ত্রী পদ্মিনীকে উপভোগ করার জন্যই বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে চিতোর আক্রমণ করেন।

শুধু পদ্মিনী না, চিতোরের অন্যান্য মহিলারাও জানতেন, আলাউদ্দিন খিলজীর সৈন্যবাহিনী তাদেরও চরম সর্বনাশ করতে কৃতসঙ্কল্প। তাইতো শুধু পদ্মিনী না, চিতোরের অন্যান্য মহিলারাও 'জহর ব্রত' অনুসারে জ্বলন্ত চিতার আগুনে আত্মাহুতি দিয়ে নিজেদের সম্মান রক্ষা করেন।

কিন্তু ভারতের সব নারীই তো বাঘিনী ছিলেন না। তাইতো দেশের লক্ষ লক্ষ নিরীহ অসহায় নারীর চরম সর্বনাশ হলো আক্রমণকারী বিভিন্ন মুসলমান গোষ্ঠীর সৈন্যবাহিনীর কৃপায়।

ব্যস! সঙ্গে সঙ্গে সমাজের রীতি-নীতি চিন্তা-ভাবনাই বদলে গেল। ঘরের মধ্যে বন্দিনী হলেন দেশের মেয়েরা। বন্ধ হলো লেখাপড়া শেখানো।

শুধু কি তাই?

খবরদার কেউ যেন মুখ দেখতে না পায়। মাথায় ঘোমটা দাও।

দিনের আলোয় বিয়ে?

না, না, আর দিনের আলোয় বিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না। দিনের আলোয় বিয়ে দিতে গেলেই দস্যুরা নিশ্চয়ই মেয়েটিকে লুঠ করে নিয়ে যাবে।

চালু হলো রাতের অন্ধকারে বিয়ে দেবার প্রথা।

আরো কত কি!

অন্ধকারে ডুবে গেল নারীসমাজ। তবে এই অন্ধকারের মধ্যেও মাঝে মাঝে

স্ফুলিঙ্গের মত এক একজন অসামান্যা নারীর আত্মপ্রকাশ হয়েছে।

বাঙালি বামুনের ঘরের মেয়ে 'হটি' ঘর-সংসারের কাজকর্ম সামলে অবসর সময় পড়াশুনা করে অসামান্য পাণ্ডিত্য অর্জন করে হলেন হটি বিদ্যালঙ্কার। ইনি কাশীতে টোল খুলে বহু ছাত্রকে পড়ানো ছাড়াও বিভিন্ন বিচারসভায় খ্যাতনামা পণ্ডিতদের পরাজিত করে বিখ্যাত হয়েছেন। ফরিদপুর কোটালীপাড়ার এক বৈদিক ব্রাহ্মণের স্ত্রী শ্যামাসুন্দরী ব্যাকরণ থেকে ন্যায়শাস্ত্র পর্যন্ত পাণ্ডিত্য অর্জন করে খ্যাতিলাভ করেছেন সমগ্র বঙ্গদেশে।

এই অন্ধকার যুগেও নাটোরের রানী ভবানী শুধু অপ্রত্যাশিত দক্ষতায় জমিদারী পরিচালনা করেন নি, মানুষ ও সমাজের কল্যাণে মুক্তহস্তে দান করেছেন লক্ষ লক্ষ টাকা। কাশীর বাঙালিটোলার প্রতিটি বাড়িই তো রানী ভবানী দান করেছিলেন এক একজন ব্রাহ্মণকে।

তবে এইসব তো নেহাতই ব্যতিক্রম। সামগ্রিকভাবে নারী সমাজের অবস্থা তখন বড়ই করুণ, বেদনাদায়ক। মেয়েরা তখন পুরুষদের দাসী, কামনা-বাসনা মেটাবার পাত্রী। আর কিছু না।

নারী সমাজের দুঃখ-কষ্ট ব্যথা-বেদনা ও সর্বোপরি পুরুষদের অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি দেবার জন্যই রাজা রামমোহনের প্রথম পদক্ষেপ ছিল সতীদাহ বন্ধ করার আন্দোলন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি চেয়েছিলেন, মেয়েরা লেখাপড়া না শিখলে নিজেদের মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবে না।

হেয়ার সাহেবের উদ্যোগে ছেলেদের আধুনিক শিক্ষা দেবার জন্য স্কুল সোসাইটি প্রতিষ্ঠার সময়ই মেয়েদের পড়াবার ব্যবস্থা করেন। এর কিছু আগে-পরে কলকাতার কিছু ইংরেজ মহিলার উদ্যোগে মেয়েদের জন্য কয়েকটি স্কুল খোলা হয়।

তবে এইসব বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টায় নারী সমাজের অবস্থার কোন পরিবর্তন হলো না।

এদিকে ১৮২৯ সালের ১ লা জুন বীরসিংহের যে ন'বছরের বালক ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণ শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিলেন, তারপর দামোদর ও গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে।

ঈশ্বরচন্দ্রের দেহটি ছিল নেহাতই ছোটখাটো ; তবে মাথাটি ছিল বিরাট। সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণের অধ্যাপক গঙ্গাধর তর্কবাগীশ এই অদ্ভুত চেহারার ছেলেটিকে কয়েকদিন পড়াবার পরই বুঝলেন, এমন মেধা ও স্মরণশক্তি সত্যি দুর্লভ। ছ'মাস পরই ঈশ্বরচন্দ্র প্রথম পরীক্ষা দিলেন ও অসামান্য ভাল ফল করে মাসিক পাঁচ টাকা

বৃত্তি লাভ করেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনে সে এক বিচিত্র সংগ্রামের সময়। পিতা ঠাকুরদাস যা আ করতেন, তা দিয়ে বীরসিংহের সংসার চালিয়ে সামান্য কয়েকটি টাকা হাতে থাকতো। সে টাকায় পিতা-পুত্রের দু'বেলা দু'মুঠো অন্নের ব্যবস্থা কিছুতেই হয় না সুতরাং অনাহার-অর্ধাহার ছিল ঈশ্বরচন্দ্রের নিত্য সঙ্গী। সে সময় ঈশ্বরচন্দ্র কদাচি কখনও পেট ভরে খাবার সুযোগ পেয়েছেন।

একদিকে এই দুঃসহনীয় দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম, অন্য দিকে দিবা-রা জ্ঞানার্জনের অবিশ্বাস্য কঠোর তপস্যা। পিতা ঠাকুরদাসই প্রতিদিন সকাে ঈশ্বরচন্দ্রকে কলেজে পৌঁছে দেন ও ছুটির পর তাঁকে নিয়ে আসেন। কলেজে আসা যাওয়ার পথেই ঈশ্বরচন্দ্রকে দৈনন্দিন পড়াশুনার পরীক্ষা দিতে হতো পিতার কাছে এইরকম পরীক্ষা দিতে দিতেই ঈশ্বরচন্দ্র বুঝতে পারেন, তাঁর পিতাও কলেজে তর্কবাগীশ মশায়ের মত ব্যাকরণে পণ্ডিত।

কলেজ থেকে বাড়ি ফিরেও ঈশ্বরচন্দ্রকে সংসারের অনেক কাজকর্ম করার পর পড়তে বসতে হতো। পড়াশুনা চলতো মধ্যরাত্রি পর্যন্ত। তবে কদাচিৎ কখন ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লেই কপালে জুটতো প্রচণ্ড প্রহার।

ঠাকুরদাস যখনই ছেলেকে মারতেন, তখনই ছুটে আসতেন গৃহস্বামী ভাগব চরণ সিংহের বিধবা কন্যা রাইমণি।

রাইমণি কাঁদতে কাঁদতে ঠাকুরদাসকে বলতেন, দোহাই পণ্ডিতমশাই, ঈশ্বরে এভাবে চোরের মার মারবেন না। আমি সহ্য করতে পারি না। তাছাড়া এইটু শিশুকে কেউ এভাবে মারে?

কখনও কখনও রাইমণি তো ঠাকুরদাসকে বলতেন, পণ্ডিতমশাই, আপ ঈশ্বরকে নিয়ে অন্য কোথাও চলে যান। আমি ওর কান্না সহ্য করতে পারি না ঈশ্বরকে আমি পেটে ধরিনি কিন্তু ভুলে যাবেন না, ওকে আমি নিজের সন্তানের মত স্নেহ করি।

ঈশ্বরচন্দ্র ঘুমিয়ে না পড়ার জন্য প্রদীপের তেল চোখে দিয়ে গভীর রাত পর্য পড়াশুনা করতেন।

এই তপস্যা। এই সাধনা কি ব্যর্থ হতে পারে?

এই বিস্ময়কর প্রতিভাসম্পন্ন বালক মাত্র দশ বছরের মধ্যে ব্যাকরণ, কাব অলঙ্কার, বেদান্ত, স্মৃতি, ন্যায় ও জ্যোতিষের উপাধি লাভ করেন অসামান্য কৃতিত্বে সঙ্গে। শুধু তাই নয়। সংস্কৃত কলেজের সমস্ত বিভাগীয় অধ্যাপকবৃন্দ এই অভাবনী প্রতিভাসম্পন্ন ছাত্রকে বিদ্যাসাগর উপাধিতে ভূষিত করেন।

সে সময় জেলা জজদের আদালতে এক একজন জজ-পণ্ডিত থাকতেন। প্রয়োজনে মামলা-মোকদ্দমার সময় হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী বিধান দেওয়া ছিল তাঁদের কাজ কিন্তু এই কাজ পাবার জন্য বিশিষ্ট পণ্ডিতদেরও হিন্দু ল কমিটির পরীক্ষায় পাশ করতে হতো। ঈশ্বরচন্দ্র সে পরীক্ষাতেও সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন। এই পরীক্ষার প্রশংসা পত্রে ঈশ্বরচন্দ্রকে বিদ্যাসাগর বলেই উল্লেখ করা হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র যখন সংস্কৃত কলেজে ন্যায় ও দর্শন শাস্ত্রের ছাত্র, তখনই তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় এবং তা সংস্কৃত কলেজেরই ব্যাকরণের অধ্যাপকরূপে ; তবে তা ছিল মাত্র দু'মাসের জন্য। এই দু'মাসের জন্য আশি টাকা মাইনে পেয়েই ঈশ্বরচন্দ্র সে টাকা ঠাকুরদাসের হাতে দিয়ে বলেন, বাবা, আপনি তীর্থ ঘুরে আসুন।

মুগ্ধ ঠাকুরদাস ঐ টাকা ব্যয় করে গয়া গিয়ে স্বর্গত পিতার পিণ্ডদান করেন।

গয়া থেকে ফিরে এসেই ঠাকুরদাস শুনলেন তাঁর প্রাণপ্রিয় ঈশ্বর দর্শনশাস্ত্রের পরীক্ষায় সর্বশ্রেষ্ঠ হয়ে এক শ' টাকা, সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতা রচনার জন্য একশ টাকা, আইন পরীক্ষার পুরস্কার পঁচিশ টাকা ও ভাল হাতের লেখার জন্য আট টাকা পুরস্কার লাভ করেছেন। ঈশ্বরচন্দ্র পুরস্কারের সব টাকা ঠাকুরদাসকে দিয়ে বললেন, বাবা, এই টাকা দিয়ে আপনি দেনা শোধ করুন।

সে সময় কোন একটা বিশেষ বিষয়ে অনেকেই ঈশ্বরচন্দ্রের চাইতে বেশি জ্ঞানী ছিলেন কিন্তু সর্ব বিষযে পাণ্ডিত্য ছিল শুধু ঈশ্বরচন্দ্রেরই এবং সেজন্যই তাঁকে বিদ্যাসাগর উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

এই অসাধারণ মেধাবী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের খবর শুনেই ত্রিপুরার মহারাজাধিরাজ তাঁকে তাঁর রাজ্যের জজ্-পণ্ডিতের পদ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানান কিন্তু ঠাকুরদাস ছেলেকে অত দূরে যেতে দিলেন না। ঈশ্বরচন্দ্র কিছুদিন মায়েব কাছে থাকার জন্য কলকাতা থেকে বীরসিংহ চলে গেলেন।

ইতিমধ্যে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হেড পণ্ডিত মধুসূদন তর্কলঙ্কার মশায়ের মৃত্যু হয়। অনেকেই এই পদে কাজ করতে লালায়িত থাকলেও কলেজের অধ্যক্ষ মার্শাল সাহেব মনে মনে জানতেন, এই পদেব জন্য ঈশ্বরচন্দ্রের চাইতে উপযুক্ত আর কেউ নেই।

মার্শাল সাহেব এর আগে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং তিনি খুব ভাল করেই জানতেন, ঈশ্বরচন্দ্র কি অসাধারণ মেধাবী, দুর্দমনীয় অধ্যবসায়ী, কঠোর পরিশ্রমী ও সর্বোপরি ন্যায়নিষ্ঠ।

মার্শাল সাহেব সংস্কৃত কলেজে গিয়ে জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের কাছে ঈশ্বরচন্দ্রের খোঁজ করতেই জানলেন, তিনি দেশে মায়ের কাছে গিয়েছেন।

মার্শাল সাহেব তর্কপঞ্চাননের দু'টি হাত ধরে বললেন, পণ্ডিতমশাই, আপনি যেভাবেই হোক ঈশ্বরকে খবর দিন, অবিলম্বে আমার সঙ্গে দেখা করতে। আমি ঈশ্বর ছাড়া অন্য কাউকে প্রধান পণ্ডিতের পদ দিতে পারব না।

তর্কপঞ্চানন সঙ্গে সঙ্গে খবর দিলেন ঠাকুরদাসকে। ব্যস! সঙ্গে সঙ্গেই ঠাকুরদাস ছুটলেন বীরসিংহ থেকে ছেলেকে কলকাতা আনার জন্য।

মাসিক পঞ্চাশ টাকা মাইনেতে ঈশ্বরচন্দ্র ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান পণ্ডিত নিযুক্ত হলেন।

ঠাকুরদাস তখন সারা মাস অক্লান্ত পরিশ্রম করে আয় করেন দশ টাকা।

এই চাকরি পেয়েই ঈশ্বরচন্দ্র ঠাকুরদাসকে বললেন। আপনি সারাজীবন অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন। এবার দয়া করে আপনি বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম করুন আমি প্রত্যেক মাসে আপনাকে কুড়ি টাকা পাঠাব।

ঠাকুরদাস প্রথমে রাজি না হলেও ঈশ্বরচন্দ্রের পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত চাকরি ছেড়ে বীরসিংহ যান।

ঈশ্বরচন্দ্রের কলকাতার বাসায় তখন আপন তিন ছোট ভাই, পাঁচজন খুড়তুতো পিসতুতো-মাসতুতো ভাই আর পুরনো চাকর শ্রীরাম। মাসিক তিরিশ টাকায় ঈশ্বরচন্দ্র এই ন'জনের সংসার চালাতে শুরু করলেন।

এরই মধ্যে শুরু হয় ঈশ্বরচন্দ্রের ইংরেজি শিক্ষা ও ইংরেজি সাহিত্যচর্চা।

পরবর্তীকালে এই বিস্ময়কর মেধাসম্পন্ন ঈশ্বরচন্দ্রের নীরবে ইংরেজি শিক্ষার পরিচয় পেয়ে সবাই স্তম্ভিত হয়েছেন। মুগ্ধ হয়েছেন তাঁর অপূর্ব ইংরেজি হাতের লেখা দেখে।

এই সময় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে কেরানীর একটা পদ খালি হতেই ঈশ্বরচন্দ্রের চেষ্টায় তাঁর বন্ধু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ চাকরিটি পেলেন। কিছুদিন পরে ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর বন্ধুকে বললেন, দুর্গাচরণ, এই কেরানীর চাকরি করতে করতেই আপনি মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসা বিদ্যা পড়তে শুরু করুন।

হ্যাঁ, বন্ধুর অনুরোধেই দুর্গাচরণ মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হলেন ও শেষ পর্যন্ত ডাক্তার হয়ে যথেষ্ট খ্যাতি ও অর্থ উপার্জন করেন। এই দুর্গাচরণের ছেলেই রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এরই মধ্যে প্রেসিডেন্সী কলেজের সংস্কৃতের ভূতপূর্ব অধ্যাপক রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় অবসর সময়ে ঈশ্বরচন্দ্রের কাছে সংস্কৃত পড়তে শুরু করেন। এই রাজকৃষ্ণকে পড়াবার সময়ই ঈশ্বরচন্দ্র বুঝতে পারলেন তিনি যে পদ্ধতিতে পড়াশুনা করেছেন, তা এইসব ছাত্রদের পক্ষে উপযুক্ত না। উনি নিজস্ব পদ্ধতিতে রাজকৃষ্ণকে

পড়াতে শুরু করেন। রাজকৃষ্ণকে পড়াবার অভিজ্ঞতা থেকেই ঈশ্বরচন্দ্র কয়েক বছব পর 'উপক্রমণিকা ও 'ব্যাকরণ কৌমুদী' রচনা করেন।

যাইহোক, বছর পাঁচেক ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে প্রধান পণ্ডিতের কাজ করার পরই ঈশ্বরচন্দ্র কলেজের সহকারী সেক্রেটারী হলেন কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই মতভেদ হলো অধ্যক্ষ রসময় দত্ত'র সঙ্গে। ঈশ্বরচন্দ্র কালবিলম্ব না করে পদত্যাগ করলেন ; তবে পরম শুভাকাঙ্ক্ষী মার্শাল সাহেবের একান্ত অনুরোধে মাসিক আশি টাকা মাইনেতে কলেজের কেরানীর পদ গ্রহণ করলেন।

কিছুদিনের মধ্যেই ঈশ্বরচন্দ্রের বিশেষ বন্ধু মদনমোহন তর্কলঙ্কার সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপক পদ ছেড়ে মুর্শিদাবাদের জজ পণ্ডিত হতেই এডুকেশন কাউন্সিলের সভাপতি ডন ইলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের অনুরোধে ঈশ্বরচন্দ্র ঐ শূন্য পদে যোগদান করলেন। বছরখানেক ঘুরতে না ঘুরতেই তিরিশ বছরের যুবক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন।

আগে শুধু ব্রাহ্মণ আর বৈদ্যরাই সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হতে পারতো। ঈশ্বরচন্দ্র অধ্যক্ষ হয়েই কলেজের দরজা খুলে দিলেন সবার জন্য। সংস্কৃত শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই চালু করলেন ইংরেজি শিক্ষা। গরমের সময় দু'মাস কলেজ ছুটির ব্যবস্থাও প্রবর্তন করলেন ঈশ্বরচন্দ্র এবং তারপর আস্তে আস্তে সারা দেশের সমস্ত স্কুল-কলেজেই গবমেব ছুটি দেবাব প্রথা চালু হয়। আবো কত কি।

ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হয়েই দেখলেন, ছাত্ররা ঠিক সময় কলেজে এলেও অধ্যপকরা না আসায় পড়াশুনা হয় না। তাঁরা ইচ্ছেমত আসা-যাওয়া করেন। ঈশ্বরচন্দ্র ঠিক করলেন, এই অবস্থা চলতে পারে না। অধ্যাপকরা তো মাইনে পান ; তবে কেন তাঁরা ঠিক সময় কলেজে আসবেন না?

ঈশ্বরচন্দ্র কলেজ শুরু হতেই প্রত্যেক বিভাগ ঘুরে ঘুরে দেখেন। অধ্যাপক না এলে নিজেই ছাত্রদের পড়ান। তারপর কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন।

ঈশ্বরচন্দ্রকে কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই ওঁরই পুরনো অধ্যাপকরা বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেন, কী ব্যাপার ঈশ্বর? তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছো কেন?

আপনারা আসেন নি বলে ছাত্রদের পড়াশুনার ক্ষতি হচ্ছে। তাই দেখছি, আপনারা কে কত দেরিতে আসেন।

প্রবীণ অধ্যাপকরা মাথা হেঁট করে কলেজে ঢোকেন। পরের দিন থেকে অধ্যাপকরা আর দেরিতে আসেন না। এইভাবেই ঈশ্বরচন্দ্র কলেজের সর্বস্তরে নিয়মানুবর্তিতা চালু করেন।

এই সময় বেথুনের উদ্যোগেই শিক্ষাবিভাগে ইন্সপেক্টরের পদ সৃষ্টি হয় স্কুলের

শিক্ষাব্যবস্থা প্রত্যক্ষভাবে দেখাশুনা করার জন্য। ঈশ্বরচন্দ্র নিযুক্ত হলেন নদীয়া-হুগলী-বর্ধমান ও মেদিনীপুরের ইন্সপেক্টর। একদিকে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের কাজ, অন্যদিকে চারটি জেলায় ঘুরে ঘুরে স্কুলগুলি দেখাশুনার দায়িত্ব। ঈশ্বরচন্দ্রকে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয় কিন্তু দায়িত্ব-কর্তব্যে ফাঁকি দেওয়া তো ওঁর চরিত্রে নেই।

এরই মধ্যে আরো কত কি ঘটে গেছে দেশে।

দ্বারকানাথ দেবেন্দ্রনাথকে রামমোহনের স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। রামমোহন নিজেও মাঝে মাঝে ছাত্রদের পড়াতেন। সেই কচি বয়সেই দেবেন্দ্রনাথের মনে বিস্ময়কর প্রভাব পড়ে রামমোহনের। পিতামহী অলকাসুন্দরীর একান্ত স্নেহধন্য দেবেন্দ্রনাথ তাঁরই প্রভাবে সনাতন হিন্দু ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকলেও যৌবনে তিনি উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন।

ঠাকুরবাড়ির প্রথা মত দেবেন্দ্রনাথ রোজ সকালে দ্বারকানাথকে প্রণাম করেই আসতেন বৈঠকখানায়। তখন দেওয়ানজী ও কর্মচারীবা টাকার তোড়া ভাগ করেন নানা দায়-দায়িত্ব খরচপত্তরের জন্য।

সৌখীন দেবেন্দ্রনাথ হরকরাকে হুকুম করেন, দুটো তোড়া সঙ্গে নিয়ে আয়।

হরকরা সঙ্গে সঙ্গে দু' তোড়া টাকা নিয়ে দেবেন্দ্রনাথের পিছন পিছন যায়।

দেওয়ানজী কিছু বলতে পারেন না। স্বয়ং বড়কর্তার বড় ছেলেকে উনি কিছু বলতে সাহস করেন না। তবে দ্বারকানাথ হিসেব নেবার সময় দুটি তোড়া কম দেখেই প্রশ্ন করেন। দুটো তোড়া কম কেন?

দেওয়ানজী হাত কচলাতে কচলাতে বলেন, আজ্ঞে বড় দাদাবাবু...

দ্বারকানাথ শুধু বলেন, ও আচ্ছা!

প্রথম যৌবনে এ হেন উচ্ছৃঙ্খল সৌখীন বিলাসব্যসনে মত্ত দেবেন্দ্রনাথ পিতামহীর মৃত্যুর পর বিস্ময়করভাবে বদলে গেলেন। মৃতপ্রায় ব্রাহ্ম সমাজে জোয়ার আনলেন দেবেন্দ্রনাথ। ব্রাহ্ম সমাজকে রূপান্তরিত করলেন ব্রাহ্ম ধর্মে এবং ১৮৪৩ সালের ২৩ শে ডিসেম্বর বাংলা ৭ই পৌষ জনা কুড়ি আত্মীয়-বন্ধুর সঙ্গে ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করলেন। এদের মধ্যে অক্ষয়কুমার দত্ত ও নিজের ছোট ভাই গিরীন্দ্রনাথও ছিলেন।

শুধু তাই না। বাঙালির ঘরে ঘরে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেবার জন্য প্রকাশ করলেন 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা এবং দেবেন্দ্রনাথ নিজেই তার অধ্যক্ষ হলেন। সম্পাদক হলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। 'তত্ত্ববোধিনী'তে থাকতো সাহিত্য, দর্শন,

ইতিহাস, বিজ্ঞান, পুরাতত্ত্ব, মহাপুরুষের জীবনী ও আরো কত কি। গুণী-জ্ঞানী লেখকদের অন্যতম ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

তখন বাংলা ভাষায় কয়েকটি সংবাদপত্র প্রকাশিত হলেও 'তত্ত্ববোধিনী'ই বাংলা ভাষার প্রথম সাময়িক পত্রিকা।

তখন খ্রীস্টান মিশনারীরা প্রায় উন্মাদ হয়ে উঠেছে হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করার জন্য। এই মিশনারীরা হিন্দুধর্মকে হেয় করে, তার বিষয়ে কুৎসা প্রচার করে সাধারণ মানুষকে খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করতে পরামর্শ দিতো। তাছাড়া ওরা নব্য ইংরেজি শিক্ষিতদের উৎসাহ দিতো খ্রীস্টান হবার জন্য। এইসব প্রচারের ফলেই হিন্দু কলেজে পড়ার সময়ই যশোর সাগরদাঁড়ির মধুসূদন দত্ত খ্রীস্টান ধর্ম ও মাইকেল নাম গ্রহণ করলেন।

এইসময় একটা অঘটন ঘটে।

রাজেন সরকার ছিলেন দেবেন্দ্রনাথের এক কর্মচারী। একদিন রাজেন সরকার বাড়ি থেকে ছুটতে ছুটতে এসে দেবেন্দ্রনাথের পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলেন, বড় দাদামশাই, সর্বনাশ হয়েছে।

রাজেন, অত অধৈর্য না হয়ে কি হয়েছে, তাই বলো।

বড় দাদামশাই, আমার স্ত্রী আমার ছোট ভাইয়ের স্ত্রীকে নিয়ে গাড়িতে এক আত্মীয় বাড়িতে যাচ্ছিল নেমন্তন্ন রক্ষা করতে। আমার ছোট ভাই উমেশ ডাফ্ সাহেবের কথা মতো গাড়ি থেকে জোর করে তার স্ত্রীকে টেনে নিয়ে গিয়ে দু'জনেই খ্রীস্টান হয়েছে।

দেবেন্দ্রনাথ গম্ভীর হয়ে প্রশ্ন করেন, উমেশ কি ডাফ সাহেবের পরিচিত?

আজ্ঞে, উমেশ ঐ সাহেবের স্কুলেই পড়ে।

ও!

দেবেন্দ্রনাথ মুহূর্তের জন্য থেমে প্রশ্ন করেন, তার মানে ওর বয়স বেশি না।

আজ্ঞে বারো-তের বছর হবে।

ওর স্ত্রীর বয়স কত?

আজ্ঞে ছ-সাত হবে।

তার মানে নেহাতই শিশু।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

প্রতিবাদে গর্জে উঠলেন দেবেন্দ্রনাথ। তত্ত্ববোধিনীতে লিখলেন—এই সকল সাংঘাতিক ঘটনাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কি আমাদের চৈতন্য হইবে না? আর কতকাল

আমরা অনুৎসাহ নিদ্রাতে অভিভূত থাকিব। ধর্ম যে এককালীন নষ্ট হইল, এ দে
যে উচ্ছন্ন হইবার উপক্রম হইল, এবং আমাদিগের হিন্দু নাম যে চিরকালের ম
লুপ্ত হইবার সম্ভব হইল।

না, শুধু তত্ত্ববোধিনীতে লিখেই উনি স্থির থাকতে পারলেন না। মিশনারীদে
বিরুদ্ধে জনমত গঠনে উদ্যোগী হলেন ; আর পাদ্রীদের সংস্রব থেকে বালকদে
দূরে রাখার জন্য 'হিন্দু হিতার্থ' নামে এক অবৈতনিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন কি
সমভাবাপন্ন মানুষের সহযোগিতায়।

দেবেন্দ্রনাথের জন্যই ব্রাহ্ম সমাজ তখন শিক্ষা-দীক্ষা আদর্শে ও আধুনিক চিন্তা
জোয়ার আনে এবং অভাবনীয় প্রভাব বিস্তার করে সমাজজীবনের সর্বস্তরে।

তখনকার দিনে যেসব ইংরেজরা বিলেত থেকে ভারতে আসতেন কোম্পানি
চাকরি করতে, তাদের অধিকাংশই ছিলেন অর্ধশিক্ষিত, অসৎ ও চরিত্রহীন। এঁ
সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে এখানে আসতেন শুধু যেন-তেন-প্রকারেণ অ
রোজগার করতে ও চূড়ান্তভাবে ইন্দ্রিয়লালসা মেটাতে। তবে মাঝে মাঝে এমন এ
একজন আসতেন। যাঁরা সবদিক থেকেই ব্যতিক্রম। এক একটি বিস্ময়।

এমনি একজন বিস্ময়-পুরুষ ছিলেন জন ইলিয়ট ড্রিংকওয়াটার বেথুন।

বেথুন শুধু কেম্ব্রিজের ছাত্র ছিলেন না, ছিলেন অসামান্য ভাল ছাত্র। তাইত
'র‍্যাংলার' হবার গৌরব অর্জন করেছিলেন। এর পর ইনি আইন পড়েন ও তারপ
আইন ব্যবসায় খ্যাতি অর্জন করেন। বেথুন পার্লামেন্টের কাউন্সিলের সদস্য হবা
পর ভারতের গভর্নর জেনারেলের ব্যবস্থা-সচিব হয়ে কলকাতা আসেন। কি
ভারতে আসার আগেই ইনি ভারতবর্ষ সম্পর্কে যথেষ্ট পড়াশুনা করেছিলেন বলে
ভারতবর্ষের সামাজিক অবস্থা শিক্ষাব্যবস্থা ও নারী সমাজের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে
যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন।

গভর্নর জেনারেলের ব্যবস্থা-সচিবের পদাধিকার বলে বেথুন এডুকেশ
কাউন্সিলের সভাপতি হলেন। এই কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য ছিলেন ডিরোজিও
প্রিয় শিষ্য রামগোপাল ঘোষ।

এদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ও চারটি জেলা
ইন্সপেক্টর। শিক্ষা বিভাগের মার্শেল, ময়েট ও আরো অনেকেই মার্শাল ঈশ্বরচন্দ্রকে
শ্রদ্ধা করতেন না, শিক্ষা সংক্রান্ত সব বিষয়েই তাঁর পরামর্শ নিতেন। সুতরাং বেথুনে
সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের যোগাযোগ হতে দেরি হলো না ও অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে
দু'জনের মধ্যে গভীর হৃদ্যতা ও বন্ধুত্ব গড়ে উঠল।

এই সময় হুগলী, ঢাকা, কৃষ্ণনগর ও হিন্দু কলেজের সিনিয়ার ডিপার্টমেন্টের

ছাত্রদের বাংলার পরীক্ষক নিযুক্ত হলেন ঈশ্বরচন্দ্র। তিনি ছাত্রদের রচনা লিখতে দিলেন 'স্ত্রী-শিক্ষার আবশ্যকতা' বিষয়ে। এই পরীক্ষায় কৃষ্ণনগর কলেজের নীলকমল ভাদুড়ী সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে স্বর্ণপদক লাভ করেন। পারিতোষিক বিতরণ সভায় বেথুনকে নিয়ে গেলেন ঈশ্বরচন্দ্র। স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে বেথুনের ভাষণ শুনে বিদ্যাসাগর মুগ্ধ ও আশান্বিত হয়ে ওঠেন।

দু'জনেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন অবিলম্বে মেয়েদের একটা স্কুল খোলার জন্য। এই মহাযজ্ঞে মহা উৎসাহে মেতে উঠলেন পণ্ডিত মদনমোহন তর্কলঙ্কার রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় শম্ভুনাথ পণ্ডিত প্রভৃতিরা।

হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ও রামগোপালের সতীর্থ দক্ষিণারঞ্জনের সিমুলিয়া পাড়ার বাড়িতেই ১৮৪৯ সালের ৭ই মে প্রতিষ্ঠিত হলো 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল।' বেথুনের সে কি আনন্দ।

প্রথম একুশ জন ছাত্রীর মধ্যে দু'জন ছিলেন মদনমোহন তর্কলঙ্কারের মেয়ে ভুবনমালা ও কুন্দমালা। অন্যান্য ছাত্রীরা এলেন উদ্যোক্তাদের পরিবার থেকে।

ডেভিড হেয়ারের মত বেথুন সাহেবও প্রতিদিন স্কুলে আসতেন ও মেয়েদের সঙ্গে খেলাধুলায় মেতে উঠতেন। স্কুলের মেয়েদের কিছু না কিছু খেতে না দিলেও শান্তি পেতেন না বেথুন। প্রতিমাসে স্কুলের জন্য যে সাত-আট শ'টাকা খরচ হতো, তার পুরোটাই বেথুন দিতেন। এই স্কুলে আসার সময় বেথুনের নিত্যসঙ্গী ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র এবং তাঁর পরামর্শমতই স্কুলে পড়াশুনা হতো।

দেখতে দেখতে ছাত্রী সংখ্যা বাড়ে। দেবেন্দ্রনাথও তাঁর মেয়ে সৌদামিনীকে ভর্তি করে দিলেন বেথুনের স্কুলে।

স্কুলের গাড়িতেই ছাত্রীরা স্কুলে আসা-যাওয়া করতো। সে গাড়ির গায়ে লেখা ছিল মহানির্বাণ তন্ত্রের শ্লোক—"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতিযত্নতঃ।" অর্থাৎ শাস্ত্রের নির্দেশ হচ্ছে, কন্যাসন্তানদের অত্যন্ত যত্ন সহকারে শিক্ষা দিতে হবে।

রাস্তা-ঘাটে এই গাড়ি দেখলেই এক দল লোক অবাক হয়ে দেখতো ; অন্যরা সমালোচনায় মেতে উঠতো। এক দল সমালোচক বলতো—ঘোর কলিকাল। সর্বনাশ হবার যা বাকি ছিল, তাও চোখের সামনে ঘটে গেল।

আবার কেউ কেউ বলতো—এক 'আনো' শিখিয়েই তো আমরা পাগল হয়ে যাচ্ছি। সব সময় শুনতে হয় চাল আনো, ডাল আনো, কাপড় আনো, কোবরেজের ওষুধ আনো ও আরো কত কি! এবার ইস্কুলে গিয়ে আরো কিছু শিখলে আর আমাদের ধড়ে প্রাণ রাখাই দায় হবে।

রসিক কবি ঈশ্বর গুপ্ত ভবিষ্যদ্বাণী করলেন—

"যত ছুঁড়ীগুলো তুড়ি মেরে
কেতাব হাতে নিচ্চে যবে,
এ-বি শিখে, বিবি সেজে
বিলেতী বোল কবেই কবে ;
আর কিছুদিন থাকরে ভাই!
পাবেই পাবে দেখতে পাবে,
আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী,
গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।"

দু'বছর পর ভারত-প্রেমিক বেথুনের মৃত্যুর পর এই স্কুলের নামকরণ হয় বেথুন স্কুল।

বারো

সমাজেব সর্বস্তরে ঘোর অমানিশার অন্ধকার। সেই পুঞ্জীভূত অন্ধকার দূর করার জন্য রামমোহন যে মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়েছিলেন, সেই প্রদীপ থেকে জ্বলে উঠলো আরো কত প্রদীপের শিক্ষা। সমাজের কিছু কিছু অংশ ছড়িয়ে পড়লো তার আলো।

রামমোহন, দ্বারকানাথ, ডেভিড় হেয়ার, ডিরোজিও, কৃষ্ণমোহন, রামগোপাল, রামতনু, দেবেন্দ্রনাথ ও ঈশ্বরচন্দ্রের প্রচেষ্টায় প্রায় মৃত সমাজে প্রাণের সঞ্চার হলেও তা জীবন্ত প্রাণবন্ত চঞ্চল হয়ে উঠলো না।

সমাজে দিকে দিকে তখনও জমাট বাঁধা অন্ধকার। চলছে বহু বিবাহ, ব্যভিচার আর বিধবার সর্বনাশ।

বাঁড়ুজ্যেদের চণ্ডীমণ্ডপের নিত্যকার খোস-গল্পের আসরে অন্যান্যরা তো দূরের কথা, স্বয়ং বিভাকর বাড়ুজ্যে মশাই পর্যন্ত এসে হাজির কিন্তু তখনো দীনদয়ালের দেখা নেই। সবাই অবাক।

বাঁড়ুজ্যেমশাই হাসতে হাসতে বলেন, আজ দয়াল ঠাকুরের হলো কী? ও না এলে তো আসরই জমবে না।

হরিপদ মিত্তির সঙ্গে সঙ্গে বলেন, ঠিক বলেছেন। ও শালা যেমন রসিয়ে পার্বতী বা সীতার রূপ বর্ণনা করতে পারে, তা তো আমাদের দ্বারা হবে না।

আসলে বিভাকর বাঁড়ুজ্যের এই আসর বসে শুধু আদিরসাত্মক আলোচনার

জন্য।

উনি তো সোজাসুজি বলেন, দেখ বাপু, আমি পরাণ বাড়ুজ্যের বেটা! আমার বাপ কোন বউকে নিয়ে এক বছরের বেশি সহবাস করেন নি। তাছাড়া ব্যবসার কাজে যেখানে যেখানে ওনাকে যেতে হতো, সেই সব জায়গায় তাঁর রক্ষিতা ছিল।

যদু ঘোষ বলেন, আমার খুড়োমশাই তো বলতেন, পরাণ বাঁড়ুজ্যের মত মুরোদ তো লাখে একজনেরও নেই।

হ্যাঁ, যদু, তোর খুড়ো ঠিকই বলেছে। ঘরে-বাইরে তিরিশ-চল্লিশটা মাগী পোষা কি সহজ কথা! যেমন চাই গ্যাঁটের জোর, সেইরকমই আবার শারীরিক মুরোদ থাকা চাই।

ঠিক সেইসময় দীনদয়াল ঘোষ এসে হাজির।

সবাই এক সঙ্গে প্রশ্ন করেন, কী ব্যাপার? এত দেরি কেন?

দীনদয়াল ফরাসের উপর বসেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, বিভাকর, বড়ই অশান্তিতে আছি।

কেন? কেন?

ভাই, তুমি তো জানো, কত বুদ্ধি খাটিয়ে, কত পরিশ্রম করে আমাকে রোজগার করতে হয়।

সে আর জানি না!

স্মিথ সাহেবের দয়ায় বেশ ভালই আয় করি কিন্তু ভাই, তুমি তো সাহেবদের খুব ভালই চেনো। পানের থেকে চুন খসলেই ও শালারা আমার চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করে দেবে।

বিভাকর বাঁড়ুজ্যে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে একটু মুচকি হেসে বলেন, হ্যাঁ, খুব ভাল করেই জানি। তাইতো শিবের মাথায় জল দেবার মত আমি রোজ সকালে বেরোই সাহেবদের ভজনা করতে। তাছাড়া মাঝে মাঝে নৈশ পুজোর জন্য এমন নৈবেদ্য পাঠাই যে শালারা নিজের গরজেই আমার কাছে থেকে মাল কেনে।

দীনদয়াল একটু হেসে বলেন, আমার স্মিথ সাহেব যে মেমসাহেবকে সঙ্গে নিয়েই বিলেত থেকে এসেছেন। মেমসাহেব না থাকলে আমিও সাহেবকে রাতের পুজোর নৈবেদ্য পাঠাতাম।

তা তোমার অশান্তির কারণ কি?

দুঃখের কথা, আমাকে সেবা-যত্ন করার কেউ নেই।

সে কি? তোমার বউগুলো করে কি?

দুটো বউ তো সংসার নিয়েই ব্যস্ত। এক বউ তার ছোট বাচ্চা নিয়ে ব্যস্ত। নতুন

বউ দিনে হয় ব্রত-পার্বণ, না হয় সইকে নিয়ে ব্যস্ত ; আর রাত হলেই সে ঘুমে ঢুলে পড়ে।

বিভাকব বাঁড়ুজ্যে সঙ্গে সঙ্গে পরামর্শ দেন, দূর করে দাও ঐ মাগীকে। যে মাগী রাত্তিরে স্বামীকে খুশি না করে মোষের মত ঘুমোয়, তাকে রেখে লাভ কী?

ও মাগীর যে সাত কুলে কেউ নেই। তা না হলে কবে ওকে দূর করে দিতাম।

তাহলে আবার বিয়ে করো।

কিন্তু এখন কি বিয়ে করা ঠিক হবে?

হবিপদ মিত্তির আর যদু ঘোষ এক সঙ্গে বলে, বেঠিকের কি আছে?

মেয়েটা বিধবা হয়ে ফিরে এসেছে তো, তাই...

বাঁড়ুজ্যে মশাই বলেন, কপালে ছিল বলেই মেয়ে বিধবা হয়েছে ; তুমি তো তার জন্য দায়ী না।

আমি দায়ী না হলেও বিধবা মেয়ের সামনে আবার টোপর মাথায় দিয়ে বিয়ে করতে যাওয়া কি ঠিক হবে?

কেন ঠিক হবে না?

বিভাকর বাঁড়ুজ্যে মুহূর্তের জন্য থেমেই বলেন, ওরে বাপু, তুমি সুখে-শান্তিতে না থাকলে কি ঠিকমত ব্যবসা-বাণিজ্য চালাতে পারবে নাকি এত টাকা আমদানি হবে?

উনি একটু মুচকি হেসে বলেন, বুঝলে দয়াল ঠাকুর। আপনি বাঁচলে বাপের নাম! তুমি ভাল থাকলে, বাড়ির অন্য সবাইও ভাল থাকবে।

যদু ঘোষ বলেন, ওহে দীনদয়াল, তবে কি মেয়ের খোঁজ করবো?

বাঁড়ুজ্যে মশাই বলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, মেয়ের খোঁজ করো। তবে হ্যাঁ, একটু শাঁস-ওয়ালা মেয়ে চাই।

ওনার কথার ঠিক অর্থ বুঝতে না পেরে যদু বলেন, বাঁড়ুজ্যে ঠিক বুঝলাম না।

ওরে বাপু, এটাও বুঝলে না, একটা দশ-বারো বছরের খেলনা দিয়ে তো আমার দয়াল ঠাকুরের কাজ চলবে না। তাই বলছিলাম, একটু ডাগর-ডোগর মেয়ের খোঁজ করো।

এতক্ষণ দীনদয়াল চুপ করে থাকলেও এবার বলেন, তবে যদি সত্যি বিয়ে করি, তাহলে বড় মেয়ের চাইতে দু'এক বছরের বড় কোন মেয়েকেই বিয়ে করবো।

যদু সঙ্গে সঙ্গে জানতে চায়, তোমার বড়ো মেয়ের বয়স কতো হলো?

ঠিক ষোল।

সতের-আঠারো বছরের মেয়ে পাওয়া একটু কষ্টকর হলেও ঠিকই পেয়ে যাবো।

হরিপদ মিত্তির বলেন, না পাবার কি আছে? আমার ছোট পিসিমার দুই ননদই তো বোধহয় আঠারো-উনিশ হবে।

বাঁড়ুজ্যে বলেন, যদু দেখো তো, ওদের একজনের সঙ্গে আমাদের দীনদয়ালকে ঝুলিয়ে দেওয়া যায় কিনা।

আমি কাল সকালেই পিসীর কাছে যাবো।

মাস তিনেক পর আবার একদিন দীনদয়াল সত্যিই বিধবা মেয়ের সামনে টোপর মাথায় দিয়ে বিয়ে করতে গেলেন।

বাড়ুজ্যেদের চণ্ডীমণ্ডপে সন্ধ্যাকালীন আসরে দীনদয়ালের দীর্ঘ অনুপস্থিতি নিয়ে অন্যরা নিত্যই হাসিঠাট্টা করেন।

হরিপদ মিত্তির গড়গড়ার নলে লম্বা টান দিয়ে এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে চাপা হাসি হেসে বলেন, দীনদয়ালকে এমন ডাগর-ডোগর মাগী দিয়েছি যে সে আমাদেরও ভুলতে বসেছে।

বিভাকর বাড়ুজ্যে কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলেন, না, ভাই, দয়াল ঠাকুর কখনই আমাদের ভুলতে পারে না। এখনও তো ফুলশয্যা চলছে, তাই বেচারী আসতে পারছে না।

ওর কথা শুনে অন্যরা হেসে ওঠেন।

প্রায় মাসখানেক পর দীনদয়াল আবার এই সন্ধ্যাকালীন আসরে হাজির হতেই সবাই হৈ হৈ করে উঠলেন কিন্তু ওকে গম্ভীর দেখে সবাই অবাক।

বাঁড়ুজ্যে মশাই বলেন, কিগো দয়ালঠাকুর, তোমার মুখে হাসি নেই কেন?

আর ভাই বলো না। এই বিয়ে করার পর থেকেই এমন বিচ্ছিরি অশান্তি হচ্ছে যে...

ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই মিত্তির প্রশ্ন করে, কে অশান্তি করছে? নতুন বউ?

না, না, নতুন বউ না।

দীনদয়াল না থেমেই বলেন, সত্যি হরিপদ, নতুন বউ খুব ভাল মেয়ে কিন্তু অশান্তি শুরু করেছে তার আগের বউ।

আগের বউ মানে যে সন্ধে থেকেই ঘুমে ঢুলে পড়তো?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ হতভাগী।

বাঁড়ুজ্যে মশাই প্রশ্ন করেন, ও মাগী কী অশান্তি করছে?

ও হতভাগী হঠাৎ আমার প্রেমে পাগল হয়ে উঠেছে। আমার সঙ্গে রাত কাটাবার জন্য কি করছে, তা তুমি ভাবতে পারবে না।

বিভাকর বাঁড়ুজ্যে সঙ্গে সঙ্গে পরামর্শ দেন, ও মাগীকে ঘব থেকে লাথি মে

বেব করে দেবে।

হ্যাঁ, বাঁড়ুজ্যে, আমি সত্যি ওকে লাথি-ঝাঁটা মেরে বের করে দিই। পিঠে দু
দাম না পডলে ও হতভাগী ঘর থেকে বেরুতে চায় না।

বুঝলে দয়াল ঠাকুর, যে পুজোর যে মন্ত্র! যাইহোক লাথি-ঝাঁটা খাবার পর
মাগী অশান্তি বন্ধ করেছে?

হ্যাঁ, ক'দিন হলো আব আমার ঘবে ঢুকতে সাহস করছে না।

বাঁড়ুজ্যে মশাই একটু মুচকি হেসে বলেন, এবার বলো, নতুন বউ তোমাকে খু
কবছে তো?

দীনদয়াল একগাল হেসে বলেন, তোমরা আমার বন্ধু, তোমাদের কাছে তে
আমাব কিছুই লুকোবার নেই। তাই বলছি, নতুন বউ আমাকে যে আনন্দ দিচ্ছে
তা আগে কোন বউ দিতে পাবে নি।

ভেরি গুড! খুবই আনন্দের কথা।

তবে ভাই, বিধবা মেয়েটা এমনভাবে আমার দিকে তাকায় যে বড়ই খারা
লাগে।

সে আর কী করা যাবে? ওর কপালে স্বামীর সোহাগ নেই তো তুমি কী করবে

সবই বুঝি কিন্তু...

দয়াল ঠাকুব, ওসব কিন্তু-টিন্তু ভুলে যাও। মরদ হয়ে যখন জন্মেছে, তখ
প্রাণভরে আনন্দ করে যাও।

*যুধিষ্ঠির সরকার যশোর কোর্টের সব চাইতে বিখ্যাত উকিল। দুনিয়ার লো
বলে, শত্রুকে যদি মহাপ্রস্থানে পাঠাতে চাও, তাহলে সোজা চলে যাও যুধিষ্ঠি
উকিলের কাছে।*

কিন্তু ওর খাঁই যে বড্ড বেশি।

ওবে বাপু, যে গরু দুধ দেয়, তার টাটও সহ্য করতে হয়। যুধিষ্ঠির উকিল তো
হেঁজি-পেজি উকিল না। খাঁই তো বেশি হবেই।

হ্যাঁ, সত্যি যুধিষ্ঠির উকিল বড্ড বেশি টাকা নেন কিন্তু উনি কোর্টে হাজির হলেই
স্বয়ং ইংরেজ জজসাহেব পর্যন্ত ঘাবড়ে যান। একে যেমন সুপুরুষ, সেইরকমই
সুদর্শন। তাছাড়া যেমন ব্যক্তিত্ব, তেমনি কণ্ঠস্বব। ইংরেজ জজ সাহেবের সঙ্গে যখন
উনি ইংরেজিতে তর্ক-বিতর্ক করেন, তখন তো মনেই হয় না. উনি বাঙালি। মনে
হয়, কোন পাক্কা সাহেব কথা বলছেন।

সত্যি কথা বলতে কি সাবা যশোর শহবে ওর মত সম্মান-প্রতিপত্তি আর কারুর

নেই। সমাজের সর্বস্তরেই উনি সম্মানিত।

যুধিষ্ঠির সরকারের দেশ খুলনা জেলায় বাগেরহাট মহকুমায়। সেখানে উনি বিশাল দোতলা বাড়ি বানিয়েছেন। তাছাড়া কিনেছেন বহু বিঘে চায়ের জমি আর কয়েকটা আম-কাঁঠালের বাগান। ওর বড় ভাই বাগেরহাট স্কুলে শিক্ষকতা করেন আর ছোট ভাই জমিজমা চাষ-আবাদের দেখাশুনা করেন। তিন ভাইয়ের পরিবারই ঐ বাড়িতে থাকেন। যুধিষ্ঠির গ্রামের বাড়িতে যান কোর্ট বন্ধ থাকলে কিন্তু এত মামলা ওঁকে সামলাতে হয় যে ওখানে বেশি দিন থাকা কখনই সম্ভব হয় না। কয়েক দিন পরই ওকে ফিরে আসতে হয় যশোরে।

বড় ভাইয়ের মত যুধিষ্ঠিরও দু'বার বিয়ে করেছেন ; ছেলেমেয়ে আছে ন'জন। বড় বউয়ের পাঁচটি সন্তানের মধ্যে তিনটি কন্যা আর ছোট বউয়ের দু'টি ছেলে, দু'টি মেয়ে। মোট পাঁচটি মেয়ের মধ্যে চারটি মেয়েরই বিয়ে হয়েছে অবস্থাপন্ন পরিবারের সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্রের সঙ্গে। প্রত্যেকটি মেয়ের বিয়েতেই যুধিষ্ঠির সরকার প্রচুর ব্যয় করেছেন। মেয়ে-জামাইদের দান-সামগ্রী দিয়েছেন হাজার হাজার টাকার। তাছাড়া শত শত নিমন্ত্রিতদের ভূরিভোজে আপ্যায়িত করেছেন।

দুই বউই আত্মীয়-স্বজনদের বলেন, উনি যেভাবে মেয়েদের বিয়ে দিয়েছেন, সেভাবে অনেক জমিদাররাও মেযের বিয়ে দিতে পারবে না।

শুধু কি তাই?

যুধিষ্ঠির সরকার দুই ভাইপো ও নিজের দুই ছেলের বিয়েতেও প্রায় মেয়েদের বিয়ের মতই খরচ করেছেন। তাছাড়া ওদের চারজনকেই টাকা দিয়েছেন বাগেরহাটে ব্যবসা করার জন্য।

সব মিলিয়ে ওকে নিয়ে সংসারের সবারই গর্ব। সবাই খুশি।

তবে গোলাপেও তো কাঁটা থাকে, পদ্মবনে থাকে বিষধর সাপ!

যুধিষ্ঠির সরকারের পারিবারিক জীবনে একমাত্র দুঃখ হচ্ছে দ্বিতীয় মেয়ে সুরমার অকাল বৈধব্য।

ওর প্রত্যেক মেয়েকেই দেখতে ভাল কিন্তু সুরমার রূপের কোন তুলনা হয় না। যেমন সুন্দর চোখ-মুখ, তেমনই সুন্দর দেহের গড়ন। তাছাড়া এক মাথা চুল আর মুখে সব সময় ভুবন ভোলানো হাসি। সত্যি ওকে দেখে মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই।

শুধু রূপ না, সুরমা অনেক গুণের মেয়ে। ও স্কুলে যায়নি ঠিকই কিন্তু স্কুল শিক্ষক জ্যেঠার কাছে অন্যান্য বোনদের সঙ্গে নিয়মিত পড়াশুনা করেছে। সুন্দর বাংলা পড়তে ও লিখতে পারে। ভালই অঙ্ক জানে। তাছাড়া জানে ইতিহাসের অনেক গল্প। রাজা বিক্রমাদিত্য আর সম্রাট অশোকের গল্প তো ওর মুখস্ত! এসব ছাড়াও পড়েছে

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি।'

পঞ্চদশী সুরমার বিয়ে হলো অত্যন্ত সুপাত্রের সঙ্গে কিন্তু বিধিব বিধান! স্বামী সুখ সইলো না ওর কপালে। যে সুরমা শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিল ঠিক মা দুর্গার মত, পাঁচ বছর পর সেই সুরমাই বাপের বাড়ি ফিরে এলো শাঁখা ভেঙে, সিঁদুর তুলে সাদা থান পরে।

ঐ সুরমাকে দেখে যুধিষ্ঠির সরকার তাঁর প্রাণপ্রিয় পরম সুন্দরী রক্ষিতা হরিমতীকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়েও শান্তি পান নি দীর্ঘ দিন। মন দিয়ে কাজকর্মও করতে পারেন নি অনেক দিন।

উনি ওর পরম সুহৃদ ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু দেওয়ান জয়কৃষ্ণ চক্কোত্তিকে বলেন, ভাই, আপনি তো জানেন, আমাকে প্রতিদিন অন্তত ষোল ঘণ্টা অমানুষের মত পরিশ্রম করতেই হয়! ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়ে কিন্তু হরিমতীকে দেখলে মুহূর্তের মধ্যে আমার সব দুঃখ-কষ্ট আর ক্লান্তি চলে যায়।

সরকার মশাই, আমি তো সবাইকে বলি, হরিমতীর মত রক্ষিতা আছে বলেই আপনি ওকালতিতে এত নাম-ধাম করেছেন। হরিমতীর মত সুন্দরী ও গুণী রক্ষিতা তো এ শহরে আর কারুর নেই।

কিন্তু দেওয়ান, বিশ্বাস করুন, সুরমার জন্য আমি হরিমতীর কাছেও শান্তি পাচ্ছি না। মন বড়ই অস্থির হয়ে পড়েছে।

ভাই, এখন কিছুদিন আপনি কিছুতেই শান্তি পাবেন না ; তবে সময় আবাব সবকিছু ঠিক করে দেবে। কিছু চিন্তা করবেন না।

হ্যাঁ, আস্তে আস্তে সবকিছুই স্বাভাবিক হয়। এমন কি সুরমাও এখন আবার আগের মত কথায় কথায় হাসতে শুরু করেছে।

যুধিষ্ঠির সরকারের চতুর্থ জামাই সুখবিলাস বরিশালে ব্যবসা করে এবং বেশ ভালই আয় করে। ওকে দেখতে যেমন সুন্দর, তেমনি হাসিখুশি ও মিশুকে। শ্বশুরবাড়ির সবাই ওকে ভালবাসেন, সবাই ওকে পছন্দ করেন। তাইতো এই নতুন জামাই যখন আসে, তখন সরকার বাড়িতে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়।

ব্যবসার কাজে সুখবিলাসকে প্রত্যেক মাসেই খুলনা আসতে হয় ; আবার কখনও কখনও মাসে একাধিকবার আসতে হয়। সময় পেলে সুখবিলাস দু'এক দিনের জন্য শ্বশুরবাড়ি ঘুরে যায়। তবে জ্যাঠাশ্বশুর থেকে শুরু করে ছোট শালা-শালী পর্যন্ত সবাই বলে, খুলনা এলেই এখানে ঘুরে যাবে।

সুখবিলাস একটু হেসে সুরমার দিকে তাকিয়ে বলে, কি মেজদি, খুলনায় এলেই আমাকে এখানে আসতে হবে?

নিশ্চয়ই আসবে। আমরা কি তোমার পর?

সুরমা মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, তুমি এলে সবাই যখন খুশি হয়, তখন তুমি আসবে না কেন?

ঠিক আছে, চেষ্টা করব।

হ্যাঁ, সুখবিলাস মাঝে-মধ্যে আসে ; দু'একদিন হইচই আনন্দ করেই চলে যায়। ও চলে যাবার পর সবার মুখেই এক কথা, ছেলেটা এলে কি আনন্দেই যে সময় কেটে যায়! তাইতো চলে গেলেই বড় খারাপ লাগে।

যাইহোক তখন আষাঢ় মাস। যেমন বর্ষা, তেমনি বন্যা। একদিন তুমুল বর্ষার মধ্যেই সুখবিলাস ভিজে কাক হয়ে শ্বশুরবাড়ি এসে হাজির।

ওকে দেখেই বাড়ির বড় গিন্নী চিৎকার করে ওঠেন, এই সুরমা, শিগিগির সুখবিলাসকে একটা শুকনো গামছা দে। চটপট ভেজা জামা-কাপড় ছেড়ে শুকনো কাপড়চোপড় পরতে দে।

বারান্দার কোনা থেকে সুরমা গলা চড়িয়ে বলে, হ্যাঁ, বড়মা, দিচ্ছি।

ছেলেমেয়েদের বিয়ে-থা হয়েছে। আত্মীয়দের আসা-যাওয়া বেড়েছে। তাই বছর খানেক হলো যুধিষ্ঠির সরকার আরো একটা ছোট্ট দোতলা বাড়ি করেছেন ; নীচে দুটো ঘর আর উপরে একটা ঘর। আত্মীয়-স্বজনরা না এলে নীচের একটা ঘরে ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা করে আর অন্য ঘরে ছোটকর্তা খেতখামারের হিসেব-নিকেশ বা লোকজনদের সঙ্গে কথা বলেন। উপরের ঘর থাকে হঠাৎ এসে যাওয়া আত্মীয়দের জন্য। সুখবিলাস সব সময় নতুন বাড়ির ঐ দোতলার ঘরে থাকে।

দুটো বাড়িই একেবারে পাশাপাশি ; তবু মাঝখানে দশ-বারো হাত ফাঁকা। তবে দু'বাড়ির যাতায়াতের এই পথটুকুর উপরে টিন দেওয়া আছে বৃষ্টি-বাদলের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য।

যাইহোক, শুকনো জামাকাপড় আর গামছা নিয়ে সুরমা ঐ ঘরে পা দিতেই সুখবিলাস একগাল হেসে বলে, দেখেছ মেজদি। কত কষ্ট করে শুধু তোমার জন্য এলাম।

ইস্! তুমি যেন শুধু আমার জন্য এসেছ!

সুখবিলাস দুম করে ওর বুকের উপর একটা হাত রেখে বলে, মাইরি বলছি, শুধু তোমার জন্য এলাম!

নেহাতই মুহূর্তের জন্য হলেও সুরমা লজ্জা পায় কিন্তু তবু একটু হেসে বলে, সুখবিলাস, মিথ্যে কথা বলো না।

মেজদি, আমি মা কালীর নামে দিব্যি করে বলছি, শুধু তোমার জন্যই এসেছি।

খুব ভাল করেছ। এখন চটপট গা-হাত-পা ভাল করে মুছে কাপড় চোপড় বদলে নাও।

না, সুরমা আর মুহূর্তের জন্য দাঁড়ায় না। ও ঘর থেকে চলে যায়।

যাইহোক, তারপর যথারীতি সুখবিলাসকে কেন্দ্র করে শুরু হয় আড্ডা আর গল্পগুজব। তুমুল বৃষ্টির মধ্যেও মাঝে মাঝেই ওদের হাসি শোনা যায় রান্নাঘরে পর্যন্ত। বড় গিন্নী একটু হেসে মেজ জা-কে বলেন, শুনছিস মানদা, ওদের হাসির আওয়াজ।

মানদা একটু হেসে বলেন, শুনব না কেন? সবাই এত জোরে হাসাহাসি করলে না শুনে উপায় আছে?

সুখবিলাস এলে তোর ভাসুর থেকে শুরু করে বাড়ির সব বউ-ঝি আণ্ডা বাচ্চা যেন সমবয়সী হয়ে যায়।

দিদি, যা বলেছ!

রাত্রে সুখবিলাস শ্বশুর আর শালাদের সঙ্গে খেতে বসেছে। বাড়ির বড় গিন্নী পরিবেশন করছেন। অন্য সব মেয়েরাও দাঁড়িয়ে আছেন ওদের ঘিরে।

খেতে খেতেই সুখবিলাস মুখ তুলে সুরমার দিকে তাকিয়ে বলে, মেজদি, বড্ড মাথা ধরেছে। তুমি খেয়েদেয়ে একটু মাথা টিপে দেবে?

সুরমা জবাব দেবার আগেই ওর জ্যেঠিমা বলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেবে।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমেই বলেন, মাথা ধরার আর দোষ কি? আজ যা বৃষ্টিতে ভিজেছ!

পুরুষদের খাওয়া-দাওয়ার পর বাড়ির মেয়ে-বউরা খেতে বসে। বিধবা সুরমা খায় খই-দুধ।

খাওয়া-দাওয়া মিটতেই সুরমার মা ওকে বলেন, হ্যাঁরে, যা ; সুখবিলাসকে একটু মাথা টিপে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে আয়। বেচারা যা বৃষ্টিতে ভিজেছে ওর আবার জ্বর-টর না হয়।

সুরমা বলে, হ্যাঁ, মা, যাচ্ছি।

তখনও অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। মাঝে মাঝে ভয়ঙ্কর শব্দ করে মেঘ ডাকছে বিদ্যুত চমকাচ্ছে। সুরমা নতুন বাড়ির দোতলার ঘরে পা দিতেই সুখবিলাস বলে, এসো মেজদি।

সুরমা ওর খাটের পাশে দাঁড়াতেই সুখবিলাস বলে, তুমি আমার পাশে বসেই মাথা টিপে দাও।

না, না, বসতে হবে না।

দাঁড়িয়ে আর কতক্ষণ মাথা টিপে দেবে? তুমি বসে বসেই মাথা আর গা-হাত টিপে দাও।

সুরমা একটু হেসে বলে, আবার গা-হাতও টিপে দিতে হবে?

সুখবিলাসও একটু হেসে বলে, হ্যাঁ, সুন্দরী, গা-হাতও টিপে দিতে হবে।

ও সঙ্গে সঙ্গে সুরমার একটা হাত ধরে একটু কাছে টেনে বলে, এসো, বসো।

একটু দ্বিধা সত্ত্বেও সুরমা ওর পাশে বসেই মাথা টিপতে শুরু করে।

সুখবিলাস একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, তোমার হাতেও কি মধু!

সুরমা একটু হেসে বলে, আমার হাতে যে মধু আছে, তা তো জানতাম না।

হঠাৎ সুখবিলাস দু'হাত দিয়ে ওকে বুকের উপর টেনে নিয়েই বলে, আজ তোমার মধু খাবো বলেই তো...

মুক্তি পাবার জন্য সুরমা ছটফট করতে করতেই চাপা গলায় বলে, আঃ। সুখবিলাস, কী করছো? আমাকে ছেড়ে দাও।

ওহে সুন্দরী, তোমাকে ছেড়ে দেবার জন্য ডেকে পাঠাইনি। আজ তোমাকে আমি প্রাণভরে আনন্দ দেব, আমিও মনের সুখে আনন্দ করব।

আমাকে তোমার আনন্দ দিতে হবে না। আমাকে ছেড়ে দাও।

কথা বলতে বলতেই সুরমা প্রাণপণে চেষ্টা করে ছাড়া পাবার জন্য।

সুন্দরী, কেন অযথা ন্যাকামী করছো। অনেক দিন তো উপবাসী আছে : আজ একটু প্রাণভরে মধু খাও।

আঃ! ছি! ছি! তুমি এত খারাপ! এত বেহায়া!

সুরমা জোর করে ছিটকে যাবার চেষ্টা করতেই সুখবিলাস এক টানে ওর শাড়ি খুলে নিয়েই ঘরের দরজা বন্ধ করে।

সুরমা কাঁদতে কাঁদতে ওর দুটো পা জড়িয়ে ধরে বলে, দোহাই তোমার! তুমি আমার সর্বনাশ করো না।

সুন্দরী, আমি কি তোমার সর্বনাশ করতে পারি? এসো, আমার কাছে এসো।

সুরমা কাঁদতে কাঁদতেই বলে, সুখবিলাস, তুমি আমাকে ছেড়ে দাও। তুমি আমার ছোট ভাই হয়ে...

সুখবিলাস আর ধৈর্য ধরতে পারে না। ওকে কোলে তুলে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিয়েই হিংস্র নেকড়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে।

হ্যাঁ, সেই দুর্যোগের রাতেই সুখবিলাস ওর সর্বনাশ করে।

দু'এক মিনিট পর সুখবিলাস ওর গাল টিপে বলে, সুন্দরী, কি আনন্দ পেলাম,

তা মুখে বলতে পারবো না। তোমারও ভাল লেগেছে তো?

সুরমা ঠাস করে ওর গালে চড় মেরে বলে, ছোটলোক, জানোয়ার কোথাকার।

সুখবিলাস একটু হাসে।

সুরমা শাড়ি পড়তেই সুখবিলাস দু'হাতে দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে বলে, এবার থেকে যখনই আসতে বলব, তখনই আসবে। তা না হলে সবাইকে বলে দেব, তুমি আমার সঙ্গে স্ফূর্তি করবে বলেই আমাকে বলেছিলে, মাথা টেপার জন্য ডাক দিতে

ও মুহূর্তের জন্য থেমে একটু হেসে বলে, আমার কথার অবাধ্য হলেই আমি হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেব।

সুখবিলাস পরের দিনই চলে যায়। তারপর বহুদিন আর তার দেখা নেই। সরকার বাড়িতে মাঝে মাঝেই ওকে নিয়ে কথা হয়।

সেদিন রাত্রে খেতে বসে বড়কর্তা নিজেই বলেন, আমাদের স্কুলের হীরালালবাবুর দেশ সুখবিলাসদের গ্রামেই। উনি গতকাল দেশ থেকে ফিরেছেন আজ আমাকে বললেন, আপনাদের জামাই সুখবিলাসের সঙ্গে বেশ কয়েক দিন দেখা হয়েছে। একদিন তো আমাকে নেমন্তন্ন করেও খাওয়ালো। সুখবিলাস ছেলেটি সত্যি ভাল।

বড় গিন্নী বললেন, তার মানে ও ভালই আছে?

হ্যাঁ, ভালই আছে।

যাক, তাও ভাল।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, ছেলেটাকে মাঝে মাঝেই বড্ড দেখতে ইচ্ছে করে। আমাদের আর কোন জামাই তো ওর মত মিশুকে বা আমুদে না।

যুধিষ্ঠিরবাবুর স্ত্রী ঘোমটার আড়াল থেকে বলেন, সত্যি দিদি, সুখবিলাস এলে ক'টা দিন বেশ আনন্দে কাটে।

সুরমা একটু হেসে বলে, শ্বশুরবাড়িতে জামাইদের বেশি না আসাই ভাল।

ওর বড়মা সঙ্গে সঙ্গে বলেন, দ্যাখ সুরমা, আমাদের সুখবিলাসের বেলায় ওকথা খাটে না। ও তো ঠিক বাড়ির ছেলের মতই সবার সঙ্গে মেশে। ও তো অন্য জামাইদের মত গুরুগম্ভীর হয়ে দূরত্ব রেখে কারুর সঙ্গে মেলামেশা করে না।

বড়মা, ও যতই মেলামেশা করুক, তবুও ও জামাই।

আমার তো কখনও মনে হয় না সুখবিলাস আমাদের জামাই ; ওকে তো আমি নিজের ছেলেই মনে করি।

দিন তিনেক পরই সুখবিলাস এসে হাজির।

ওকে দেখেই সরকার বাড়ির সবাই যেন হাতে চাঁদ পায়। আনন্দে খুশিতে নেচে

ওঠেন সবাই। নীরব শুধু সুরমা।

রাত্রে দুই শ্বশুর আর শালাদের সঙ্গে খেতে বসে সুখবিলাস হাসতে হাসতে সুরমাকে বলে, মেজদি, আজ সারাদিনে তুমি তো আমার সঙ্গে বিশেষ কথা বললে না।

তোমাকে নিয়ে বাড়ির সবাই এমন মেতে থাকে যে আমার খুব বেশি কথা বলার সুযোগও হয় না, দরকারও হয় না।

যাইহোক মেজদি, অনেক দিন ধরে অনেক জায়গায় ঘুরে ফিরে এখানে এসেছি। সত্যি খুব ক্লান্ত। গতবারের মতো আজ আর কাল তুমি একটু মাথা টিপে ঘুম পাড়িয়ে দেবে তো?

যুধিষ্ঠিরবাবুর বড়ভাই সঙ্গে সঙ্গে বলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেবে।

ওনার স্ত্রী একটু হেসে বলেন, আমাদের সুরমা কারুর কোন অনুরোধই ফেলতে পারে না ; আর তুমি তো এ বাড়ির সব চাইতে প্রিয় জামাই! সুরমা মহানন্দে তোমার মাথা টিপে দেবে।

যে জামাইকে খুশি করতে বাড়ির সবাই ব্যস্ত ও উদগ্রীব, সেখানে সুরমা কী বলবে? চুপ করে থাকে।

মেয়েদের খাওয়া-দাওয়ার পর্ব মিটতেই সুরমার মা মেয়েকে বলেন, হ্যাঁরে, তুই এবার যা। সুখবিলাসকে দেখে মনে হলো, বেচারী সত্যি ক্লান্ত।

হ্যাঁ, সুরমা সুখবিলাসকে খুশি করতে হাজির হয় নতুন বাড়ির দোতলার ঘরে।

সুখবিলাস দরজায় খিল দিয়েই ওকে কোলে তুলে নিয়ে বলে, তুমি সত্যি বড্ড ভাল। যেমন তোমার চোখধাঁধানো রূপ, ঢলঢলে যৌবন, সেইরকমই সুন্দর তোমার স্বভাব।

সুরমা একটি শব্দও উচ্চারণ করে না।

সুখবিলাস ওকে পাশে নিয়ে শুয়েই জড়িয়ে ধরে বলে, সুন্দরী, সত্যি বলো তো গতবার তোমার ভাল লেগেছিল কি না।

সুরমা ওর কথার জবাব দেয় না।

সুখবিলাস ওকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বলে, আমার দারুণ ভাল লেগেছিল।

বিধবা শালীর সর্বনাশ করতে তোমার মত ছেলের ভাল না লেগে পারে?

দ্যাখ ছুড়ী, খোঁচা মেরে কথা বলবি না।

না, তারপর সুরমা আর একটিও কথা বলে না। সুখবিলাস মহানন্দে ওকে উপভোগ করে।

ঘর থেকে বেরুবার সময় সুরমা গম্ভীর হয়ে বলে, কালকেও তো তোমার মাথা

টিপে দিতে আসতে হবে, তাই না?

একশ'বার আসতে হবে।

তখন ঘরে ঘরে বিধবা। কোন পরিবারে দু'একজন, আবার কোন পরিবারে পাঁচ-সাতজন।

তখন দেশে অসুখ-বিসুখেরও শেষ নেই। ম্যালেরিয়া-কালাজ্বর-টাইফয়েড থেকে কলেরা-বসন্ত ও আরো কত কি। চলে মৃত্যুর মিছিল। তিরিশ-চল্লিশেই অধিকাংশকে এই পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিতে হয়। দীর্ঘজীবী হয় খুব কম মানুষ।

সতীদাহ বন্ধ হওয়ায় সমাজে বিধবার সংখ্যা আরো বেড়ে গেল। বিধবাদের মধ্যে বৃদ্ধার সংখ্যা অতীব নগণ্য। বারো আনা বিধবাই যুবতী বা কিশোরী। আর এইসব বিধবাদের সর্বনাশ করার জন্য সুখবিলাসের মত জামাই, খুড়তুতো-মামাতো-পিসতুতো আর ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশীর সংখ্যা নেহাত কম ছিল না।

বিপর্যয় ঘটতেও দেরি হলো না। কলঙ্ক লুকোবার জন্য শুরু হলো বিধবাদের আত্মহত্যা ; গলায় দড়ি, গায়ে আগুন বা নদীতে-পুকুরে ডুবে মরা। আবার কোন কোন বিধবা বাড়ি থেকে পালিয়ে দেহপসারিনীও হতে বাধ্য হলো।

আরো কত কি হলো।

মানিকতলার নীলকমল ঘোষালের মেয়ে গঙ্গা বিয়ের এক বছরের মধ্যেই স্বামী হারিয়ে বাপের বাড়িতে ফিরে এলো পনের বছর বয়সে।

গলির সব পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, মেলামেশা। ছেলেমেয়েরা এ-বাড়ি ও-বাড়িতে খেলাধুলা করে। এ গলির সবাই সবার পরিচিত। তাইতো গঙ্গা বিধবা হয়ে ফিরে এসেছে শুনে অনেকেই ছুটে এলেন নীলকমলের বাড়ি।

কি সর্বনাশ! এই কচি মেয়েটা কী অপরাধ করেছে যে ভগবান ওকে এই শাস্তি দিলেন?

আমাদের গঙ্গা বছর পার হতে না হতেই এভাবে ফিরে আসবে, তা স্বপ্নেও ভাবা যায় নি।

যে মেয়েটা বিয়ের স্বাদই জানলো না, তাকে স্বামীহারা করে ভগবান যে কি করলেন, তা জানি না।

আরো কতজনে কতভাবে দুঃখ-আক্ষেপ করলেন।

গঙ্গা চুপ করে ঘরের কোণে বসে থাকে সারাদিন। খুব প্রয়োজন না হলে কখনো কারুর সঙ্গে কথা বলে না। ওর শরীরও দিন দিন খারাপ হয়।

হবে না?

ঐটুকু মেয়ে দিনের বেলা ডাল-তরকারী দিয়ে আতপ চালের ভাত খেতে ভাল না লাগলেও খেতে হয় বাধ্য হয়ে। বিকেল থেকেই আবার খিদেয় কষ্ট পায় কিন্তু কি খাবে?

ও কি সধবা নাকি পুরুষ যে চিড়ে-মুড়ি খাবে?

না, না, ওসব ওর খেতে নেই।

সেই রাত্তির বেলা একটু দুধ আর কলা।

অথচ এইসব খেতে গঙ্গার কোন কালেই ভাল লাগে না। আগে তো ও শুধু মাছ-ভাত খেতো দু'বেলা ; এমন কি ডাল তরকারীও খেতে চাইতো না।

গোদের উপর বিষফোড়া!

একাদশীতে নির্জলা উপবাস।

পুরো একটা দিন খাওয়া-দাওয়া তো দূরের কথা এমন কি জল খাওয়া বন্ধ।

তেষ্টায় গলা-বুক শুকিয়ে যায়। চৈত্র বোশেখের গরমে জল খেতে পায় না বলে গঙ্গা ছটফট করে, হাউ হাউ করে কাঁদে।

মেয়ের এই কষ্ট সহ্য করতে পারেন না ওর মা। রাত্রে কাঁদতে কাঁদতে স্বামীকে বলেন, তুমি সকালে উঠেই পুরুত মশায়ের কাছে যাবে ; বলবে, কালই উনি যেন আমার সঙ্গে দেখা করেন। মেয়েটার এই কষ্ট আর চোখে দেখা যায় না।

হ্যাঁ, পরের দিনই শ্রীজীব ভট্চাজ মশাই এসে হাজির।

বৌমা, তুমি আমাকে ডেকেছ?

হ্যাঁ, ঠাকুরমশাই।

কি ব্যাপার?

এই গরমে একাদশীর দিন গঙ্গা একটু জল খাবার জন্য এমন কান্নাকাটি করে যে আমি আর সহ্য করতে পারি না।

ঘোষাল গিন্নী চোখের জল ফেলতে ফেলতে বলেন, একে মেয়েটা খিদেয় ছট্ফট করলেও কিছু খেতে পায় না ; তার উপর আবার জল না খেয়ে ও বাঁচবে কী করে? আপনি দয়া করে অনুমতি দিন। গঙ্গা যেন একাদশীর দিন অন্তত জল খেতে পারে।

শ্রীজীব ভট্চাজ মাথা নেড়ে টিকি দুলিয়ে বলেন, নৈব নৈব চ। শাস্ত্রের বিধান, চান করার পর ওর চুলের এক ফোঁটা জলও যেন ওষ্ঠে না পড়ে।

উনি না থেমেই বলেন, বৌমা, তোমার মেয়ে যখন বিধবা হয়েছে, তখন তাকে শাস্ত্রের বিধান মানতেই হবে। কোন ব্যতিক্রম হলেই মহা সর্বনাশ হবে।

ঘোষাল গিন্নী কাঁদতে কাঁদতেই বলেন, দোহাই ঠাকুরমশাই, কোন পুজো-আচ্চা

করে মেয়েটাকে একাদশীর দিন জল খেতে দিন। তা না হলে আমার গঙ্গা বাঁচবে না।

বৌমা, সবই বুঝি কিন্তু আমি নিরুপায়। একাদশীর দিন বিধবাকে নির্জলা উপবাস করতেই হবে ; তা না হলে মহাপাপ হবে মৃত্যুর পর তোমার মেয়ের নরকেও ঠাঁই হবে না।

শ্রীজীব ভট্‌চাজ টিকি নেড়ে বিদায় নিলেন।

এই খবর ছড়িয়ে পড়ল গলির বাড়িতে বাড়িতে। অনেকেই ছুটে এলেন সমবেদনা জানাতে, কিন্তু শাস্ত্রের বিধান লঙ্ঘন করার পরামর্শ দিতে কেউই সাহস করেন না।

এই গলির যেসব মেয়েদের সঙ্গে গঙ্গা খেলাধুলা করতো, তাদের সবারই বিয়ে হয়ে শ্বশুরবাড়িতে আছে। কদাচিৎ কখনও তাদের মধ্যে দু'একজন দু'চারদিনের জন্য বাপের বাড়ি এলেই গঙ্গার কাছে ছুটে আসে একটু সুখ-দুঃখের গল্প করার জন্য। যে দু'জন ছেলের সঙ্গে গঙ্গা ছোটবেলায় খেলাধুলা করতো, তাদের একজন তো মারা গেছে, আছে শুধু মিত্তিরবাড়ির গণেশ। গঙ্গার সেই খেলার সাথী গণেশ এখন হিন্দু কলেজে পড়ে।

গণেশকে নিয়ে এ পাড়ার গর্বের শেষ নেই। সবাই একবাক্যে স্বীকার করেন, এমন ভদ্র, সভ্য, বুদ্ধিমান ছেলে আমরা দেখি নি। তাছাড়া কি বিদ্যে। বাপরে বাপ! কত মোটা মোটা বই পড়ে।

গণেশ লেখাপড়া নিয়েই ব্যস্ত থাকে ; তবু সময় পেলেই ঘোষালবাড়ি আসে গঙ্গার সঙ্গে দেখা করতে।

সেদিন ঘোষালবাড়ির মধ্যে পা দিতেই ঘোষাল গিন্নীকে দেখে গণেশ বলে, খুড়ীমা, গঙ্গা কোথায়? ও কি কোন কাজে ব্যস্ত?

না, বাবা, ও কোন কাজে ব্যস্ত না। ও তো দিন রাত্তিরই চুপ করে বসে থাকে।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, জানিস গণেশ, মেয়েটার মুখের দিকে আমি তাকাতে পারি না। ওর চিন্তায় আমি রাত্তিরে ঘুমুতে পারি না।

খুড়ীমা, গঙ্গাকে দেখে আমারও খুব কষ্ট হয় ; আর আপনি তো ওকে পেটে ধরেছেন।

হ্যাঁ, বাবা, পেটে ধরেছি বলেই তো সব সময় বুকের মধ্যে আগুন জ্বলে। কোন কিছুতেই শান্তি পাই না।

খুড়ীমা, একটা কথা বলব?

হ্যাঁ, বাবা বল।

গঙ্গা যে ভাবে চুপচাপ বসে থাকে, মনে মনে কি সব ভাবে, তা তো ভাল না।

গণেশ প্রায় না থেমেই বলে, এভাবে থাকলে তো ওর মাথা খারাপ হয়ে যাবে।

তোর খুড়ো তো সব সময় এই কথাই বলেন আর সে কথা চিন্তা করে আমিই প্রায় পাগল হতে চলেছি।

গণেশ একটু হেসে বলে, গঙ্গা একটু পড়াশুনা করুক ; পড়াশুনা করলে ওর মন ভাল থাকবে। আপনি আর খুড়ো অনুমতি দিলে আমি ওকে পড়াতে পারি।

কিন্তু আমার মেয়ে কি পড়তে রাজি হবে?

মনে হয়, আমার অনুরোধ ও রাখবে। আর যদি আমার কথাতে রাজি না হয়, তাহলে ঠাকুমাকে পাঠাবো।

গণেশ মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, ঠাকুমার কথা ও কিছুতেই ফেলতে পারবে না। ও বুড়ীর সঙ্গে গঙ্গার তো দারুণ ভাব।

দ্যাখ চেষ্টা করে।

ঘোষাল গিন্নী আবার একবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, পড়াশুনা করে মেয়েটা যদি একটা স্বাভাবিক হয়, তাহলে আমরা তো বেঁচে যাই!

খুড়ীমা, আমার বিশ্বাস গঙ্গা পড়াশুনা করলেই ভাল থাকবে। আপনি অত চিন্তা করবেন না। আমি ওর সঙ্গে একটু কথা বলে দেখি, ও কি বলে।

হ্যাঁ, দ্যাখ।

গঙ্গা!

ও ছোড়দা! এসো।

গণেশ ঘরের মধ্যে ঢুকতেই গঙ্গা একটা আসন পেতে দেয় ; বলে, বসো।

গণেশ আসনে বসেই বলে, তুই আমাদের বাড়ি যাস না কেন? আমার সঙ্গে বা ঠাকুমার সঙ্গে একটু গল্প করতেও ইচ্ছে করে না?

সত্যি বলছি ছোড়দা, আজকাল আমার কিছুই ভাল লাগে না।

আমি এসেছি বলে তোর কি খারাপ লাগছে?

তা কেন লাগবে?

গণেশ একটু হেসে বলে, আমি এসেছি বলে তুই কি খুশি হয়েছিস?

তোমাকে আমার সব সময়ই ভাল লাগে।

সত্যি বলছিস?

হ্যাঁ, ছোড়দা, সত্যি কথাই বলেছি। তুমি হিন্দু কলেজে পড়ছো শুনে আমার খুব

ভাল লেগেছে। তুমি ছাড়া আমাদের পাড়ার আর কেউ তো হিন্দু কলেজে পড়েনি।

তুই তো ছোটবেলায় পড়াশুনা করতে খুব ভালবাসতিস।

পড়াশুনা করতে কার না ভাল লাগে?

না রে গঙ্গা, সবাই পড়াশুনা করতে ভালবাসে না।

গণেশ সঙ্গে সঙ্গেই বলে, গঙ্গা, আমার একটা কথা রাখবি?

বলো, কি কথা ; পারলে নিশ্চয়ই রাখবো।

তোর কি মনে হয়, আমি এমন কথা বলব, যা রাখা তোর অসাধ্য?

না, তা না, কিন্তু...

গঙ্গা, তোকে আমার কথা রাখতেই হবে। তুই আমার কথা না রাখলে আমি আর কোনদিন তোর কাছে আসব না।

না, ছোড়দা, ওভাবে বলো না। আমি তোমার কথা রাখবো ; বলো, কি বলতে চাও।

তুমি আবার পড়াশুনা শুরু কর। আমি তোকে পড়াব।

এখন পড়াশুনা করে কী হবে?

পড়াশুনা করলে তোর জ্ঞান বাড়বে, বুদ্ধি বাড়বে, ভাল-মন্দ বিচার করতে শিখবি। সব চাইতে বড় কথা পড়াশুনা করলে তুই আনন্দ পাবি।

কিন্তু...

না, গঙ্গা, কোন কিন্তু আমি শুনব না। তোকে পড়াশুনা করতেই হবে।

তোমার সময় হবে আমাকে পড়াবার?

হ্যাঁ, হবে।

কিন্তু তোমার পড়াশুনার তো ক্ষতি হবে?

না, হবে না।

সত্যি বলছ?

গণেশ একটু হেসে বলে, গঙ্গা, আমি মিথ্যে কথা বলি না।

তা আমি জানি।

গণেশ উঠে দাঁড়ায়। বলে, তুই কাল থেকেই পড়াশুনা শুরু করবি।

কাল থেকেই?

হ্যাঁ, কাল থেকেই। তুই রোজ বিকেল চারটে নাগাদ আমাদের বাড়ি আসবি। আমি তোকে রোজ ঘণ্টা দুয়েক পড়াব।

ছোড়দা, যদি কেউ হাসাহাসি করে?

যে যা ইচ্ছে বলুক বা ভাবুক, তুই মন-প্রাণ দিয়ে পড়াশুনা করবি। অন্যের কথায়

তোর কান দেবার দরকার নেই।

গণেশ একটু হেসে বলে, গঙ্গা, আমি আসছি।

গঙ্গা মুহূর্তের জন্য ওর চোখের পব চোখ রেখে একটু হেসে বলে, ছোড়দা, তুমি আমাকে খুব ভালবাসো, তাই না?

নিশ্চয়ই তোকে ভালবাসি।

পরের দিন থেকেই গঙ্গা গণেশের কাছে পড়াশুনা শুরু করে।

কয়েক দিনের মধ্যেই গঙ্গা একদম বদলে যায়। ও আর চুপ করে বসে থাকে না। সকাল আর সন্ধের পর ও কত কি পড়ে, কত কি লেখে।

ঘোষাল দম্পতি অবাক। খুশিও।

খুশি না হবার কোন কারণ নেই। একটি নয়, দু'টি নয়, ছ'টি সন্তান অতি শৈশবেই মারা গেছে ; বেঁচে আছে শুধু গঙ্গা। সেই গঙ্গা বিধবা হয়ে এমনভাবে দিন কাটাচ্ছিল যে ওঁরা দু'জনে তা সহ্য করতে পারছিলেন না। মেয়েটা গণেশের কাছে পড়াশুনা শুরু কবেই এমন বদলে যাবে, তা ওরা ভাবতে পারেন নি। গঙ্গা লেখাপড়া নিয়ে মেতে আছে দেখে ওঁদের খুশির শেষ নেই।

নীলকমল একদিন স্ত্রীকে বললেন, গঙ্গা যতদিন ইচ্ছে লেখাপড়া করুক, আমি কোনদিন বাধা দেব না। আমাদের মেয়েটা তো যথেষ্ট বুদ্ধিমতী ; তার উপর গণেশের হাতে পড়েছে। তুমি দেখে নিও গঙ্গা লেখাপড়া শিখে একদিন সবাইকে তাক লাগিয়ে দেবে।

ঘোষাল গিন্নী দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বলেন, ভগবান যেন তাই করেন।

এইভাবেই দিনগুলো এগিয়ে যায়।

সেদিন অত রাত পর্যন্ত গঙ্গাকে পড়াশুনা লেখালেখি করতে দেখে নীলকমল বলেন, মা, আজ এত রাত পর্যন্ত পডাশুনা করছিস কেন?

কাল যে ছোড়দা তিনটি বিষয়ে পরীক্ষা নেবে।

গণেশ কি তোর পরীক্ষা নেয়?

ও বাবা! প্রত্যেক সপ্তাহে পরীক্ষা দিতে হয়।

কাল তোকে কী কী বিষয়েব পরীক্ষা দিতে হবে?

ইতিহাস, বাংলা সাহিত্যে আর ইংরেজি।

নীলকমল অবাক হয়ে বলেন, মা, তুই ইংরেজিও পড়িস?

হ্যাঁ, পড়ি।

তুই ইংরেজি পড়তে পারিস?

হ্যাঁ, পারি।

ইংরেজি লিখতে পাবিস?

হ্যাঁ, লিখতেও পারি।

নীলকমল ছুটে গিয়ে স্ত্রীকে ডেকে এনে গর্বের সঙ্গে বলেন, ওগো, আমাদের গঙ্গা ইংরেজি পড়তেও পারে, লিখতেও পারে।

ঘোষাল গিন্নী একগাল হেসে বলেন, বলো কি?

উনি সঙ্গে সঙ্গেই বলেন, হ্যাঁরে গঙ্গা, তুই সত্যি ইংরেজি লিখতে-পড়তে পারিস?

হ্যাঁ, মা পারি।

ঘোষাল গিন্নী স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলেন, গণেশ ঠিকই বলেছিল, খুড়ীমা, গঙ্গা পড়াশুনা করলেই ভাল থাকবে।

এরই মধ্যে গণেশ হিন্দু কলেজ থেকে পাশ করে মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারী পড়তে শুরু করে। সারা পাড়ায় হইচই পড়ে যায়। সবার মুখেই এক কথা, আমাদের গণেশ ডাক্তারী পড়ছে।

যার শুরু আছে, তার শেষও আছে।

দেখতে দেখতে ক'টা বছর কেটে গেল। গণেশ মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ করে ডাক্তার হলো।

ইতিমধ্যে গঙ্গার পড়াশুনা একদিনের জন্যও বন্ধ হয়নি। গণেশ ওকে রোজ পড়িয়েছে, গঙ্গাও মন-প্রাণ দিয়ে পড়েছে। কত কি জেনেছে, শিখেছে।

আরো একটা ঘটনা ঘটে গেছে এই ক'বছরে। গণেশ আর গঙ্গা পরস্পরকে ভালবেসেছে। একদিনের জন্যও কেউ কাউকে না দেখে থাকতে পারে না।

ছোড়দা, এবার কী হবে?

কী হবে মানে?

তোমাদের বাড়ির সবাই যে তোমাব বিয়ে দেবার জন্য খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

আমার জীবনে গঙ্গা ছাড়া অন্য কোন মেয়ের জায়গা নেই। আমি তোমাকেই বিয়ে করব।

আমাকে?

হ্যাঁ, তোমাকে।

কিন্তু আমি যে বিধবা। বিধবার কি বিয়ে হতে পারে?

গণেশ ওর দু'টি হাত ধরে বলে, তুমি বিধবা হয়েছ বলে তো তোমার শরীরটা

পাথর হয়ে যায়নি, তোমার স্বাদ-আহ্লাদের ইচ্ছাও মরে যায়নি।

হ্যাঁ, ছোড়দা, আমার শরীর পাথরও হয়নি, আমার স্বাদ-আহ্লাদও মরে যায়নি। তোমাকে পাবার জন্য আমার মনও পাগল হয়ে উঠেছে কিন্তু...

গণেশ ওর ঠোঁটের উপর আলতো করে হাত রেখে বলে, গঙ্গা, তোমাকে পাবার জন্য আমার মনও পাগল হয়ে উঠেছে। তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না। আমাকে ছাড়া তুমি বাঁচবে না।

হ্যাঁ, ছোড়দা, সত্যি আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচব না।

গঙ্গা, আমাদের সমাজ আমাদের বিয়ে কখনই মেনে নেবে না কিন্তু আমরা বিয়ে করবই।

আমিও তোমাকে বিয়ে করতে চাই কিন্তু...

গণেশ চাপা গলায় বলে, গঙ্গা, আমরা খ্রীস্টান হয়ে বিয়ে করব।

গঙ্গা ওর কথা শুনে অবাক হয়ে বলে, তুমি শুধু আমাকে বিয়ে করার জন্য খ্রীস্টান হবে?

গণেশ একগাল হেসে বলে, কেন হবো না? তোমাকে পাবার জন্য আমি সবকিছু করতে রাজি।

ও পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে বলে, গঙ্গা, এছাড়া তো অন্য কোন পথ নেই কিন্তু তুমি কি রাজি খ্রীস্টান হতে?

গঙ্গা একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, হ্যাঁ, আমি রাজি।

পরের রবিবারই ওরা হেদুয়ার পাশের কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গির্জায় খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করে ও বিয়ে করে। তারপরের দিনই গণেশ নববিবাহিতা স্ত্রী গঙ্গাকে নিয়ে চলে যায় মাদ্রাজ হাসপাতালে চাকরি করতে।

তেরো

শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক। হঠাৎ একদিন ঈশ্বরচন্দ্র শুনলেন বৃদ্ধ বাচস্পতিমশাই অত্যন্ত অসুস্থ ও তাঁকে অবিলম্বে দেখা করতে বলেছেন।

পরের দিনই ঈশ্বরচন্দ্র বাচস্পতির বাড়ি হাজির।

ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর অধ্যাপককে প্রণাম করেই বলেন, দেখছি, আপনি তো বেশ অসুস্থ।

হ্যাঁ, ঈশ্বর, সত্যি আমি খুব অসুস্থ।

ওষুধ খাচ্ছেন?

না।

বাচস্পতিমশাই একটু থেকে বলেন, ঈশ্বর, সেইজন্যই তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি। আমি মৃত্যু-পথ-যাত্রী বৃদ্ধ কিন্তু নিদারুণ অর্থাভাবে চিকিৎসা করাতে পারছি না।

আপনি কিছু চিন্তা করবেন না। আমি আজই কোন বিশিষ্ট কবিরাজকে পাঠাবো আপনাকে দেখতে ও প্রয়োজনীয় ওষুধ দিতে।

ঈশ্বরচন্দ্র মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, আমি মাঝে মাঝেই আপনাকে দেখে যাবো আর কবিরাজ মশায়ের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখবো।

উনি বাচস্পতি মশাইকে প্রণাম করে বিদায় নেবার উদ্যোগ নিতেই বৃদ্ধ অধ্যাপক বলেন, ঈশ্বর, দাঁড়াও। তোমার নতুন মাকে প্রণাম করে যাও।

বৃদ্ধ অধ্যাপক বাড়ির ভিতর থেকে বারো-তেরো বছরের এক কিশোরীকে এনে বলেন, ঈশ্বর, ইনি তোমার নতুন মা।

ঈশ্বরচন্দ্র মুহূর্তের জন্য অসুস্থ বৃদ্ধ মৃত্যুপথযাত্রী অধ্যাপকের কিশোরী স্ত্রীকে দেখেই চমকে ওঠেন। কোন মতে ঐ কিশোরী অধ্যাপক-পত্নীকে প্রণাম করেই উনি কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে আসেন ও ঐ কিশোরীর আসন্ন বৈধব্যের কথা চিন্তা করেই অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। বার বার মনে হয়, কেন, কেন ঐ বৃদ্ধ মৃত্যু-পথ-যাত্রী অধ্যাপক এই কিশোরীকে সমস্ত জীবন বৈধব্যেরযন্ত্রণা ভোগ করাবার জন্য বিয়ে করলেন?

আরো কত প্রশ্ন আসে ঈশ্বরচন্দ্রে মনে।

স্বামীর স্মৃতি বুকে নিয়ে এই কিশোরী সারাজীবন ব্রহ্মচারিনি থাকবে? থাকতে পারবে? থাকা সম্ভব?

যে মেয়ের পতিধর্ম সম্পর্কে কোন জ্ঞানই নেই, বিধবা হবার পর একদল অকালকুষ্মাণ্ড ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পুরোহিত তাকে হাজার রকম নিয়ম-শৃঙ্খলে বেঁধে দিলেই কি সে সন্ন্যাসিনী হয়ে যাবে? তার স্বাদ-আহ্লাদ কামনা-বাসনা চলে যাবে?

অসম্ভব। অকল্পনীয়। অবাস্তব।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন, না, না, এ চলতে পারে না। বাল্যবিবাহ বন্ধ করতেই হবে। যে বিধবারা আবার ঘর-সংসার করে বাঁচতে চায়, তাদেরও সে অধিকার দিতে হবে।

কিন্তু সে অধিকার দিতে হবে বললেই তো দেওয়া যায় না। এতদিনের সংস্কার ভাঙা কি সহজ কাজ?

বিধবাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করার চিন্তা ঈশ্বরচন্দ্রের মনে হয়েছে বহুকাল ধরেই। ন'বছর বয়সে বীরসিংহ ছেড়ে ঈশ্বরচন্দ্র বাবা ঠাকুরদাসের সঙ্গে কলকাতায় যে ভাগবতচরণ সিংহের আশ্রয়ে উঠেছিলেন, সেখানে গৃহস্বামীর বিধবা কন্যা রাইমণির কাছে সন্তান-স্নেহ পেয়ে উনি ধন্য হয়েছিলেন কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র পরিণত বয়সেও ভুলতে পারেনি অকাল বিধবা রাইমণির বেদনাবিধুর মুখখানি।

এত বছর পর সেই মুখখানি আবার ঈশ্বরচন্দ্রের চোখের সামনে ভেসে উঠলো।

কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র খুব ভাল করেই জানতেন, কুসংস্কার দূর করতে হলে চাই শিক্ষা। মেয়ে-পুরুষের সমানভাবে শিক্ষিত না হলে সমাজ থেকে এই কুসংস্কার কিছুতেই দূর করা যাবে না। তাইতো রামমোহনের মত তিনিও চেয়েছিলেন আগে চাই শিক্ষার বিস্তার।

বিদ্যাসাগর কর্মজীবনের প্রথম দিকে আত্মনিয়োগ করেন শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার ও যুগোপযোগী করতে। তারপর সমস্ত চিন্তা-ভাবনা কর্মশক্তি নিয়োজিত করেছেন শিক্ষার বিস্তারে। খুলেছেন ছেলেদের ও মেয়েদের স্কুল ; সরকারী অর্থ সাহায্য না পেয়ে নিজের রোজগারের টাকায় চালিয়েছেন কত স্কুল কিন্তু তিনি ভীষ্মের পণ করলেন, বাল্যবিধবা বন্ধ করতেই হবে এবং চাই বিধবা বিবাহের আইনী স্বীকৃতি।

যে সমাজে বাল্য বিধবার সংখ্যা অসংখ্য, সে সমাজে কখনও কখনও বিধবা বিবাহের উদ্যোগ খুবই খুবই স্বাভাবিক। দু'চারজন প্রভাবশালী বিত্তশালী বাল্যবিধবা মেয়ের দুঃখে জর্জরিত, এইরকম উদ্যোগ নিয়েও শেষ পর্যন্ত মেয়ের বিয়ে দিতে পারেননি। রামমোহনের আত্মীয় সভার অনেক অধিবেশনেই বিধবাদের দুঃখ-কষ্ট মোচনের ব্যাপারে আলোচনাও হয়েছে। সতীদাহ ও বহু বিধবা নিয়ে তো নিত্য আলোচনা হতো ঐসব সভায়।

সামাজিক ও হিন্দুধর্মের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রথম প্রকাশ্যে সমালোচনায় মুখর

হয় ডিরোজিওর "অ্যাকাডেমিক এসোসিয়েশন।" ডিরোজিওর ছাত্র ও শিষ্যরা প্রকাশ্য রাজপথে দাঁড়িয়ে চিৎকার করতো—দূর করো কুসংস্কার।

এই সময় সরকার নিয়োজিত ভারতীয় আইন কমিশন হিন্দু বিধবা বিবাহের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বহুজনের সঙ্গে আলোচনা করার পর এই বিষয়ে আইনি পদক্ষেপ নিতে সাহস করে নি।

কৃষ্ণনগরের রাজা শ্রীশচন্দ্র বিধবা বিবাহের ব্যাপারে নবদ্বীপের বিশিষ্ট পণ্ডিতদের মতামত জানতে চাইলে তারা বললেন, হ্যাঁ, বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসম্মত কিন্তু দেশাচার বিরোধী ; সুতরাং বিধবা বিবাহ সমর্থন করা যায় না।

কৃষ্ণনগরবাসী হিন্দু কলেজের কিছু প্রাক্তন ছাত্র ও ডিরোজিওর ভক্তরা বিধবা বিবাহের সপক্ষে জনমত গঠনের জন্য সভাও করেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন গোঁড়া হিন্দুরা।

তারপর মঞ্চে অবতীর্ণ হলেন দেবেন্দ্রনাথ। তিনি তাঁর 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় বিধবা বিবাহের সপক্ষে রীতিমত প্রচার অভিযান চালালেন।

না, এত কাণ্ডের পরও বিধবাদের দুঃখ-কষ্ট ব্যথা-বেদনা একটুও কমলো না।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দেবেন্দ্রনাথের 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা'—এই নামে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। পরে উনি এই লেখাটিকে এক পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করেন। বিধবা বিবাহের সমর্থক আর বিরোধীরা সমানভাবে ব্যগ্র হলেন এই পুস্তিকা পড়তে। কয়েক দিনে দু'হাজার পুস্তিকা বিক্রি হয়ে যাওয়ায় বিদ্যাসাগর আরো তিন হাজার পুস্তিকা ছাপালেন কিন্তু আবার কয়েক দিনের মধ্যে তাও বিক্রি হয়ে গেল। এবার বিদ্যাসাগর ছাপালেন দশ হাজার কপি ; সে দশ হাজার কপিও বিক্রি হলো খুব অল্প সময়ের মধ্যেই। এই পুস্তিকার অভাবনীয় জনপ্রিয়তায় বিদ্যাসাগর খুবই অনুপ্রাণিত হলেন।

এই পুস্তিকা চারদিকে ছড়িয়ে পড়তেই হিন্দু সমাজে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল ; উৎসাহিত হলেন সমর্থকরা, বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন বিরোধীরা। শুরু হলো বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে জঘন্য কুৎসা প্রচার ; এমন কি তাঁর চরিত্র নিয়েও প্রশ্ন তুললেন অনেকে।

কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন বিচিত্র ধাতুতে গড়া। চিন্তা-ভাবনা করে কোন বিষয়ে উনি একবার মনস্থির করলে, তিনি নিন্দা-প্রশংসা বিদ্রূপ-বিক্ষোভ গ্রাহ্য করার পাত্র ছিলেন না। বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে তিনি তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের পথে এগিয়ে যেতেন।

তত্ত্ববোধিনী ও সমাচার সুধাবর্ষণ থেকে শুরু করে সব পত্র-পত্রিকায় শুরু হলো

সমালোচনা। যথারীতি কোন পত্রিকা বিদ্যাসাগরের মতামত সমর্থন করে, কোন কোন পত্রিকা তীব্র নিন্দা করে। সমর্থন ও বিরোধিতায় লেখা হলো কত কবিতা, ছড়া আর গান। ঈশ্বর গুপ্ত লিখলেন—

বাধিয়াছে দলাদলি, লাগিয়াছে গোল।
বিধবার বিয়ে হবে, বাজিয়াছে ঢোল।।
কত বাদী প্রতিবাদী, করে কত রব।
ছেলে বুড়ী আদি করি, মাতিযাছে সব।।
কেউ উঠে শাখা পরে, কেহ থাকে মুলে।
করেছি প্রমাণ জড়ো, পাঁজি পুঁথি খুলে।।
এক দলে যত বুড়ো, আর দলে ছোঁড়া।
গোঁড়া হয়ে মাতে সব, দেখে নাক গোড়া।।
লাফালাফি দাপাদাপি করিতেছে যত।
দুই দলে খাপাখাপি, ছাপাছাপি কত।।
বচন রচন করি, কত কথা বলে।
ধর্মের বিচার পথে কেহ নাহি চলে।।

দাশরথি রায়ও এই সুযোগ ছাড়লেন না ; লিখলেন কত পালা গান।

বিবাহ কবিতে দিদি
আছে বিধবাদের বিধি
মরুক দেশের পোড়া কপালে
সকলে
কথা ছাপিয়ে রাখে হয়ে বাদী।
আমাদিগের দিতে নাগর
এলেন গুণের সাগর
বিদ্যাসাগর
বিধবা পাব কত্তে তরির গুণ ধরেছেন গুণনিধি।...

তবে সব চাইতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করলো শান্তিপুরের তাঁতিরা 'বিদ্যাসাগর-পেড়ে' শাড়ি তৈরি করে। ঐসব শাড়ির পাড়ে লেখা থাকতো—

বেঁচে থাক বিদাসাগর
চিবজীবী হয়ে
সদরে করেছে রিপোর্ট
বিধবাদের হবে বিয়ে।

কবে হবে এমন দিন,
প্রচার হবে এ আইন,
দেশে দেশে জেলায় জেলায়
বেরোবে হুকুম,
বিধবা রমণীর বিয়ের লেগে যাবে ধুম,
সধবাদেব সঙ্গে যাবো, বরণডালা মাথায লয়ে।
আর কেন ভাবিস লো সই
ঈশ্বর দিয়াছেন সই
এবার বুঝি ঈশ্বরেচ্ছায় পতিপ্রাপ্ত হই :
বাধাকান্ত মনোভ্রান্ত ছিলেন নাকো সই,
লোকমুখে শুনে আমরা
আছি লোক লাজ ভয়ে।

মেয়েরা তখন ঐ শাড়ির জন্য পাগল। এমন কি অনেকে বেশি দাম দিয়ে ঐ শাড়ি কিনতে শুরু কবলেন।

এর আগে বিধবা বিয়ে নিয়ে কত আলাপ-আলোচনা লেখালেখি হলেও নারী সমাজে তার কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায নি কিন্তু এবার ঈশ্বরচন্দ্র পবাশর-সংহিতার "নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে, পতৌ। পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরণ বিধীয়তে।। ব্যাখ্যা করে এমনভাবে বিধবা বিবাহের সপক্ষে মতামত প্রকাশ করলেন যে কেউই তা উপেক্ষা করতে পারলেন না। চির উপেক্ষিত, চিরনির্যাতিতা নারীরা যেন এই প্রথম মুক্তি সূর্যের আলো দেখে অভাবনীযভাবে আশান্বিত হয়ে উঠলেন ঈশ্বরচন্দ্র তখন প্রতিটি নারীব কাছে জীবন্ত দেবতা, চিবপূজ্য, চির প্রণম্য। ঘরে ঘরে তখন মেয়েরা বিদ্যাসাগরকে নিয়ে কত কি আলোচনা করে।

সুহাসিনী ছুটে এসে বিন্দুবাসিনীকে জড়িযে ধরে বলে, দিদি, শুনে এলাম বিদ্যাসাগর বলে একজন খুব বড পণ্ডিত বলেছেন বিধবারাও বিয়ে করতে পাবে

যা, তা হয় নাকি?

বিন্দুবাসিনী না থেমেই বলে, এমন ছিষ্টিছাড়া কথা কে তোকে বলল?

ও দিদি, সত্যি বলছি. নকুল হালদাবের যে ছেলে ওকালতি করে, সে ওর বিধবা বোনকে বলছিল।

কী বলছিল?

বলছিল যে বিদ্যেসাগর মশায়ের কথামত সরকার যদি বিধবা বিয়ের আইন পাশ

করে, তাহলে উনি ঠিক ঐ বোনের বিয়ে দেবেন।

সুহাসিনী মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, নকুল হালদারের এই মেয়েটা তো বিয়ের তিন মাসের মধ্যেই বিধবা হয়ে বাপের বাড়ি ফিরে এলো। ও তো আমার চেয়েও বছর খানেকের ছোট।

বিন্দুবাসিনী একটু রেগেই বলে, নকুল হালদার যদি পুরুত ঠাকুরের কথামতো ঘাটের মড়ার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেয়, তাহলে যে ও বিধবা হবে, এ তো জানা কথা।

ও একটু ম্লান হাসি হেসে বলে, বাপ-মা নেই বলে পিসীও কোনমতে আমাদের দু'জনকে পার করার জন্য যে দু'জনের সঙ্গে বিয়ে দিল, তারা দু'জনেই তো খারাপ রোগে ভুগছিল।

সুহাসিনী বলে, সত্যি দিদি, পিসী যে কেন অমন দু'জন রুগীর সঙ্গে আমাদের বিয়ে দিয়েছিল, তা ভেবে পাই না।

আমাদের বিয়ে না দিয়ে যে পিসীর ঘুম হচ্ছিল না।

যাই বল দিদি, বিদ্যেসাগর মশায়ের কথা মতো বিধবাদের বিয়ের ব্যবস্থা হলে খুব ভাল হবে।

ভাল হয় ঠিকই কিন্তু পিসী-মাসী জ্যাঠা-খুড়োর দল তো হইহই করবে।

বিন্দুবাসিনী ছোট বোনকে একটু কাছে টেনে নিয়ে বলে, আমি বলে দিচ্ছি, যদি সত্যি সত্যি বিধবা বিয়ে চালু হয়, তাহলে যেভাবেই হোক আমি তোর বিয়ে দেব।

তুইই বা বিয়ে করবি না কেন? মোটে তো দু'বছর স্বামীর ঘর করেছিস।

বিন্দুবাসিনী একটু হেসে বলে, তা করেছি বৈকি। দুটো বছর ঐ ক্ষয়রোগের রুগীর থুতু-কাশি ফেলেছি, কাপড়-চোপড় কেচেছি। একদিনের জন্যও স্বামীর সোহাগ পেয়েছি বলে তো মনে পড়ে না।

ও না থেমেই বলে, আর পিসী যে হতচ্ছাড়া বুড়োর সঙ্গে তোর বিয়ে দিল, তার তো স্বামী হবারই ক্ষমতা ছিল না কিন্তু লোকে তো বিশ্বাস করবে না যে আসলে আমরা দু'জনেই এখনো কুমারী আছি।

হ্যাঁ, দিদি, ঠিক বলেছিস , এসব কথা কেউ বিশ্বাস করে না।

সবই কপাল!

রোজ খেতে বসেই কুমুদিনী চোখের জল ফেলবেনই। শাশুড়ির হুকুম, সধবাদের মাছ খেতেই হবে ; না খেলে স্বামীর অকল্যাণ হবে। তাই বাধ্য হয়ে কুমুদিনীকে একটু মাছ খেতেই হয় কিন্তু গলা দিয়ে যেন নামে না।

নামবে কি করে?

যার তিন-তিনটে মেয়েই বিধবা হয়ে আবার ফিরে এসেছে সে কি করে চোখের

জল না ফেলে মাছ খাবে?

তাছাড়া কতই বা বয়স মেয়েদের?

বড় মেয়ে হেমাঙ্গিনী সামনের বোশেখে কুড়িতে পড়বে; মেজ মেয়ে হেমল ওর চাইতে ঠিক দু'বছর ছোট। ছোট মেয়ে হেমপ্রভা তো সবে পনেরয় পড়েছে

শুধু কুমুদিনী না, ওর স্বামীও আর মাছ খেতে পারেন না। মা বেশি জোর জু করলে বরদাকান্ত স্পষ্ট বলে দেন, তিনটে মেয়ে শুধু ডাল আর শাক-পাতার ঝো খাবে, আর আমি মাছ খাবো, তা কখনও হয়? না, না আমাকে কখনো মাছ খে বলবে না।

বরদাকান্ত আর কুমুদিনীর মুখ থেকে হাসি চলে গেছে চিরদিনের ম হেমাঙ্গিনী সাদা থান পরে এই বাড়িতে ফিরে আসার পর একদিনের জন্যও ম বাবার মুখে হাসি দেখেনি।

এতদিন পর হঠাৎ বাবাকে হাসতে হাসতে বাড়িতে ঢুকতে দেখে হেমাঙ্গি অবাক হয়ে যায়। বরদাকান্ত হাসতে হাসতেই ওকে বলে, শিগগির তোর মা আমার ঘরে আসতে বল তো!

কুমুদিনী প্রায় ছুটে আসেন। বলেন, হ্যাঁগো, তুমি ডাকছ কেন?

গিন্নী, দারুণ খবর আছে।

কি খবর গো?

তুমি বিদ্যাসাগর মশায়ের নাম শুনেছ?

কুমুদিনী মাথা নেড়ে বলেন, না তো!

গিন্নী, তুমি ভাবতে পারবে না, উনি কত বড় পণ্ডিত।

তাই ওনাকে বিদ্যাসাগর বলে?

উনি শুধু বিদ্যাসাগর না, দয়ারসাগরও।

বরদাকান্ত মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, যে কথা কেউ বলতে সাহস করে সেই বিধবা বিয়ের কথা নিয়ে উনি কি অসাধারণ একটা পুস্তিকা লিখেছেন, তা তু ভাবতে পারবে না।

ওনার তো সাহস আছে।

কুমুদিনী না থেমেই বলেন, আমরা একাদশীর দিন মেয়েদের একটু জ খাওয়াতে সাহস করি না আর উনি বিধবা বিয়ের কথা বলেছেন?

বলেছেন মানে?

বরদাকান্ত একবার নিঃশ্বাস নিয়েই বলেন, শাস্ত্র ঘেঁটে উনি এমন সব যুক্তি দি বিধবা বিয়ের কথা বলেছেন যে কেউ টুঁ শব্দটি করতে পারছে না।

কিন্তু উনি বললেই কি বিধবাদের বিয়ে হবে?

দাঁড়াও, দাঁড়াও ; এখন এমন সব ঘটনা ঘটছে যা আগে আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারতাম না।

তা যা বলেছ!

তোমাকে আমি বলে রাখছি, যদি বিদ্যাসাগর মশায়ের কৃপায় বিধবা বিয়েব আইন পাশ হয়, তাহলে আমি ঠিক আমার মেয়েদের বিয়ে দেব।

বরদাকান্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, ওদের দুঃখ আর সহ্য করা যাচ্ছে না।

গঙ্গাস্নান করে বাড়ির মধ্যে পা দিয়েই কুসুমকুমারী একগাল খুশির হাসি হেসে চিৎকার করে, ও মা! আজ দারুণ কাণ্ড হয়েছে।

প্রসন্নময়ী উৎকণ্ঠার সঙ্গে বলেন, কি আবার দারুণ কাণ্ড ঘটলো?

মা, তুমি বিশ্বাস করো, আজ সাক্ষাৎ ভগবানের দেখাও পেয়েছি, তাঁকে প্রণামও করেছি।

পাগলের মত কি যা তা বলছিস?

না, মা, পাগলের মত যা তা বলছি না। তুমি বিশ্বাস করো, আজ বিদ্যাসাগর মশায়ের সঙ্গে দেখা হলো।

বলিস কিরে?

গঙ্গায় ডুব দিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াতেই দেখি, একদল মেয়ে একজনকে ঘিরে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলছে, বাবা, তুমি আমাদের বাঁচাও। আমরা আর দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে পারছি না।

তারপর?

আমি তো বুঝতে পারিনি, ঐ লোকটা কে ; তারপর একটা মেয়েকে জিজ্ঞেস করতেই জানলাম, উনি বিদ্যাসাগর মশাই।

কুসুমকুমারী না থেমেই বলে, আমি ওনাকে প্রণাম করতেই উনি বললেন, মা, আপনার কল্যাণ হোক।

প্রসন্নময়ী জিজ্ঞেস করেন, বিদ্যাসাগর মশাই গঙ্গায় চান করতে গিয়েছিলেন?

না, না।

তবে?

কাছেই যে সিংহদের বাড়ি আছে। সেই বাড়ির রাইমণি বলে এক বিধবা বুড়ীকে বিদ্যাসাগর মশাই প্রণাম করতে গিয়েছিলেন। শুনলাম, ঐ বুড়ীকে উনি নিজের মায়ের মত ভক্তি করেন।

প্রসন্নময়ী চুপ করে থাকলেও কুসুমকুমারী বলে যায়, মা, তুমি ভাবতে পারবে না, মেয়েরা ওনাকে কি শ্রদ্ধা করে।

ও মা-র দিকে তাকিয়ে বলে, বলো মা, সাক্ষাৎ ভববানকে দেখে এলাম কি না?

হ্যাঁ, কুসুম, আমাদের মত যাদের পোড়াকপাল, তাদের কাছে উনি সত্যি দেবতা। উনি ছাড়া কেউ আমাদের দুঃখ বোঝে না।

কালীঘাটের বারবনিতাদের পাড়াতেও বিদ্যাসাগরের কথা পৌঁছে যায়।

জানিস মোক্ষদা, আমার কাছে এক লেখাপড়া জানা বাবু আসে মাঝে মাঝেই। ঐ বাবু কাল রাত্তিরে আমার কাছেই ছিল।

ঐ যে চশমা পরা অল্পবয়সী লোকটার কথা বলছো?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক ধরেছিস।

ঐ বাবুর কি হয়েছে?

না, না, ওর কিছু হয়নি।

সরোজা একটু থেমে বলে, আমার ঐ বাবু হিন্দুদের কলেজে পড়ে। তুই ভাবতে পারবি না, ওর কি বিদ্যে-বুদ্ধি।

মোক্ষদা একটু হেসে বলে, ঐ বাবুর কি বউ নেই যে তোমাব কাছে আসে?

হ্যাঁ, আছে কিন্তু আমাকেও খুব ভালবাসে।. . তাছাড়া..

তাছাড়া কী?

যারা কলেজে পড়ে, যাদের অনেক বিদ্যে-বুদ্ধি, তারা মদও খায় কিন্তু বাড়িতে তো খেতে পাবে না। তাই আমার কাছে এসে ও মদ খেতে খেতে কত গল্প করে।

মোক্ষদা একটু থেমে বলে, আজ হঠাৎ এই বাবুর কথা বলতে শুরু করলে কেন?

কাল ওর কাছে একটা দারুণ খবর পেলাম।

কী খবর গো?

বিদ্যেসাগর বলে একজন দারুণ বড় পণ্ডিত নাকি বই ছাপিয়ে বলেছেন, বিধবাদেরও বিয়ে.হতে পারে।

মোক্ষদা চমকে ওঠে, বলো কী দিদি? বিধবাদের আবার বিয়ে হবে?

ঐ বাবু বলছিল, বোধহয় ঐ বিদ্যেসাগরের কথা মতো গরমেন্ট আইন করবে।

না, দিদি, তা হতে-পারে না। হিন্দুর ঘরের মেয়েরা কখনই দুটো বিয়ে করতে পাবে না।

ওর কথা শুনে সরোজা রেগে যায় ; বলে, কেন পারে না। মিনসেগুলো যদি গণ্ডা গণ্ডা বিয়ে করতে পারে, তাহলে মেয়েরা পাববে না কেন?

দু'এক মিনিট চুপ করে থাকার পর মোক্ষদা বলে, দিদি, বেল পাকলে কাকের কী? বিধবাদের বিয়ের আইন হলেও তো আমাদের দুঃখ ঘুচবে না।

ও একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, আমাদের তো রোজ সেই রং-চং মেখে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে বাবুদের আশায়। ওরা দয়া করে আমাদের নিয়ে স্ফূর্তি করলে তবে আমরা দু'মুঠো খেতে পাবো।

তুই ঠিকই বলেছিস কিন্তু আমি ভাবছি, আমার পুরনো জীবনের কথা।

দিদি, পুরনো জীবনের কী কথা ভাবছ?

সরোজা একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, আমাদের বাড়ির কাছেই ভরত বলে একটা ছেলের বাড়ি ছিল। ভরত হেয়ার সাহেবের পাঠশালায় কয়েক বছর পড়াশুনাও করেছে কিন্তু হঠাৎ ওর বাবা মারা যাওয়ায় বেচারীকে লেখাপড়া ছেড়ে রোজগার শুরু করে। ওর খুব ইচ্ছে ছিল আমাকে বিয়ে করে।...

তোমারও ইচ্ছে ছিল?

হ্যাঁ, ছিল ; ও যে আমাকে খুব ভালবাসতো।

তোমাদের বিয়ে হলো না কেন?

দু'জনের কেউই সাহস করে বাড়িতে বলতে পারলাম না।

তোমরা বললেও বাড়ির লোকজন বিয়ে দিতো না।

সরোজা একটু চুপ করে থাকার পর বলে, বিয়ের দেড় বছরের মাথায় আমি বিধবা হয়ে বাপের বাড়িতে আসার পরও ভরত বলেছিল, সরোজা, আমি এখনও তোকে বিয়ে করতে চাই কিন্তু দু'বাড়ির কেউই তা মেনে নেবে না।

দিদি, তোমার সব্বোনাশ কে করেছিল?

আমার ছোটকাকার শালা।

হেমন্তমাসী একদিন বলছিল, তুমি পেটে ছেলে নিয়ে এখানে এসেছিলে?

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছে।

সরোজা মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, ঐ হারামজাদা খুব বড় কোবরেজকে দেখাবার নাম করে আমাকে এই নরকে এনে হেমন্তমাসীর কাছে দু'হাজার টাকায় বিক্রি করে চলে যায়।

দিদি, তুমি ভাবতে পারো, আমার আপন পিসতুতো ভাই আমার সব্বোনাশ করে এই নরকে ফেলে চলে যায়?

কেন ভাবতে পারবো না? সবাই তো ভরত হয় না।

একটু চুপ করে থাকার পর সরোজা একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, বিদ্যেসাগর মশাই আজ যা করছেন, তা ক'বছর আগে করলে ভরতের সঙ্গে আমার

বিয়ে হতে পারতো। এই নরকে জীবন কাটাতে হতো না।

দিদি, এই নরকে যারা আছে, তাদের বারো আনাই তো বিধবা ছিল। আত্মীয় স্বজনদের কেউ না কেউ তাদের সব্বোনাশ করেছিল বলেই তো...

জগদীশ্বর চাটুজ্যে শুধু জমিদার না ; মহা সম্মানিত ব্যক্তি। পরম ধার্মিক বাড়িতে বারো মাসে তেরো পার্বণ। তাছাড়া গৃহদেবতা রাধা-গোবিন্দের পুজো হয় প্রতিদিন।

জগদীশ্বর অত্যন্ত ধীর-স্থির মিষ্টভাষী হলেও আজ তিনি রাগে অত্যন্ত উত্তেজিত।

এই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভেবেছেন কী? উনি কি মনে করেছেন, শাস্ত্র শুধু উনিই জানেন, আর কেউ জানে না? বামুনের ঘরের কুলাঙ্গার না হলে কেউ এভাবে বিধবা বিয়ের ঢোল বাজাতে পারে?

জগদীশ্বর মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, লোকটার নাম মুখে আনতেও ঘেন্না হয়।

নকুলেশ্বর ভটচাজ টিকি দুলিয়ে বলেন, ঠিক বলেছেন বড়কর্তা। ঐ এক ম্লেচ্ছ রামমোহন হিন্দুধর্ম ধ্বংস করার জন্য সতীদাহ বন্ধ করলেন। এবার কাণ্ডজ্ঞানহীন বিদ্যেসাগর মশাই উঠে-পড়ে লেগেছেন বিধবা বিয়ে দিতে। এরা কি ভেবেছে। এটা মগের মুল্লুক? যা ইচ্ছে তাই করবে!

সাতকড়ি মুখুজ্জ্যে রসিকতা করে বলেন, ও ভট্চাজ মশাই, এবার বোধহয় বিদ্যেসাগর মশাই বলবেন, সধবাদের একাদশী করতে হবে।

হরনাথ বলেন, আমি তো ভাবতেই পারছি না, বিধবারা আবার শাঁখা-সিঁদুর পরে মাছ-মাংস খেয়ে নতুন সোয়ামীর সোহাগ পেয়ে ছেলেপিলের মা হবে।

নকুলেশ্বর সঙ্গে সঙ্গে বলেন, বুঝলে হরনাথ, ওরা জারজ সন্তান হবে।

জমিদার মশাই একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বলেন, তবে আমি বলে দিচ্ছি, আমার জমিদারীতে যদি কেউ বিধবার বিয়ে দেবার চেষ্টা করে, তাহলে আমি তাকে আস্ত রাখবো না ; জানে-প্রাণে শেষ করে দেব।

বিদ্যাসাগর মশাই খুব ভাল করেই জানতেন, শুধু শাস্ত্রী ব্যাখ্যা দিয়ে বিধবা বিয়ের সমর্থনে যা কিছুই করা হোক না কেন, তার দ্বারা বিধবা বিবাহ চালু করা যাবে না। চাই আইন।

বিদ্যাসাগর মশাই বিধবা বিয়ের হাজারখানেক সমর্থকের স্বাক্ষর-সহ এক দীর্ঘ আবেদনপত্র পেশ করলেন আইনসভার কাছে। উনি ঐ আবেদনে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেন যে শাস্ত্রে বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ না হলেও শুধু দেশাচারের জন্য বিধবা বিবাহ

হচ্ছে না কিন্তু শাস্ত্রের নির্দেশের চাইতে তো দেশাচার গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে না।

ব্যস! সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশে শুরু হলো তীব্র আন্দোলন ; কোথাও বিধবা বিবাহের পক্ষে, কোথাও বিপক্ষে। দু'পক্ষ থেকেই বহু আবেদনপত্র পাঠানো হলো আইন সভায়। বিধবা বিবাহকে সমর্থন জানালেন ভিঞ্চুরের মারাঠা নায়ক, পুণার ব্রাহ্মণ ও বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ, সেকেন্দ্রাবাদের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতরা ; বাংলাদেশের পণ্ডিতদের মতন দাক্ষিণাত্যের পণ্ডিতরাও দু'দলে বিভক্ত হলেন। তবে উত্তরপ্রদেশ ও আরো অনেক অঞ্চলের পণ্ডিতরা বিধবা বিবাহের বিরোধিতা করেন।

এই সময় ডিরোজিওপন্থীরা একজোট হয়ে বিধবা বিবাহের সমর্থনে খুব জোরালো দাবী জানায়।

শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ তর্ক-বিতর্কের পর ১৮৫৫ সালের ২৬ শে জুলাই আইন সভায় বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়। এই আইন কার্যকরি হয় ১৮৫৬ সালের ২৬ শে জুলাই।

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাঙ্গালী চরিত্রের বাক্যবিলাসিতাকে ব্যঙ্গ করে লিখলেন--

বাক্যের অভাব নাই, বদনভাণ্ডারে।
যত আসে তত বলে, কে দুষিবে কারে?
সাহস কোথায় বল, প্রতিজ্ঞা কোথায়?
কিছুই না হতে পারে, মুখের কথায়।।

কবি খুব ভাল করেই জানতেন, বিদ্যাসাগর বাঙালিদের মত বাচাল নন ; তিনি মুখে যা বলেন, কাজেও তাই করেন। তাছাড়া যে কাজই উনি শুরু করেন, তা শেষ করার মত চারিত্রিক দৃঢ়তাও তাঁর চরিত্রে আছে।

তাইতো ঐ ছড়াতেই ঈশ্বর গুপ্ত লিখলেন—

মুখে বলা বলা নয়, কাজে করা করা।।
সকলেই ভুড়ি মারে, বুঝে নাকো কেউ।
সীমা ছেড়ে নাহি খ্যালে সাগরের ঢেউ।।
সাগর যদ্যপি করে সীমার লঙ্ঘন।
তবে বুঝি হতে পারে, বিবাহ ঘটন।।

দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্বাবোধিনী পত্রিকায়লেখা হলো—"এই মহৎ ব্যাপার যে ক'এক ব্যক্তি অসামান্য ধীসম্পন্ন প্রসন্নমতি মহাত্মাদিগের সমবেত চেষ্টা দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে...কিন্তু তন্মেধে মহামান্য ও সর্বাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গুণ আমরা জীবন সত্ত্বেও ভুলিতে পারিব না। তাঁহার অদ্বিতীয় নাম এই অসাধারণ কীর্ত্তির সহিত মহীতলে চিরকাল জীবিত থাকিবে।"

'তত্ত্ববোধিনী' আরো লিখলো—"এই মহাব্যাপার—সম্পন্ন করিবার জন্য তিনি যে পর্যন্ত পরিশ্রম ও যে পর্যন্ত যত্ন স্বীকার করিয়াছেন, তাহা আমরা শতবর্ষেও বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারিব না।...তিনি এই শুভ সঙ্কল্প সিদ্ধ করণার্থে নিন্দাকে নিন্দা বোধ করেন নাই, অপমানকে অপমান জ্ঞান করেন নাই, এবং কটুবাক্যে উপহাসাদির প্রতি ভ্রূক্ষেপও করেন নাই,...তাঁহার ভূধরসম নিশ্চল স্বভাব কিছুতেই বিচলিত হয় নাই। বজ্র যেমন পর্বত পতিত হইয়া আপনিই তেজোহীন হয়, শত্রুগণের নিন্দাবাদ ও কটুবাক্য সকলও সেইরূপ তাঁহার উপর পতিত হইয়া আপনা হইতেই নিস্তেজ হইয়াছে।"

'তত্ত্ববোধিনী' একটুও অতিরঞ্জিত করে নি। দুঃখ-কষ্ট ব্যথা-বেদনা ও অকথ্য নির্যাতনের হাত থেকে চিরতরে মুক্তি দেবার জন্যই বিদ্যাসাগর এই মহৎ কাজে ব্রতী হয়েছিলেন কিন্তু দুঃখের কথা, এ হেন মহাত্মা মহাপুরুষকে খুন করার চক্রান্ত করেছিলেন একদল গণ্যমান্য ও ধনী ব্যক্তি। তারা বিদ্যাসাগরকে উচিত শিক্ষা দেবার জন্য এক দল গুণ্ডা নিয়োগ করলেন কিন্তু ঐ মূর্খের দল জানতো না তাঁর চরিত্রবল ও দুঃসাহসিকতার কথা।

সেদিন গণ্যমান্য ও ধনীরা ওদেরই গোষ্ঠীব একজনের বাড়িতে সমবেত হয়েছেন। আলোচনার বিষয় অবশ্যই বিদ্যাসাগর।

আরে মশাই, কিচ্ছু চিন্তা নেই। যে লেঠেলদের সাহায্যে এত বড় জমিদারী চালাচ্ছি, তাদেরই বলেছি, বিদ্যাসাগরকে ঠাণ্ডা করে দিতে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, বিদ্যাসাগরকে এমন শিক্ষা দিতে হবে যে উনি যেন জীবনে আর কখনও বিধবা বিয়ের কথা বলতে না পারেন।

বিদ্যাসাগর যত বড় পণ্ডিতই হন, হিন্দু ধর্ম ও সমাজ ধ্বংস করার অধিকার তার নেই। উনি যখন আমাদের ধর্ম ও সমাজ ধ্বংস করতে কৃতসঙ্কল্প। তখন তাঁকে উচিত শিক্ষা দেওয়া খুবই দরকাব।

ওদের এইসব আলোচনার মধ্যেই হঠাৎ বিদ্যাসাগর মশাই সেখানে এসে হাজির।

বিদ্যাসাগর মশাই বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে বললেন, শুনলাম, আপনাদের গুণ্ডারা দিনরাত্তির ঘুরে বেড়াচ্ছে আমাকে মারার জন্য। এভাবে দিনরাত্তির ঘুরে বেড়াতে তো বেচারাদের খুবই কষ্ট হচ্ছে। তাই ভাবলাম, ওদের কষ্ট না দিয়ে আমিই আপনাদের কাছে হাজির হই।

মুহূর্তের জন্য না থেমেই বীরসিংহের সিংহ বলেন, আপনারা আপনাদের গুণ্ডাদের ডাক দিন। আপনারা এই সুযোগ নষ্ট করবেন না।

এতক্ষণ যেসব গণ্যমান্যরা তর্জন গর্জন করছিলেন, তারা লজ্জায় মাথা হেঁট করে

রইলেন।

চালু হলো বিধবা বিবাহ। প্রথম বিধবা বিয়ে করেন রামধন তর্কবাগীশের পুত্র শ্রীশচন্দ্র ন্যায়রত্ন।

আর পাত্রী?

বর্ধমান জেলার পলাশডাঙ্গা গ্রামের ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দশ বছরের বিধবা কন্যা কালীমতী।

এই বিধবা বিয়ের পরই আবার গোঁড়াপন্থীরা আন্দোলন শুরু করলেন। তাদের এক কথা—খতম করো বিদ্যাসাগরকে। ঐ হতভাগাকে শেষ করতে না পারলে এই সর্বনাশা বিষ ছড়িয়ে পড়বে সর্বত্র।

এই খবর শুনেই উদ্বিগ্ন ঠাকুরদাস বীরসিংহ থেকে বিখ্যাত লাঠিয়াল সর্দার শ্রীমন্তকে পাঠিয়ে দিলেন ঈশ্বরচন্দ্রের কাছে। এই শ্রীমন্তর জন্যই বিদ্যাসাগর বহুবার চরম বিপদের সম্মুখীন হয়েও বেঁচে গিয়েছেন। বিধবা বিয়ে দেবার জন্য রাজনারায়ণ বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী ও অন্যান্যদেরও অভাবনীয় শত্রুতার মুখোমুখি হতে হয়।

অধিকাংশ বিয়ের সময় বিদ্যাসাগর মশাই নিজে উপস্থিত থাকতেন ; আশীর্বাদ করতেন নবদম্পতিকে। শুধু তাই না। বহু বিধবা বিয়ের খরচই তিনি নিজে বহন করতেন। এইসব বিয়ের আসরে বিধবা কন্যার বাবা-মায়েরা বিদ্যাসাগরের পায়ে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, বাবা, আপনি দয়া না করলে এইটুকু মেয়েকে সারাজীবন বৈধব্যের যন্ত্রণা ভোগ করতে হতো। আপনি ছাড়া কেউ বুঝলো না বিধবাদের দুঃখ।

গোঁড়াপন্থীরা যে যাই বলুক, সারা দেশে মেয়েদের মধ্যে তীব্র চাঞ্চল্য দেখা দিল। বঞ্চিতা নির্যাতিতা লাঞ্ছিতারাও নবজীবনের স্বপ্ন দেখতে শুরু করলো। আর সবার মুখেই এক কথা—বিদ্যাসাগর, তুমি মানুষ না ; তুমি দেবতা। প্রত্যেক দুঃখিনীর তুমি অনন্তকালের ইষ্টদেবতা।

সারা দেশের মেয়েরা মনে মনে প্রণাম করে বিদ্যাসাগরকে।

চোদ্দ

বিধবা বিবাহ আইন চালু হওয়ায় কোম্পানির হিন্দু সিপাহীরা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছলো যে ইংরেজ হিন্দুধর্ম ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর।

বেশ কিছুকাল ধরেই ভারতীয় সিপাহীরা প্রত্যক্ষ করেছে যে কোম্পানি খ্রীস্টধর্ম প্রচার করতে খুবই উৎসাহী। ওরা দেখেছে, মিশনারীরা হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের নিন্দা না করে থাকতে পারে না। এদেরই প্ররোচনায় কোম্পানি মাঝে মাঝেই এমন কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীদের সন্দেহ আরো বেড়েছে।

হিন্দুদের পুরাকাহিনী নিয়ে মেকলে সাহেবের ঠাট্টা-বিদ্রূপও ভাল লাগেনি সিপাহীদের।

সিপাহীদের অসন্তোষের আরো অনেক কারণ ছিল।

কোম্পানির সেনাবাহিনীতে সিপাহী ছিল আড়াই লাখের কিছু কম ; তার মধ্যে ইংরেজ সিপাহী ছিল মাত্র পঁয়তাল্লিশ হাজার। তাই তো ভারতীয় সিপাহীরা সব সময়ই মনে করতো, প্রধানত ওদেরই আত্মত্যাগে ও সাহায্যে কোম্পানি ধীরে ধীরে সমগ্র ভারতবর্ষের উপর ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে কিন্তু কোম্পানি ভারতীয় সিপাহীদের ন্যায্য দাবি পদে পদে উপেক্ষা করেছে।

ইংরেজ সিপাহীদের তুলনায় ভারতীয় সিপাহীদের বেতন অনেক কম। ইংরেজ সিপাহীদের ধাপে ধাপে পদোন্নতি হলেও ভারতীয় সিপাহীদের পদোন্নতি প্রায় অসম্ভব।

তাছাড়া কোম্পানি যেভাবে নানা অছিলায় একটার পর একটা দেশীয় রাজ্য দখল করছিল লর্ড ডালহৌসীর আমলে, তাতে অসন্তোষ দেখা দেয় দেশের নানা প্রান্তে। এই অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যেও। ইংরেজ স্বপ্নেও ভাবেনি, এইসব দেশীয় রাজা ও নবাবদের কী অসম্ভব শ্রদ্ধা-ভক্তি করতো সাধারণ মানুষ!

তবে সিপাহীদের মনে আগুন জ্বলে উঠলো এনফিল্ড রাইফেলের নতুন কার্তুজকে কেন্দ্র করে।

এই কার্তুজ ব্যবহার করতে হলে সিপাহীদের দাঁত দিয়ে ছিঁড়তে হতো একটা কাগজ এবং এই কাগজে লাগানো থাকতো পশুর চর্বি।

পশুর চর্বি?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, পশুর চর্বি।'

কোন পশুর চর্বি?

গরু আর শূয়োরের চর্বি।

সিপাহীরা সে খবর শুনেই চমকে উঠলো।

সর্বনাশ! ঐ কার্তুজ ব্যবহার করতে হলে তো হিন্দু-মুসলমানদের ধর্মচ্যুত হতে হবে।

না, না, এ অসম্ভব।

হিন্দু-মুসলমান সিপাহীরা প্রকাশ্যে ঘোষণা করলো, আমরা কখনই ঐ কার্তুজ ব্যবহার করবো না।

ইংরেজ অফিসাররা বললেন, ঐ কার্তুজ তোমাদের ব্যবহার করতেই হবে। ঐ কার্তুজ ব্যবহার না করলে সিপাহীদের চরম শাস্তি দেওয়া হবে

সিপাহীরাও স্পষ্ট জবাব দেয়, শাস্তির ভয় দেখিয়ে লাভ নেই। ধর্ম নষ্ট করে কার্তুজ ব্যবহার করা কখনই সম্ভব নয়।

২৯শে মার্চ ১৮৫৭।

কলকাতাব উপকণ্ঠে ব্যারাকপুরের সেনা ছাউনিতে এক ইংরেজ অফিসারের সঙ্গে সিপাহী মঙ্গল পাণ্ডের তুমুল তর্ক-বিতর্ক শুরু হলো। ইংরেজ অফিসারের অত্যন্ত অপমানজনক মন্তব্য শুনেই মঙ্গল পাণ্ডে গুলি করে তাকে হত্যা করলেন।

এই ঘটনার কয়েকদিন আগেই মুর্শিদাবাদের বহরমপুর ও কলকাতার শতখানেক মাইল দূরের রানীগঞ্জেও সিপাহীরা গর্জে উঠেছিল কিন্তু কোম্পানির সেনাবাহিনীর ইংরেজ অফিসাররা সিপাহীদের অসন্তোষেব গুরুত্ব বুঝতে পারে নি। ব্যারাকপুরের ঘটনায় চমকে উঠলো ইংরেজ অফিসাররা।

দিনে-দুপুরে ইংরেজ অফিসার হত্যার জন্য মঙ্গল পাণ্ডেকে ফাঁসি দিয়ে ঝুলিয়ে বাখা হলো ব্যারাকপুর সেনা ছাউনির একটা গাছে।

তারপর?

১০ই মে ১৮৫৭।

মীরাট।

সেনা ছাউনির হাজার হাজার সশস্ত্র হিন্দু-মুসলমান সিপাহী একযোগে বিদ্রোহ করে এগিয়ে চলল দিল্লীর দিকে এবং পরের দিনই ইংরেজ সেনাদের পরাস্ত করে দিল্লী জয় করলো। ইংরেজ কর্তৃক পদচ্যুত দ্বিতীয় বাহাদুর শা'কে আবার দিল্লীর সম্রাট করলো বিদ্রোহী সেনারা।

এই বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়লো দিকে দিকে। বাংলা থেকে পাঞ্জাব সীমান্ত, সরযূ নদীর তীরের আউধ থেকে দক্ষিণে নর্মদার তীর পর্যন্ত।

শেষ পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও-এর পোষ্যপুত্র নানাসাহেবকে কোম্পানির সরকার মাসোহারা দিতে অস্বীকার করায় তিনিও বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন!

ওদিকে ক'বছর আগে ঝান্সী রাজ্য লর্ড ডালহৌসী দখল করেন এই অছিলায় যে স্বামীর মৃত্যুর পর রানী লক্ষ্মীবাঈ কখনই রাজ্যের গদীতে বসতে পারেন না। অপমান আর উপেক্ষায় জর্জরিত রানী লক্ষ্মীবাঈও সিপাহীদের বিদ্রোহের সুযোগে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে।

শুধু তাই নয়। রানী লক্ষ্মীবাঈ স্বয়ং সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিলেন। অভাবনীয় দুঃসাহসিকতার সঙ্গে তিনি ও তাঁর সেনাবাহিনী যুদ্ধ করলো স্যার হিড রোজ-এর নেতৃত্বাধীন ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে। কল্পি হারাবার পর রানী লক্ষ্মীবাঈ তাতিয়া তোপীর সহযোগিতায় আক্রমণ করলেন গোয়ালিয়র ; তবে ইংরেজ ভক্ত সিন্ধিয়াদের আগ্রায় ইংরেজদের আশ্রয়ে চলে যেতে বাধা দিলেন না। রানীর শৌর্য, সাহসিকতা ও নেতৃত্বে মুগ্ধ হয়ে গোয়ালিয়রের সমগ্র সেনাবাহিনী তাঁর পক্ষে যোগদান করলো।

তারপর কত যুদ্ধ, কত মৃত্যু, কত রক্তক্ষয়। কত নাটকীয় জয়-পরাজয়।

শেষ পর্যন্ত শিখ ও গুর্খা সৈন্যদের সাহায্যে ইংরেজ আবার দখল করলো দিল্লী ১৮৫৭'র ১৪ই সেপ্টেম্বর। সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ বন্দী করলো দ্বিতীয় বাহাদুর শা'কে ; বন্দী করেই তাঁকে পাঠিয়ে দিল সুদূর রেঙ্গুনে। রেঙ্গুনে বন্দী দশাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। কর্নেল হডসন গুলি করে হত্যা করলেন বাহাদুর শা'র দুই ছেলেকে।

অসীম শৌর্য-বীর্যের সঙ্গে লড়াই করে যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ দিলেন রানী লক্ষ্মীবাঈ ; নানাসাহেব চলে গেলেন নেপালের জঙ্গলে কিন্তু পরে তাঁর আর খোঁজ পাওয়া যায়নি। এই ঐতিহাসিক বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক তাতিয়া তোপী অসীম বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে বার বার ইংরেজকে পরাজিত করলেও শেষ পর্যন্ত সিন্ধিয়াদের বশম্বদ মান সিংহের বিশ্বাসঘাতকতায় উনি ধরা পড়লেন ইংরেজদের হাতে। হত্যা ও বিদ্রোহের অভিযোগে তাতিয়া তোপীর বিচার শুরু হলো ইংরেজের আদালতে। তাতিয়া তোপী প্রকৃত বীরের মত ঘোষণা করলেন, তাঁকে বিচার করার অধিকার নেই এই আদালতের।

ইংরেজ ফাঁসি দিয়ে হত্যা করে তাতিয়া তোপীকে।

১৮৫৮ সালের ৮ই জুলাই গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং ঘোষণা করলেন, বিদ্রোহ শেষ।

তার কিছুদিনের মধ্যেই শেষ হলো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারত শাসনের পর্ব। ভারতবর্ষের শাসনভার স্বয়ং মহারানী ভিক্টোরিয়া নিজের হাতে তুলে নিয়েই ঘোষণা করলেন সব দেশীয় রাজা-নবাবরা তাঁদের সব অধিকার ফিরে পাবেন এবং মকুব করে দিলেন সব শাস্তিপ্রাপ্তদের সাজা। মহারানী প্রতিশ্রুতি দিলেন ভারতবাসীর ধর্মীয় আচার-আচরণে বাধা দেওয়া হবে না।

এসব তো প্রকাশ্য ঘোষণা কিন্তু বিলেতের শাসককুল তখনই বুঝেছিলেন, সুখে-শান্তিতে ভারতবর্ষকে শাসন করতে হলে ভেঙ্গে দিতে হবে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য। অত্যন্ত সুচতুরভাবে বিরোধ বাধাতে হবে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ; ছড়িয়ে দিতে হবে সাম্প্রদায়িকতার বিষ।

হ্যাঁ, ইংরেজ সরকারের কৃপাতেই ভারতবর্ষে প্রথম ছড়িয়ে পড়ে সাম্প্রদায়িকতার আগুন।

দেশে ইংরেজদের বিরুদ্ধে এমন ভয়ঙ্কর বিদ্রোহ ঘটে গেল কিন্তু দেশবাসী নির্বিকার। হাজার হাজার বিদ্রোহী সেনাদের প্রকাশ্য মাঠে-ঘাটে গাছে ফাঁসি দেবার পর তাদের মৃতদেহ দিনের পর দিন ঐসব গাছেই ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে কিন্তু না, তবুও দেশবাসীর মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায় নি। এই ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে একটি অক্ষরও ছাপা হয়নি বাংলা পত্র-পত্রিকায় ; লেখা হয়নি কোন বই। অনুষ্ঠিত হয়নি কোন সভা-সমিতি।

প্রত্যক্ষভাবে না হলেও অপ্রত্যক্ষভাবে সিপাহী বিদ্রোহের প্রভাব পড়লো বঙ্গসমাজে ; দেখা দিল এক নতুন প্রত্যাশা ও চাঞ্চল্য। মহারানী ভিক্টোরিয়া স্বহস্তে ভারতের শাসনভার নিতেই ভারতবাসী আনন্দে নেচে উঠলো। কলকাতার ঘরবাড়ি দীপালী-দীপান্বিতার মত আলোয় সাজানো হলো। এই সময়েই রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'পদ্মিনী' কাব্যগ্রন্থে লিখলেন "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়?"

এই যুগসন্ধিক্ষণেই শোনা গেল আরেক বিদ্রোহের পদধ্বনি।

হরিশচন্দ্র মুখুজ্যে ভবানীপুরের এক দীনদরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান। অর্থাভাবে লেখাপড়া করার বিশেষ সুযোগ না পেলেও অভাবনীয় অধ্যবসায়ের দ্বারা জ্ঞানার্জন করেন। দু'মুঠো অন্নের সংস্থানের জন্য তাঁকে কত কষ্টই করতে হয়েছে। তারপর হরিশচন্দ্র চাকরি পেলেন মিলিটারী অডিটর জেনারেলের অফিসে ; ওখানে পঁচিশ টাকা মাইনেতে চাকরি শুরু করে শেষ পর্যন্ত মাইনে পেতেন চারশ' টাকা।

ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হরিশচন্দ্র ছিলেন 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' ইংরেজি সাপ্তাহিকের সম্পাদক ও প্রাণপুরুষ। তাঁর সম্পাদকীয় ও অন্যান্য লেখাগুলি এমনই গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী ছিল যে এই পত্রিকা প্রকাশ হবার দিন লর্ড ক্যানিং তাঁর এক কর্মচারীকে 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' অফিসে পাঠিয়ে দিতেন প্রথম ছাপা হওয়া কয়েকটি কপি আনার জন্য।

হরিশচন্দ্রের এই পত্রিকাতেই প্রথম ছাপা হয় বাঙালি চাষীদের উপর নীলকর সাহেবদের অকথ্য অত্যাচারের কাহিনী।

তখনও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় নীল তৈরি করা আবিষ্কৃত হয়নি ; নীল হতো জমিতে চাষ করেই। বাংলাদেশের নদীয়া, যশোহর, পাবনা ও আরো দু'একটি জেলার জমিই ছিল নীলচাষের উপযুক্ত। নীলকুঠির সাহেবরা নীল চাষ করার জন্য অগ্রিম টাকা দিতো কিন্তু নীল চাষ করে ঐ অগ্রিমের টাকা কিছুতেই শোধ করতে পারতো না চাষীরা। সাহেবরা আবার অগ্রিম দিতো চাষীদের। চাষের শেষে আরো দেনার দায় চাপতো চাষীদের উপর।

নীলকুঠির সাহেবরা বলতো, আরো বেশি জমিতে নীল চাষ করো।

চাষীরা বলতো, সাহেব, সব ধানের জমিতে নীল চাষ করলে খাবো কি?

ওসব আমি জানি না। তোমাদের আরো জমিতে নীল চাষ করতেই হবে।

আসল কথা হচ্ছে নীলকুঠীর সাহেবরা এখানকার নীল বিলেতে রপ্তানী করে লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ করতো। সুতরাং যেন-তেন প্রকারেণ ওরা চাষীদের নীল চাষ করতে বাধ্য করতো।

চাষীরা নীল চাষ করতে অস্বীকার করলে?

নীলকুঠীর সাহেবরা শুরু করতো চাষীদের উপর অকথ্য অত্যাচার। পুড়িয়ে দিতো চাষীদের ঘরবাড়ি। কেড়ে নিতো গরু-লাঙল।

এত অত্যাচারের পরও চাষীরা অস্বীকার করে নীল চাষ করতে।

নীলকুঠীর সাহেবরা সহ্য করতে পারে না চাষীদের এই ঔদ্ধত্য।

ব্লাডি বাগার এই নেটিভ চাষীদের হাতের আঙুল কেটে দাও। শালারা আর কোনদিন কোন কিছু চাষ করতে পারবে না।

হরিশচন্দ্রের অগ্নিগর্ভ লেখনীতে হিন্দু প্যাট্রিয়টের প্রতি সংখ্যায় ছাপা হয় এই অমানুষিক অত্যাচারের বৃত্তান্ত। যশোহর ও নদীয়ার অত্যাচারিত চাষীরা ছুটে আসে হরিশচন্দ্রের কাছে।

চাষীদের কাছে নীলকুঠীর সাহেবদের অত্যাচারের কাহিনী শুনে হরিশচন্দ্র ওদের হয়ে আবেদনপত্র লিখে দেন ও সেসব আবেদনপত্র পাঠিয়ে দেন সরকারের

াছে। এইসব সামলে হরিশচন্দ্র আবার লিখতে বসেন প্যাট্রিয়টের সম্পাদকীয় ও ন্যান্য প্রবন্ধ।

হরিশচন্দ্রের মা হঠাৎ বাইরের ঘরে এসেই ছেলেকে বলেন, হ্যাঁরে, ভোরবেলায় ম থেকে উঠেই তুই লিখতে বসিস। তারপর সারাদিন অপিসে হাড়ভাঙা খাটুনি খটে এসেই আবার কাজে বসেছিস?

মা, তুমি তো দেখছ, এই গরীব চাষীরা কত অত্যাচার সহ্য করার পর আমার াছে ছুটে এসেছে। আমি কি ওদের কথা না শুনে পারি?

হ্যাঁ, বাবা. নিশ্চয়ই ওদের কথা শুনবি কিন্তু অপিসের কাপড়-চোপড় ছেড়ে কিছু কটু মুখে দিয়ে তো...

মা, তুমি কিছু চিন্তা করবে না। আমি ওদেব আবেদনপত্রগুলো লিখে দেবার পরই পিসের কাপড়-চোপড় ছাড়ছি।

তারপর তো তুই আবার মাঝরাত্তির পর্যন্ত কাগজের লেখা লিখতে বসবি।

হ্যাঁ, মা, তা তো লিখতেই হবে।

কিন্তু বাবা, এত পরিশ্রম করলে তো তোর শরীর ভেঙে পড়বে!

হরিশচন্দ্র একগাল হেসে বলেন, না, মা, আমার শরীর ভেঙে পড়বে না।

বোধকরি হরিশচন্দ্রের অনুপ্রেরণাতেই বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ নীল চাষী ধর্মঘট রলো।

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ নীলচাষীরা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করলো—নীলের দাদন নেব না, নীল াষ করবো না।

শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি এমনই হয় যে সরকার নীল চাষ বন্ধ করতে বাধ্য হয়।

ইংরেজ রাজত্বে সেই প্রথম কৃষক বিদ্রোহ!

যাইহোক একদিকে অমানুষিক পরিশ্রম, অন্যদিকে প্রথমা স্ত্রী বিয়োগের শোক ন হরিশচন্দ্র সহ্য করতে পারেন না। ধনী বন্ধুদের পরামর্শে মদ্যপান শুরু করলেন দহ ও মন সজাগ রাখার জন্য।

না, মদ্যপান করেও যেন উনি শান্তি পান না।

ধনী বন্ধুরা বললেন, হরিশ, কিচ্ছু চিন্তা করো না। এবার তোমাকে এমন কজায়গায় নিয়ে যাবো যে তুমি সব দুঃখ-কষ্ট ভুলে যাবে।

ওখানে গেলে আমার সব দুঃখ-কষ্ট চলে যাবে?

আলবাত্ যাবে।

হ্যাঁ, ভাই, তাহলে আমাকে ওখানেই নিয়ে চলো। আমি আর এই দুঃখ-কষ্ট সহ্য রতে পারছি না।

হ্যাঁ, এই বন্ধুদের পাল্লায় পড়েই হরিশচন্দ্র এক বারবনিতার ওখানে নিত্য যাতায়াত শুরু করেন।

পরিণতি?

মাত্র ৩৭ বছর বয়সেই এই অসামান্য ব্যক্তির মৃত্যু হয়।

হরিশচন্দ্রের মৃত্যুর দু'আড়াই বছর আগেই মৃত্যু হয়েছে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের দেবেন্দ্রনাথের পুত্র রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয় হরিশচন্দ্রের মৃত্যুর কয়েক মাস পর

নীলচাষীদের উপর নীলকুঠীর সাহেবদের অত্যাচার নিয়ে হরিশচন্দ্রের হিন্দু প্যাট্রিয়টে নিরন্তর লেখালেখি হচ্ছে ও সরকার বাধ্য হয়ে এই বিষয়ে তদন্ত করার জন্য ইন্ডিগো কমিশন নিযুক্ত করেছে, ঠিক সেই সময় প্রকাশিত হয় দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ'।

নীলদর্পণ প্রকাশ হতেই বাংলায় শিক্ষিত মহলে চাঞ্চল্যের বন্যা বয়ে গেল।

এক রাত্তিরের মধ্যে নীলদর্পণের ইংরেজি অনুবাদ করলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত ; প্রকাশ হলো লঙ সাহেবের নামে।

নীলদর্পণ পড়েই নীলকুঠীর সাহেবদের নিন্দায় মুখর হয়ে উঠলো বাংলার শিক্ষিত যুবসমাজ। সবার মুখে তখন নীলদর্পণের কথা। নীলদর্পণের দু'একটি দৃশ্য তখন নিত্য অভিনীত হচ্ছে বাঙালির ঘরে ঘরে।

নীলচাষীদের উপর নীলকুঠীর সাহেবদের অকথ্য অত্যাচারের কাহিনী প্রথম প্রকাশিত হয় অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তারপর হরিশচন্দ্রের হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকায়। প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল'-এও ছিল নীলকরের জুলুমের কথা কিন্তু দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণই বাঙালির মনে আগুন জ্বালিয়ে দিল।

মাত্র দু'চার বছরের মধ্যে দেশে কত কি ঘটল।

বিধবা বিবাহ আন্দোলন, সিপাহী বিদ্রোহ, নীলকরদের অত্যাচার ও নীলচাষীদের বিদ্রোহ, হরিশ মুখুজ্যের হিন্দু প্যাট্রিয়ট, সোমপ্রকাশের আবির্ভাব, ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যু এবং দীনবন্ধু মিত্র'র 'নীলদর্পণ' প্রকাশ ও বাঙালি শিক্ষিত সমাজে অভাবনীয় জনপ্রিয়তা লাভ।

এইসব বৈপ্লবিক ঘটনাবলীর ঢেউ এসে পড়লো নারী সমাজেও। তাইতো 'নীলদর্পণ' প্রকাশ হবার ক'বছর আগেই বঙ্গসাহিত্যের অঙ্গনে আবির্ভাব ঘটলো এক বঙ্গনারীর। কৃষ্ণকামিনী দাসীর 'চিত্তবিলাসিনী' কাব্যগ্রন্থ একই সঙ্গে বিস্ময় ও

াঙ্গল্যের সৃষ্টি করলো সুধীমহলে।

দেড়শ' বছর আগে এই কবি লিখেছিলেন

"পুরুষের উক্তি—

ঘোর রজনীতে তুমি কাহার কামিনী।
কিসের লাগিযে ভ্রমিতেছ একাকিনী।।
বয়েসে নবীন অতি রূপ মনোহর।
আছ রঙ্গে নাহি সঙ্গে সঙ্গিনী অপর।।
কি নাম কাহার কন্যা বল রসবতি।
অপ্সরী কিন্নরী কিম্বা হবে দেবজাতি।।

কামিনীর উক্তি—

আমি হে রমণী,
আছি একাকিনী,
কুলেব কামিনী তায়।
তুমি হে এখানে,
কিসের কারণে,
বল হে যুবরায়।।
একি তব রীত,
হেরি বিপরীত,
নাহি চিতে কিছু ভয়।
রমণীর পাশে,
এলে অনায়াসে,
কিরূপেতে মহাশয়।।
আলাপ করিতে
বাসনা মনেতে,
নাহি ভাব তাহে লাজ।
আমি নারী জেতে,
তোমার সহিতে,
পরিচয়ে কিবা কায।।

পুরুষের উক্তি—

দেবগণ মধ্যে নহয় আমার বসতি।
ধর্ম নামে খ্যাত আমি শুন রসবতি।।

সমাদরে যারা করে আমার সাধন।
তাদের শবীরে করি সতত ভ্রমণ।।

কামিনীব উক্তি—

প্রবৃত্তির কন্যা আমি
দয়া নামে খ্যাত।
শ্রদ্ধা নামে ভগ্নী মম
জগতে বিদিত।।
মর্ত্যলোকে মহাত্মাগণের অন্তরেতে।
নিবাস আমার তাই ভ্রমি হেনমতে।।
সুবগণ শ্রেষ্ঠ তুমি ধর্ম মহামতি।
এরূপ ব্যাভার কেন অবলার প্রতি।।
তোমার উচিত কভু না হয এমন।
ছাড় ছাড় পথ করি স্বস্থানে গমন।।

এত বৈপ্লবিক বিবর্তনের মধ্যেও সমাজের একাংশ তখনও নিজেদের নিয়ে মত্ত মত্ত বিলাস-ব্যসনে কামিনী-কাঞ্চনে ও পরনিন্দা-পরচর্চায়। সত্যি, কি বিচিত্র এ দেশ!

চোরবাগানের দত্তরা ঠিক হাটখোলার মিত্তিরদের মতই বিখ্যাত জমিদার দত্তদের জমিদারী ছড়িযে ছিটিয়ে আছে বাংলাদেশের নানা জেলায় ও উড়িষ্যার সম্বলপুরে। অর্থ-যশ খ্যাতি-প্রতিপত্তি সীমাহীন। চোরবাগানের দত্তবাড়ির দুর্গাপুজোয় বাংলার লাটসাহেব আসেন প্রতি বছর। তাছাড়া আরো কত উৎসব সারা বছর ধরে।

চোরবাগানের দত্তবাড়ির বলরাম দত্ত'ব নাম তখন বাঙালির ঘবে ঘরে সাহেবদের আড্ডাখানায় ও অন্য জমিদারদের আসরে। প্রজারা বলে, বলরাম দত্ত'র ভয়ে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায়।

হ্যাঁ, সত্যি বলবাম দত্ত ছিলেন অনন্য ব্যক্তি।

মধ্য কলকাতাব বাসিন্দারা তো বলরাম দত্ত'র দেবভক্তি ও উদার আতিথ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়। বারো মাসে তেরো পার্বণে দত্তবাড়িতে আমন্ত্রিত হয় হাজার হাজার মানুষ। তাদের ভুরিভোজে আপ্যায়ন করেন বলরাম দত্ত।

কেউ বলেন, ওরে বাপু, এমন দেবভক্তি আছে বলেই তো বলরাম দত্ত এত ব

জমিদার।

আবার কেউ বলেন, কত জমিদারেরই তো নাম শুনি কিন্তু আর কোন জমিদার বলরাম দত্ত'র মত উদার আছে? আর কোন জমিদার বারো মাসের তেরো পার্বণে হাজার হাজার মানুষকে এভাবে ভুরিভোজে আপ্যায়ন করে?

রসিক মহলে বলরাম দত্ত'র খ্যাতি অন্য কারণে।

রমাপতি হাজরা মুচকি হেসে বলেন, দ্যাখ গৌর, বুড়ী বাঈজীর জন্য এক কানাকড়িও খরচ করার পাত্র না বলরাম দত্ত। বলরাম দত্ত সেখানেই হাত ওল্টাবে, যাকে দেখেই পুরুষরা ফেলাট হয়ে যাবে।

যোগেশ ঘোষাল একগাল হেসে বলেন, ঠিক বলেছিস রমাপতি। গতবার বলরাম যে ছুকরী বাঈজীটাকে কাশী থেকে আনিয়েছিল, তাকে দেখেই তো আমার কেল্লা ফতে হয়ে গিয়েছিল। ইস! কি মাল ছিল ঐ ছুঁড়ী!

সত্যি যোগেশ, ঐ ছুঁড়ীটাকে এখনও আমি ভুলতে পারি না। এখনও মাঝে মাঝে মনে হয়, ও ছুঁড়ী যেন কোমর দুলিয়ে পোঁদ ঘুরিয়ে চোখের সামনে নাচছে আর মাঝে মাঝে বলরাম আর আমার গলা জড়িয়ে ধরছে।

বেঙ্গল ক্লাবের আড্ডাখানায় হঠাৎ বলরাম দত্ত'র কথা উঠতেই লাট সাহেবের সেক্রেটারি কর্নেল জার্ডিনসন একটু হেসে বলেন, কত জমিনদারদের বাড়িতেই তো হিজ একসেলেন্সীর সঙ্গে আমাকে যেতে হয় কিন্তু আই মাস্ট সে বোলোরামের মত কেউ আপ্যায়ন করতে পারে না। হি ইজ রিয়েলি এ ম্যান অব টেস্ট!

কর্নেল হুইস্কির গেলাসে এক চুমুক দিয়ে বলেন, বোলোরামের বাড়িতে যে ডান্সিং গার্লদের দেখেছি, তাদের রূপ-যৌবন দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছি। ইন ফ্যাক্ট মনে মনে ওদের প্রেমে পড়ে গেছি।

রিয়েলি?

ইয়েস মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড! ওদের দেখলে তুমিও প্রেমে পড়ে যেতে।

কর্নেল হুইস্কির গেলাসে চুমুক দিতে গিয়েও গেলাস নামিয়ে রেখে একটু হেসে বলেন, তাহলে একদিনের ঘটনার কথা বলি। সেদিন শুধু হিজ একসেলেন্সীর জন্য বোলোরাম ওর মানিকটোলার গার্ডেন হাউসে স্পেশ্যাল পার্টি দিয়েছে। হিজ একসেলেন্সীর সঙ্গে শুধু আমি গিয়েছি কিন্তু আর কোন গেস্ট নেই।

দেন?

দু'তিন রাউন্ড ড্রিঙ্কের পরই শুরু হলো ডান্সিং গার্লের নাচ। ইউ কান্ট ড্রিম মেয়েটা কি অসাধারণ সুন্দরী ছিল। তাছাড়া কি দারুণ ফিগার!

ও লাভলি!

মেয়েটা হিজ একসেলেন্সীর মুখের সামনে এমন একসাইটিংভাবে নাচছিল যে উনি আর নিজেকে সংযত রাখতে পারলেন না। হাতের গেলাস ছুড়ে ফেলে দিয়ে উনি মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরে কিস করতে করতে পাশের ঘরে চলে গেলেন।

ও মাই গড!

কর্নেল হাসতে হাসতে বলেন, প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে হিজ একসেলেন্সী আর মেয়েটা গলা জড়াজড়ি করে হাসতে হাসতে ঐ ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

লং লিভ আওয়ার হিজ একসেলেন্সী।

হুইস্কির গেলাসে শেষ চুমুক দিয়ে কর্নেল জার্ডিনসন বলেন, বোলোরাম যেমনভাবে আপ্যায়ন করে, তা আর কোন জমিদার করতে জানে না ; তাছাড়া বোলোরাম গেস্টদের যেসব উপহার দেয়, তারও কোন তুলনা হয় না।

যাইহোক, চোরবাগানের দত্ত পরিবারের অনেক বৈশিষ্ট্যের একটি হলো, পর পর তিন পুরুষ ধরে এই পরিবারের কর্তার ঠিক একটি পুত্রসন্তান জন্মেছে ও জমিদারী ভাগাভাগি হবার কোন প্রয়োজনই হয়নি।

বলরাম দত্ত'র বিয়ে হয় উনিশ বছর বয়সে। পুত্র কৃষ্ণদাসের জন্ম হয় তার পনের বছর পর। সেই কৃষ্ণদাস এখন ষোলো বছরে পদার্পণ করেছে।

তলব পেয়েই ম্যানেজার জ্ঞানেন্দ্রমোহন ছুটে এলেন।

কর্তাবাবু, আপনি আমাকে স্মরণ করেছেন?

বলরাম দত্ত হাতের কাগজপত্র নামিয়ে রেখে বলেন, হ্যাঁ।

আজ্ঞে হুকুম করুন।

ম্যানেজারবাবু, কুমার সাহেবের বয়স কত, তা জানেন?

জ্ঞানেন্দ্রমোহন এক গাল হেসে বলেন, ক'দিন আগেই তো কুমারসাহেবের বয়স ষোলো পূর্ণ হলো।

হ্যাঁ।

বলরাম দত্ত মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, কুমার সাহেব বেশ স্বাস্থ্যবান ও সুপুরুষ!

সে আর বলতে!

আর দু'চার বছরের মধ্যেই কুমারসাহেবের বিয়ে দিতে হবে, তা জানেন?

সে তো হবেই। আপনারও তো বিয়ে হয়েছিল উনিশ বছর বয়সে।

কিন্তু বিয়ের পর পরই রানীর পেটে বাচ্চা আসেনি, তা তো জানেন?

খুব জানি ; আপনার বিয়ের পনের বছর পর তো কুমারসাহেবের জন্ম হয়।

আপনি বিচক্ষণ ম্যানেজার। আপনি খুব ভাল করেই জানেন, বউকে নিয়ে বেশি মাতামাতি করা আমাদের পোষায় না।

আজ্ঞে হ্যাঁ, তাও জানি।

ম্যানেজারবাবু মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, একাধিক পুত্র হলে তো জমিদারী ভেঙে যাবে।

যাইহোক, ভবিষ্যতে যাতে জমিদারী ভেঙে না যায়, তার জন্য তো কুমারসাহেবকে...

আজ্ঞে আর বলতে হবে না। আমি সত্বরই ব্যবস্থা করছি।

আপনি কালই কামিনীবালা আর জবার কাছে যান। ওদের দু'জনকেই বলবেন, অবিলম্বে কুমারসাহেবের জন্য একটি পরমাসুন্দরী ও বুদ্ধিমতী মেয়ে চাই।

বলরাম দত্ত না থেমেই বলেন, আমি ইতিমধ্যেই ওদের বলে রেখেছি। বোধহয় আপনি গেলেই ওরা মেয়ের খোঁজ দিতে পারবে।

ঠিক আছে কর্তাবাবু, আমি কালই ওনাদের কাছে যাব।

যাবার সময় ওদের দু'জনের মাসোহারাও নিয়ে যাবেন।

আজ্ঞে হ্যাঁ, নিয়ে যাব।

শেষ পর্যন্ত বলরাম দত্ত জবাদের গ্রামের কুসুমকুমারীকেই পছন্দ করলেন পুত্র কৃষ্ণদাসের জন্য। কুসুম সত্যি পরমাসুন্দরী ; তাছাড়া অভাবনীয় দেহলাবণ্য। সর্বোপরি একটু-আধটু লেখাপড়া ছাড়াও নাচতে জানে।

বলরাম দত্ত একটু হেসে জবাকে বলেন, তুই কুসুমকে একটু ছলা-কলা শিখিয়ে দিস। দেখিস ও যেন কুমারসাহেবকে সবদিক দিয়ে খুশি করতে পারে।

জবাও একটু হেসে বলে, কুসুম আঠারো বছরের সোমত্ত মাগী। নেহাত গরীবের ঘরের মেয়ে বলে বিয়ে হয়নি। তাছাড়া নিজের চোখেই তো দেখলে কি সর্বনাশা রূপ-যৌবন। আমি ক'দিনের মধ্যেই ওকে কুমারসাহেবের উপযুক্ত করে দেব। তুমি কিচ্ছু চিন্তা করো না।

কুমারসাহেব তো কোনদিন মদও খায়নি, কোন মাগীর কাছেও যায়নি। তুই ওকেও একটু দেখিস।

জবা ঠোঁটের কোণে হাসি লুকিয়ে বলে, কর্তাবাবু, তুমি দেখে নিও কুমারসাহেব এমন মজে যাবে যে দিনের পর দিন বাড়িতেও ফিরবে না।

হ্যাঁ, জবা, আমি ঠিক তাই চাই।

আর হ্যাঁ. তুমি কাল বা পরশু বেশ কিছু টাকাকড়ি দিয়ে ম্যানেজারকে পাঠিয়ে দিও।

কেন?

বাঃ! কুসুমের ঘরদোর সাজাতে হবে, ওর কাপড়-চোপড় গয়না-গাটি কিনতে হবে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝেছি। আমি কালই ম্যানেজারকে পাঠিয়ে দেব।

সেদিন সন্ধের অন্ধকার নামতে না নামতেই চাকর ঘরের আলোগুলো জ্বালিয়ে দিল। তারপর পরই ম্যানেজারবাবু কুমারসাহেবকে নিয়ে কাছারি ঘরে হাজির।

কুমারসাহেবকে একঝলক দেখেই বলরাম দত্ত একটু হেসে বলেন, কী ব্যাপার কৃষ্ণদাস, এত সেজেগুজে চললে কোথায়?

কৃষ্ণদাস জবাব দেবার আগেই ম্যানেজারবাবু বলেন, আজ্ঞে, আমি কুমারসাহেবকে নিয়ে একটু বেরুচ্ছি।

উনি না থেমেই বলেন, কুমারসাহেব সারাদিন বাড়ির মধ্যেই বন্দী থাকেন। এই বয়সে তো এভাবে বাড়ির মধ্যে থাকা ভাল না।

হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন।

এই বয়সে একটু সখ-আহ্লাদ না করলে কি কুমারসাহেবের মন ভাল থাকে? তাই আমি ওকে একটু নিয়ে যাচ্ছি একজনের কাছে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, যান।

বলরাম দত্ত মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, সখ-আহ্লাদ করার এইতো বয়স। এরপর জমিদারীর কাজকর্ম দেখতে শুরু করলে তো নিঃশ্বাস ফেলার সময় পাবে না।

কৃষ্ণদাস ওর বাবাকে প্রণাম করে।

বলরাম ওর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বলেন, তুমি হেসে-খেলে আনন্দে জীবন কাটাও, এইতো আমি চাই।

কুমারসাহেব ম্যানেজারবাবুর পিছন পিছন চলে যান।

রাত সাড়ে দশটা নাগাদ ম্যানেজারবাবু কুমারসাহেবকে নিয়ে ফিরে আসেন। উনি কুমারসাহেবকে ঘরে পৌঁছে দিয়েই জমিদারবাবুর কাছে হাজির।

ওকে ঘরে ঢুকতে দেখেই বলরাম প্রশ্ন করেন, বলুন, খবর কী?

কর্তাবাবু, খুব ভাল খবর।

ম্যানেজারবাবু একটু হেসে বলেন, কুমারসাহেব বলেছিলেন, ঘণ্টাখানেকের বেশি ওখানে থাকবেন না কিন্তু শেষ পর্যন্ত

তার মানে কুসুমকে ওর পছন্দ হয়েছে?

খুব পছন্দ হয়েছে।

আপনি কী করে জানলেন?

জবা দেবী লুকিয়ে-চুরিয়ে ওদের কাণ্ডকারখানা দেখেই আমাকে বলেন, প্রথম দিনই ওদের ভাব-ভালবাসা দেখে তো আমি অবাক।

কুমারসাহেব কিছু বলেছে?

হ্যাঁ, গাড়িতে আসতে আসতে বলছিল, জ্যাঠাবাবু, কুসুম মেয়েটি এত ভাল, আপনি ভাবতে পারবেন না।

তারপর?

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কুসুম তোমাকে আদর-যত্ন করেছে তো?

ও কী বলল?

বলল, খুব আদর-যত্ন করেছে।

আর কী বলল?

বলল, জবা মাসীকেও খুব ভাল লেগেছে।

যাক, তাহলে ভুল সিদ্ধান্ত নিইনি।

কর্তাবাবু, আপনি পাকা জহুরী। আপনি কি ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারেন?

ম্যানেজারবাবু মুহূর্তের জন্য থেমেই বলেন, কুমারসাহেব বলছিল, ও যদি রোজ সন্ধের পর কুসুমের সঙ্গে কিছু সময় কাটায়, তাহলে কি আপনার কোন আপত্তি আছে?

না, না, আপত্তি থাকবে কেন? এ তো আনন্দের কথা।

তারপর?

কুমার কৃষ্ণদাস কুসুমকে নিয়ে মেতে উঠলো যৌবনের মহোৎসবে।

তারপর?

ঠিক একুশ বছর বয়সে কৃষ্ণদাসের বিয়ে হলো চাঁপাডাঙার জমিদার-কন্যা মাধবীলতার সঙ্গে।

বিয়ের সময় কৃষ্ণদাসকে কোনমতে সামলানো গেলেও পরের দিন আর তাকে ধরে রাখা গেল না ; চলে গেল কুসুমের কাছে।

বৌভাত-ফুলশয্যার দিন বহুজনের বহু অনুরোধ-উপরোধেও কৃষ্ণদাস সারাদিন

কুসুমকে নিয়ে ঘরের মধ্যেই পড়ে রইল। সন্ধেয় স্বয়ং ম্যানেজারবাবু গেলেন।

কুমারসাহেব, বাড়ি চল। আজ এখন তুমি বাড়ি না গেলে স্বয়ং জমিদার মশাই আর রানী আত্মীয়-স্বজনের কাছে...

কৃষ্ণদাস কুসুমকে জড়িয়ে ধরে একটু হেসে বলে, জ্যাঠাবাবু, আমি এই বৃন্দাবন ছেড়ে কোথাও যাব না।

শেষ পর্যন্ত জবা অছিলা করে কুসুমকে সরিয়ে নেবার পর কৃষ্ণদাসকে বাড়ি থেকে ঘুরে আসতে বলে। যে কোন কারণেই হোক কৃষ্ণদাস জবাকে ভয়ও করতো, ভক্তিও করতো।

ম্যানেজার যখন কুমারসাহেবকে নিয়ে চোরবাগানের দত্তবাড়িতে হাজির হলেন, তখন প্রায় মাঝরাত কিন্তু গাড়ি থেকে নামতে গিয়েই সে পড়ে গেল। এত মদ খেলে কি কেউ দাঁড়াতে পারে?

পাঁচ-ছ'জন চাকর ওকে প্রায় কোলে তুলে নিয়ে পৌঁছে দিল অন্দরমহলে। তারপর রানীমা আর একদল আত্মীয় কোনমতে ওকে ওর ঘরে পৌঁছে দেন।

কৃষ্ণদাস এটা-ওটা ধরে কোনমতে টলতে টলতে ঘরের মধ্যে এগিয়ে যেতেই মাধবীলতা ওকে প্রণাম করে।

কুমারসাহেব অবাক হয়ে বলে, তুমি কে বাবা?

আমি মাধবীলতা।

ওরে বাপু, লতা-পাতা আবার এখানে কেন? যাও, যাও, জঙ্গলে যাও।

মাধবীলতা ওর হাত ধরে পালঙ্কের দিকে এগুতে এগুতে বলে, পরশুদিন আমাদের বিয়ে হলো, আপনার মনে নেই!

দূর শালী! কোন দুঃখে তোকে আমি বিয়ে করব? আমার বউ তো কুসুম।

আপনি শুয়ে পড়ুন। আপনার শরীর ভাল নেই।

আমি শোব?

হ্যাঁ।

কুসুম কোথায়? ও মাগী কাছে না থাকলে তো আমার ঘুম আসবে না।

আপনি শুয়ে পড়ুন। কুসুম এখুনি আসছে।

কুসুম আসবে?

হ্যাঁ, এখুনি আসবে।

মাধবীলতার বিবাহিতা জীবন এইভাবেই শুরু হলো।

শাঁখা-সিঁদুর পরলেই কি স্বামীর সোহাগ-ভালবাসা পাওয়া যায়? কদাচিৎ কখনও যেমন দুর্ঘটনা ঘটে, সেইরকমই কালে-কস্মিনে কুমারসাহেব এক-আধ রাত

মাধবীলতার সঙ্গে কাটাতো।

তখন শুধু চোরবাগানের দত্তবাড়ির মাধবীলতাই না, সচ্ছল সম্পন্ন পরিবারের ঘরে ঘরে আরো অসংখ্য মাধবীলতার মত অভাগিনী ছিল সমাজে।

এদের নিয়েই তো দীনবন্ধু মিত্র লিখলেন, 'সধবার একাদশী'।

শোভাবাজারের বোসবাড়ির বৈঠকখানায় জমজমাট আড্ডা চলছে। আলোচ্য বিষয় বিধবা বিবাহ থেকে নীলদর্পণ ও আরো কত কি।

যাই বল যোগেন, বিদ্যেসাগর মশাই বিধবা বিয়ের ব্যবস্থা করে ভালই করেছেন। ডাগর ডোগর জোয়ান সোমত্ত বিধবা মাগীরা একটু সোহাগ ভালোবাসা পায় না বলে আমার ভারি দুঃখু হয়।

যোগেন মিত্তির সঙ্গে সঙ্গে বলেন, ঠিক বলেছিস বঙ্কু, ওদের দেখে আমারও খুব দুঃখু হয়। খুব ইচ্ছে করে ওদের দুঃখু-কষ্ট মিটিয়ে দিই।

তা মিটিয়ে দিচ্ছিস না কেন?

কী করে দেব? যাকে দেখে আমার কষ্ট হয়, সে যে বামুনের মেয়ে।

বঙ্কু বলেন, বিদ্যেসাগর মশাই যদি বামুন-কায়েতের বিয়ের ব্যবস্থা করতেন, তাহলে আমিও বামুনের একটা বিধবা মেয়ের দুঃখু ঘুচিয়ে দিতে পারতাম।

কোন মেয়েটার কথা বলছিস?

আমারই এক ভাড়াটের মেয়ে।

বঙ্কু মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, তুই বিশ্বাস কর, মেয়েটাকে দেখলেই আমার বুকের মধ্যে হু হু করে ওঠে। আহাহা! কি রূপ! কি শরীর! দেখলে তোর মাথা খারাপ হয়ে যাবে!

অমূল্যচরণ বলেন, আচ্ছা বঙ্কু, হিঁদুরা যদি খ্রীস্টান হতে পারে, তাহলে আমরা কায়েতরা কেন বামুন হতে পারব না?

ঠিক বলেছিস অমূল্য। বিদ্যেসাগরের মোটা মাথায় যে কেন এই বুদ্ধিটা এলো না, তা ভেবে পাই না।

এতক্ষণ চুপ করে থাকার পর বরদাকান্ত ঘোষ বলেন, যারা বেশি লেখাপড়া করেছে, তাদের আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না।

কেন? কেন?

আরে ভাই, কোন ভদ্র-শিক্ষিত মানুষ যে চাষাদের নিয়ে নাটক লিখতে পারে,

তা আমি কল্পনাও করতে পারি না। আমাদের মত ভদ্দর লোকদেব নিয়ে কিছু না লিখে ঐ মিত্তিরবাবু যে কেন চাষাদের নিয়ে লাটক লিখলেন, তা বলতে পারিস?

বলিস কিরে? ঐ মিত্তিববাবু চাষাদের নিয়ে লাটক লিখেছেন?

লিখেছেন মানে?

বরদাকান্ত এক নিঃশ্বাসেই বলে যান, ঐ লাটক নিয়ে হিঁন্দু কলেজ থেকে পাস করা একদল আধা হিঁন্দু আধা খেস্টান ছাত্ররা এমন নাচানাচি শুরু কবেছে যে তোরা ভাবতে পাববি না।

আশ্চর্যের ব্যাপার!

কিচ্ছু আশ্চর্যের ব্যাপার না। এখন যত সব উদ্ভট কাণ্ড-কারখানা হবার যুগ এসেছে।

বঙ্কু বলেন, সত্যিই তাই। এখন মেয়েবা ইস্কুলে যাচ্ছে, বিধবাদের বিয়ে হচ্ছে, হিঁদুঁরা খেস্টান হচ্ছে। এব পব বোধহয় মেয়েরাই ছেলে পছন্দ করবে বা একটা মাগী পাঁচটা নাগব রাখবে কিন্তু আমরা মাগী রাখতে পারব না।

বরদাকান্ত মাথা দুলিয়ে বলেন, হ্যাঁ, ভাই, তেমন দিনও আসতে পারে। এক কথায় আমাদের মত পুরুষদের মহাদুর্দিন। এর যে কি পরিণতি, তা ভেবে পাই না।

যোগেন দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বলেন, এর পব আমাদের মাগীরা অপিস-কাছারিতে যাবে, টাকা আয় করবে আর আমরা বাটনা বাটবো, রান্না করবো, ছেলেমেয়েদের কাঁথা-কাপড় কাঁচবো।

বঙ্কু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, এইসব দেখে বুঝতে পারছি, এটা সত্যি কলিকাল!

সমাজ বিবর্তনের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে মহিলা মহলেও।

যাই বল পুষ্প, কয়েক বছর আগে বিধবা বিয়ের ব্যবস্থা হলে চপলাকে এভাবে গঙ্গায় ডুবে মরতে হতো না।

ঠিক বলেছ বড়দি; পুরুষরা তো মেয়েদের দুঃখ-কষ্ট বোঝে না, ওরা জানে শুধু স্ফূর্তি করতে।

যে হতচ্ছাড়া চপলার সব্বোনাশ করলো, তার ঘরে তো দু'-দুটো বউ ছিল, তা জানিস?

বলো কি বডদি? তবে চপলার একটু সাবধান হওয়া উচিত ছিল।

দ্যাখ পুষ্প, তুই আর আমি দু'জনেই স্বামীর ঘব কবছি। সত্যি কথা বলতে

আমাদেরও তো মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে স্বামীর সোহাগ পেতে।

সে তো করেই। আমরাও তো মানুষ।

তাহলেই বুঝে দ্যাখ! চপলা বিধবা হয়েছিল ঠিক এগারো বছর বয়সে। কুড়ি-একুশ বয়সে যদি একটু সোহাগ পেতে চায় বা আশা করে, তা কি অন্যায়?

অন্যায় না কিন্তু...

সরোজা একটু হেসে বলেন, তোর ঐ কিন্তুর জন্যই তো বিদ্যাসাগর মশাই এত লড়াই করে বিধবা বিয়ের ব্যবস্থা করলেন।

হ্যাঁ, বড়দি, এইসব কেচ্ছা-কেলেঙ্কারী আর আত্মহত্যার চাইতে বিধবাদের বিয়ে দেওয়া অনেক ভাল।

পুষ্প, তোকে আমি বলে দিচ্ছি, যদি কপাল দোষে আমার মেয়ে অল্প বয়সে বিধবা হয়, তাহলে আমি নিশ্চয়ই ওর বিয়ে দেব।

বাড়ির সবাই কি সে বিয়েতে মত দেবে?

দ্যাখ পুষ্প, পরের ব্যাপারে নিন্দা করা যত সহজ, নিজের সংসারের ব্যাপারে নিন্দা করা ততটাই কঠিন।

তা ঠিক কিন্তু...

সরোজা আবার একটু হেসে বলেন, কারুর মনে যে কিন্তু কিন্তু ভাব থাকবে না, তা আমি বলছি না, তবে জোর দিয়ে বলতে পারি কেউই বাধা দিতে সাহস করবে না।

নগেন্দ্রবালাকে বেথুনের স্কুলে ভর্তি করার কথা হচ্ছে শুনেই ওর জ্যাঠা রেগে লাল। উনি বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলেন, বিপিন কি মেয়েকে মেমসাহেব করতে চায় যেই স্কুলে পড়াবার কথা ভাবছে? যে মেয়েই স্কুলে যাবে, তাকে তো কোন ভদ্র পরিবারে বিয়েই দেওয়া যাবে না। বিদ্যাসাগর মশাই সমাজের সর্বনাশ না করে ছাড়বেন না।

বৃদ্ধা কৃষ্ণভামিনী ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই বড় ছেলেকে বলেন, দ্যাখ হারাণ। আমি লেখাপড়া শিখিনি বলে মুখ বুজে তোর বাবার অকথ্য অত্যাচার আর ব্যভিচার সহ্য করেছি। তুইও তোর বাপের মতন পদে পদে বড়বৌমাকে দুঃখ দিয়েছিস, অপমান করেছিস।

বৃদ্ধা একবার নিঃশ্বাস নিয়েই বলেন, আমি বলে দিচ্ছি, বিপিনের দুটো মেয়েই ইস্কুলে যাবে, অনেকগুলো পাশ দেবে ; তারপর তাদের বিয়ে হবে। তুই তোর

ছেলেকে মূর্খ করে রেখেছিস বলে বিপিনের মেয়েরা কেন লেখাপড়া শিখবে না?

একটি কথা বলারও সাহস হয় না হারাণের।

কৃষ্ণভামিনী পুজোর ঘরের দিকে পা বাড়িয়েই বলেন, তোর মত অপদার্থের মুখে বিদ্যেসাগর-বেথুন বা দেবেন ঠাকুরের মত মানুষের নিন্দা শোভা পায় না। ভুলে যাস না, ওঁরা এক একজন সাক্ষাৎ দেবতা।

কৃষ্ণভামিনীর এইসব কথা বলার কারণ ছিল।

ধনীর দুলালী কৃষ্ণভামিনীর বিয়ে হয় মাত্র আট বছর বয়সে ; স্বামী নিশিকান্ত ঠিক আঠারো বছরের। তাহলে কি হয়? ঐ বয়সেই উনি নিত্য সন্ধ্যায় বারবনিতার কাছে দু'চার ঘণ্টা না কাটিয়ে থাকতে পারতেন না। সেই সঙ্গে চলতো সুরাপান।

এইভাবেই বেশ ক'টা বছর কেটে গেল।

কৃষ্ণভামিনী যখন ষোল বছরের তখনই তাঁর গর্ভে এলো সন্তান কিন্তু মাতাল চরিত্রহীন স্বামীর অত্যাচারে অকালেই তাঁর গর্ভের সন্তান নষ্ট হয়। এক দিনের জন্যও উনি চোখের জল না ফেলে অন্নগ্রহণ করতে পারেন নি।

তারপর যতদিন গিয়েছে, ততই বেড়েছে স্বামীর অত্যাচার ও মানসিক নির্যাতন। অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি না দিয়ে নিশিকান্ত স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে পারতেন না। পানের থেকে চুন খসলেই কৃষ্ণভামিনীর কপালে জুটতো চোরের মার।

নিশিকান্তর যোগ্য পুত্র হারাণচন্দ্র। কথায় কথায় স্ত্রীকে লাথি-ঝাঁটা না মেরে হারাণ শান্তি পেতো না কিন্তু বিপিন হলো ঠিক বিপরীত চরিত্রের। বিপিনের তীব্র প্রতিবাদ আর বাধা দেবার জন্যই হারাণচন্দ্র কিছুটা সংযত হতে বাধ্য হয়। ইতিমধ্যে অতিরিক্ত সুরাপান ও ব্যভিচারের জন্য অকালেই মারা গেলেন নিশিকান্ত। ঠিক এক বছর পর কৃষ্ণভামিনীর পিতৃবিয়োগ হওয়ায় উনি একমাত্র সন্তান হিসেবে বাবার বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী হন।

কৃষ্ণভামিনী অতি সামান্য লেখাপড়া জানলেও অসম্ভব বুদ্ধিমতী ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটলো স্বামীর মৃত্যুর পর। সংসারের হাল ধরলেন কঠোর হাতে। একদিন উনি স্পষ্ট করে বড় ছেলেকে বলেন, দ্যাখ হারাণ, তোর মদ খাবার টাকার জন্য বউকে ওকালতি করতে পাঠাবি না।

শুধু এইটুকু বলেই উনি থামেন না।

আর হ্যাঁ, শুনে রাখ ; এই বাড়িটা তোর বাপ-ঠাকুর্দার নয়। এটা আমার বাড়ি। মদ খেয়ে কোনদিন এই বাড়িতে ঢুকতে পারবি না। এই বাড়িতে বাস করতে হলে ভদ্রভাবে থাকতে হবে।

কৃষ্ণভামিনীর এই বাড়ির পাশেই ছিল সদাশিব রায়ের বাড়ি। উনি সংস্কৃত

কলেজের কেরানী বলে বিশেষ পরিচয় ছিল বিদ্যাসাগর মশায়ের সঙ্গে। কৃষ্ণভামিনীর নিজের কোন ভাই ছিল না বলে উনি সদাশিবকে ভাইফোঁটা দিতেন ও অত্যন্ত স্নেহ করতেন। সদাশিবও ওনাকে শুধু বড়দি বলেই ডাকতেন না। প্রায় মায়ের মত শ্রদ্ধা করতেন।

সদাশিবের কাছে বিদ্যাসাগর মশায়ের কথা শুনে মুগ্ধ হতেন কৃষ্ণভামিনী। একদিন সদাশিবই ওনাকে বিদ্যাসাগর মশায়ের কাছে নিয়ে যান নিশিকান্ত মারা যাবার কয়েক মাস পরই।

কৃষ্ণভামিনীর সব কথা শোনার পর বিদ্যাসাগর মশাই বলেন, মা, লেখাপড়া না শেখার জন্যই সমাজের এই অবস্থা। যাইহোক, স্নেহের বশে কারুর অন্যায় বরদাস্ত করবেন না। মা, আর একটি অনুরোধ করব!

হ্যাঁ বাবা, বলুন।

নাতনীদের লেখাপড়া শেখান। ওরা লেখাপড়া শিখলে ওরা ন্যায়-অন্যায় বিচার করতে শিখবে আর ওদের ভবিষ্যত জীবন অবশ্যই সুখের ও শান্তির হবে।

হ্যাঁ বাবা, আমি নিশ্চয়ই নাতনীদের লেখাপড়া শেখাব। আপনি দয়া করে ওদের দু'জনকে বেথুনের ইস্কুলে ভর্তি করে নিলে অন্তত আমি খুব শান্তি পাবো।

হ্যাঁ মা, আমি কথা দিচ্ছি, আপনার নাতনীদের বেথুনের স্কুলেই ভর্তি করে নেবো।

বিদায় নেবার আগে কৃষ্ণভামিনী বিদ্যাসাগর মশাইকে প্রণাম করে বলেন, বাবা, আমি মাঝে মাঝে শুধু আপনাকে প্রণাম করতে আসব। আপনার কোন আপত্তি নেই তো?

হ্যাঁ, মা, নিশ্চয়ই আসবেন।

পনের

সে এক বিচিত্র যুগ!

শুধু সমাজ সংস্কার ও শিক্ষার ক্ষেত্রেই বিপ্লব ঘটলো না। বিপ্লব ঘটলো বাংলা সাহিত্য জগতেও।

এই বিপ্লবের সূচনা করলেন স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। আগে বাঙালির বর্ণপরিচয় শুরু হতো 'ক-খ-গ-ঘ' দিয়ে ; তারপর 'অ-আ-ই-ঈ'। বিদ্যাসাগর মশাই

বৈজ্ঞানিক বাংলা শেখার জন্য যে বর্ণপরিচয় লিখলেন, তাতে বাঙালির বর্ণপরিচয় শুরু হলো অ-আ-ই-ঈ দিয়ে ; তারপর ক-খ-গ-ঘ। শুধু তাই না। এই বর্ণপরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যাসাগর মশাই ছাত্রদের পরিচয় করিয়ে দিলেন প্রকৃতি ও সমাজের সঙ্গে ; 'জল পড়ে পাতা নড়ে'র মধ্য দিয়ে ছন্দের আনন্দ ও সুর ধ্বনিত হলো ছাত্রদের মনে।

বিদ্যাসাগরই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সিংহদ্বার।

'কথামালা' থেকে শুরু করে 'বোধোদয়', 'সীতার বনবাস', 'ভ্রান্তিবিলাস', 'আখ্যান মঞ্জরী', 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' ইত্যাদি পড়েই বাঙালির প্রথম পরিচয় হলো প্রকৃত সাহিত্যের সঙ্গে।

তারপর?

শুরু হলো যেন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত!

না, সে আগ্নেয়গিরি থেকে সর্বনাশা গলিত লাভা বেরুলো না ; সেই বিস্ময়কর প্রতিভার আগ্নেয়গিরি যেন বাংলা সাহিত্যের সোনাঝরা ঝরনা!

বেলগাছিয়া ভিলার ওরিয়েন্টাল থিয়েটারের নাট্যমঞ্চে শর্মিষ্ঠা নাটক দেখে সবাই বিস্মিত, সবাই মুগ্ধ।

কে লিখলেন এই নাটক?

আরে ভাই, একেবারেই অচেনা অজানা একজন।

নাট্যকারের নাম কি?

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

এত পত্র-পত্রিকা পড়ি কিন্তু এই দত্তবাবুর কোন লেখা পড়েছি বলে তো মনে পড়ে না।

তবে যাই বলো ভাই, এতকাল ইংরেজি আর বাংলায় সংস্কৃত নাটক দেখে কিছুতেই মন ভরছিল না কিন্তু নাটক না দেখেও থাকতে পারি না বলেই দেখতে যেতাম। মাইকেলের শর্মিষ্ঠা দেখে প্রাণ-মন জুড়িয়ে গেল।

হ্যাঁ, ভাই, ঠিক বলেছ।

•

এই বিস্ময় কাটতে না কাটতেই প্রকাশিত হলো মাইকেলের দু'টি প্রহসন—'একেই কি বলে সভ্যতা?' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'।

সমসাময়িক বাঙালিজীবনের বিকৃতি ও লঘু-গুরু দিক নিয়ে লেখা এই দুটি প্রহসন রসিক মহলে আরো আগ্রহ সৃষ্টি করলো মাইকেল সম্পর্কে।

কী আশ্চর্য! যিনি শর্মিষ্ঠা লিখেছেন, তিনিই আবার এইরকম প্রহসন লিখবেন, তা ভাবাই যায় না।

যাই বলো ভায়া, এই মাইকেলের ক্ষমতা আছে।

সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

দেখো, আবার উনি নতুন কি লিখে আমাদের চমকে দেন।

হ্যাঁ, সত্যিই মাইকেল চমকে দিলেন 'পদ্মাবতী' নাটক অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখে।

শুরু হয়ে গেছে মাইকেলের সৃষ্টির মহোৎসব।

একে একে প্রকাশিত হলো তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্য, 'মেঘনাদবধ' কাব্য, 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্য, 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক ও 'বীরাঙ্গনা' কাব্য।

কিন্তু কে এই বিস্ময়কর মাইকেল মধুসূদন দত্ত?

হিন্দু কলেজ থেকে ডিরোজিও অনেক আগেই বিদায় নিয়েছেন কিন্তু তখন প্রত্যেক অধ্যাপকই যথেষ্ট খ্যাতনামা পণ্ডিত ; স্কুল বিভাগে রামতনু লাহিড়ী ও রামচন্দ্র মিত্র'র মত সর্বজনশ্রদ্ধেয় শিক্ষক। এককথায় তখন হিন্দু কলেজের স্বর্ণযুগ! যশোর সাগরদাঁড়ি থেকে মধুসূদন দত্ত এলেন হিন্দু কলেজে পড়তে।

কয়েক মাসের মধ্যেই সহপাঠী ভূদেব মুখার্জী, রাজনারায়ণ বসু, গৌরদাস বসাক, ভোলানাথ চন্দ্র, বঙ্কবিহারী দত্ত ও অন্যান্যরা বিস্মিত হন মধুসূদনের কাণ্ডকারখানা দেখে।

মধু কখনো ফরাসী গজল গেয়ে মুগ্ধ করে বন্ধুদের, কখনো আবার বিস্মিত করে গড় গড় করে শেক্সপিয়র-বায়রন আবৃত্তি করে।

আবার মধু কখনো সহপাঠীদের চমকে দেয় সাহেব-নাপিতের দোকান থেকে চুল কেটে বা মদ্যপান করে। আবার কোনদিন সে ওদের অবাক করে দেয় নানা পত্রিকায় প্রকাশিত নিজের লেখা ইংরেজি কবিতা পড়ে। মধু তার লেখা ইংরেজি কবিতা পাঠায় বিলেতী পত্রিকায়, উৎসর্গ করে কবি ওয়ার্ড ওয়ার্থকে।

আশ্চর্য।

মধু কলেজের পরীক্ষায় অভাবনীয় সাফল্যের জন্য বৃত্তি পায়, স্বর্ণপদক পায় নারীশিক্ষা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে।

চমকের পর চমক! পোশাকেও মধুর চমক। প্রথমে ধুতি ছেড়ে আচকান-পায়জামা, তারপর একেবারে সাহেবী, পোশাক কোট-প্যান্ট। তবে এহ বাহ্য! মধু স্বপ্ন দেখেন বিখ্যাত ইংরেজি কবি হওয়ার।

মধুসূদন প্রিয় বন্ধু গৌরদাস বসাককে এক চিঠিতে লিখলেন—টম মুর' এর

লেখা আমার প্রিয় কবি বায়রনের জীবনী পড়ছি। সত্যি বিস্ময়কর বই। আমি নিশ্চিত আমি বিলেত যাবার পর নিশ্চয়ই বিখ্যাত কবি হবো ; তখন তুমি আমার জীবনী লিখলে কি মজাই হবে!

সত্যি মধু তখন বিলেত গিয়ে বিখ্যাত কবি হবার স্বপ্নে বিভোর!

এই স্বপ্ন বুকে নিয়েই মধু একদিন হঠাৎ খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করলেন ও হিন্দু কলেজ ছেড়ে বিশপস্ কলেজে ভর্তি হলেন। শুরু হলো অন্যান্য ভাষার সঙ্গে গ্রীক, লাতিন ও হিব্রু ভাষা চর্চা।

তারপর?

কয়েক বছর বিশপস্ কলেজে পড়াশুনা করার পরই মধুসূদন হঠাৎ কলকাতা ত্যাগ করে চলে গেলেন মাদ্রাজ। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত স্কুলে অত্যন্ত সম্মানজনক দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে চাকরি করার সঙ্গে সঙ্গে চলে মাদ্রাজের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখালেখি ও সম্পাদনার কাজ। তাদের মধ্যে কিছু কিছু লেখা পুনর্মুদ্রণ হয় কলকাতার হরকরা'য়। এরই মধ্যে 'দ্য ক্যাপটিভ লেডি' লিখে মাদ্রাজে বিশেষ সমাদর লাভ করলেন।

বন্ধু গৌরের মারফত মধুসূদন এক কপি 'ক্যাপটিভ লেডি' পাঠালেন বেথুনের কাছে। বেথুন বইটি পড়ে মধুসূদনকে লিখলেন, আপনার মত প্রতিভাসম্পন্ন কবি মাতৃভাষায় লিখলে বাংলা ভাষার যথেষ্ট উন্নতি হবে।

'প্রিয় গৌর, আমি কিভাবে দিন কাটাই জানো? ভোর ছ'টা থেকে আটটা হিব্রু, আটটা থেকে বারোটা শিক্ষকতা, বারোটা থেকে দুটো গ্রীক, দুটো থেকে পাঁচটা তামিল ও সংস্কৃত, পাঁচটা থেকে সাতটা লাতিন ও সন্ধে সাতটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত ইংরেজি পড়ি। এবার তুমিই বলো, আমি আমার পিতৃপুরুষের ভাষাকে আরো উন্নত ও অলঙ্কৃত করার চেষ্টা করছি কিনা।'

বেথুনের চিঠি পেয়েই মধুসূদন আপন মনে ভাবেন, তাইতো, আমি তো আমার মাতৃভাষাই ভুলতে বসেছি। না, না, আমাকে প্রাণ-মন দিয়ে মাতৃভাষা চর্চা করতেই হবে। ব্যস! সঙ্গে সঙ্গে বন্ধু গৌরদাসকে লিখলেন—তুমি অবিলম্বে আমাকে কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারতের শ্রীরামপুর সংস্করণ পাঠাও।

এই সময় মধুসূদনের ব্যক্তিগত জীবনেও কত কি ঘটে। রেবেকাকে বিয়ে করে ঠিক শান্তি পেলেন না। ছাড়াছাড়ি হলো। তারপর এক অসামান্যা সুন্দরী ইংরেজ কন্যা হেনরিয়েটা এলেন মধুসূদনের জীবনে ও দূর হলো সব দুঃখ আর অতৃপ্তি। ওঁদের চারটি সন্তানও হলো।

তারপর?

মধুসূদন কলকাতায় ফিরে আসার পরই শুরু হলো তাঁর সৃষ্টির মহোৎসব। মাত্র চার বছরের মধ্যে লিখলেন শর্মিষ্ঠা থেকে বীরাঙ্গনা।

বাংলা সাহিত্যে ঘটে গেল এক মহাবিপ্লব।

দেবেন্দ্রনাথের পুত্র রবীন্দ্রনাথ তখন সদ্য পৃথিবীর আলো দেখেছেন।

ভাই মতিলাল, একটা কথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে।

শৈলপতি, তুমি কি বলতে চাইছো?

তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার কররবে. দেবেন ঠাকুর হিমালয় থেকে ফিরে আসার পর কেশব সেনের মত ক্ষুরধার বুদ্ধিমান যুবককে পেয়ে শুধু ব্রাহ্মসমাজে না, সমাজের সর্বস্তরে এক অভাবনীয় পরিবর্তন আনছেন।

হ্যাঁ, তা তো স্বীকার করতেই হবে। ওঁরা বাড়ির গিন্নীদের লেখাপড়া শেখাতে শুরু করায় বহু সংসারের চেহারাই বদলে যাচ্ছে।

বুঝলে মতিলাল, আমি বলছিলাম, মাইকেল মাত্র তিন-চার বছরের মধ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে যে অভিনবত্ব, চাঞ্চল্য ও প্রাণ সঞ্চার করেছেন, তারও কোন তুলনা হয় না।

হ্যাঁ. ভাই, আমিও মনে-প্রাণে তা স্বীকার করি।

সেদিন হিন্দু কলেজের এক প্রবীণ অধ্যাপকের কাছে মাইকেলের কথা শুনে তো আমি অবাক হয়ে গেলাম।

কেন ভাই?

শুনলাম, মাইকেল হিন্দু কলেজে পড়ার সময়ই ইংরেজি কবিতা লিখে অনেককে অবাক করে দেন।

আচ্ছা!

তাছাড়া শুনলাম, উনি যেমনই অস্থিরমস্তিষ্ক, তেমনই উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের।

বল কী?

হ্যাঁ, ভাই ঠিকই বলছি।

তবে যে শুনছিলাম, মাইকেল দশ বারোটা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে পড়াশুনা করেছেন।

হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছ।

এবার শৈলপতি একটু হেসে বলেন, এ হেন অস্থিরমস্তিষ্ক ও উচ্ছৃঙ্খল মানুষ যদি মাত্র তিন-চার বছরের মধ্যে প্রায় মহাকাব্যের মত এত সৃষ্টি করতে পারেন.

তাহলে তিনি কি ধরনের প্রতিভাবান, তা ভাবতে পারো?

হ্যাঁ, ভাই, সত্যিই বিস্ময়কর।

শুধু বিস্ময়কর না, বলো, অকল্পনীয়। চিরকালের রীতি-নীতিকে অগ্রাহ্য করে কি সৃষ্টিই করে গেলেন!

বাংলা কাব্য জগতে আবার করে এই ধরনের নতুন কিছু যে কবে সৃষ্টি হবে তা জানি না।

আবার বিস্ফোরণ! অভূতপূর্ব প্রতিভাব বিস্ফোরণ!

ডেপুটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দুর্গেশ-নন্দিনী' প্রকাশিত হতেই আলোড়ন সৃষ্টি হলো শিক্ষিত বাঙালি সমাজে।

সত্যি, সে এক স্মরণীয় দিন!

সব শিক্ষিতের মুখেই এক কথা—আহাহা, কি ভাষা! কি চরিত্রচিত্রণ! কি কমনীয়তা!

অনেকে বললেন, 'আলালের ঘরের দুলাল' পড়ে মনের মধ্যে উপন্যাস পড়ার জন্য বেশ খিদে বাড়িয়েছিল ; সেই খিদে, সেই অতৃপ্তি মিটল বঙ্কিমবাবুর 'দুর্গেশ নন্দিনী' পড়ে।

শুধু বাংলাদেশ নয়, দুর্গেশ-নন্দিনীর প্রভাব ছড়িয়ে পড়লো দেশের নানা প্রান্তে। কয়েক মাসের মধ্যেই প্রকাশিত হলো এই যুগান্তকারী উপন্যাসের মারাঠী অনুবাদ।

কিছুদিনের মধ্যেই আবার বঙ্কিমবাবুর উপন্যাস!

কপালকুণ্ডলা!

আবার বিস্ময়ের পালা। কি আশ্চর্য গাম্ভীর্য রস-পূর্ণ সৃষ্টি!

এবার প্রকাশিত হলো 'মৃণালিনী'।

ঘরে-ঘরে পাড়ায়-পাড়ায় শিক্ষিতদের আড্ডাখানায় এক মাত্র আলোচনার বিষয় বঙ্কিমের উপন্যাস।

যাই বলুন ব্রজদুলালবাবু, আপনাকে স্বীকার করতেই হবে বাংলা উপন্যাস সাবালক হলো বঙ্কিমবাবুর কৃপায়।

শুধু স্বীকাব করবো না, অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে স্বীকার করবো, এবার বাঙালিকে উপন্যাস পড়ার নেশা ধরিয়ে দিলেন বঙ্কিমবাবু।

না, শুধু তাই না।

'রাজসিংহ', 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারাম' লিখে বঙ্কিমচন্দ্র ছড়িয়ে

দিলেন দেশপ্রেমের ভাব। তাছাড়া আগের লেখা 'বন্দেমাতরম্' গান যেন মৌচাকে ঢিল ছোঁড়ার কাজ করলো।

ওদিকে বেলগাছিয়ার সাতপুকুরের বাগানে হিন্দুমেলায় গাওয়া হয়েছে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গাও ভারতের জয়' ; আগ্রার আনন্দচন্দ্র রায় লিখলেন—

কত কাল পরে বল ভারত রে!
দুখসাগব সাঁতারি পার হবে..

কেশব সেনের বক্তৃতা, দীনবন্ধুর নীলদর্পণ', বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, বিদ্যাভূষণের 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা ও ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শিক্ষিত সমাজকে অনেক নতুন চিন্তার রসদ জোগালো।

মধুসূদন হালদারকে ঘরের মধ্যে পা দিতে দেখেই সুরেশবাবু বলেন, এসো, মধু, এসো।

উনি সঙ্গে সঙ্গেই বলেন, বসো ; বলো, কি ব্যাপার।

দাদা, আগে বলুন, আপনি কেমন আছেন?

শারীরিক দিক থেকে ভালই আছি কিন্তু মানসিক অবস্থা বিশেষ ভাল না।

মধুসূদন একটু চিন্তিত হয়েই বলেন, কেন দাদা? পারিবারিক কোন কারণে...

ওনাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই সুরেশবাবু বলেন, না, মধু, কোন সাংসারিক বা পারিবারিক কারণে না।

তবে?

সুরেশবাবু একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, বঙ্কিমবাবুর রাজসিংহ-আনন্দমঠ-সীতারাম পড়ে একটু চিন্তায় পড়েছি।

মধুসূদন ওনার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতেই সুরেশবাবু একটু ম্লান হেসে বলেন, দেখো মধু, যুগ যুগ ধরে আমরা শুধু নিজেদের নিয়েই মত্ত আছি। এক দল ডজন ডজন বিয়ে করে বা রক্ষিতাকে নিয়ে স্ফূর্তি করে মত্ত থেকেছেন, অন্যরা নবাবদের আর সাহেবদের মোসাহেবী করে টাকা রোজগারে মত্ত থেকেছেন।

ঠিক বলেছেন।

রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগর সমাজ সংস্কার আর শিক্ষার প্রসারে প্রাণপাত করেও আমাদের মানুষ করতে পারলেন না।

দাদা, কথাটা কি ঠিক হলো?

মধুসূদন না থেমেই বলে যান, ওদের মত মহাপুরুষদের কৃপাতেই তো আমরা

অনেক ভদ্র-সভ্য হয়েছি, লেখাপড়াও শিখছি।

সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু তবুও কি আমরা দেশের কথা ভাবি?

সুরেশবাবু মুহূর্তের জন্য থেমেই একটু হেসে বলেন, বুঝলে মধু, বঙ্কিমবাবুর ঐ উপন্যাসগুলো পড়েই দেশের কথা প্রথম মনে এলো।

হ্যাঁ, দাদা, সত্যি আমরা দেশের কথা কখনই চিন্তা-ভাবনা করি না।

মধু সঙ্গে সঙ্গেই বলেন, দাদা, বঙ্কিমবাবুর ঐ বইগুলো আমাকে পড়তে দেবেন?

নিশ্চয়ই দেব।

পরের রবিবারই মধুসূদন আবার এসে হাজির?

সুরেশবাবুর ঘরে পা দিয়েই উনি বলেন, দাদা, বন্দেমাতরম্!

মধুসূদনের মুখে 'বন্দেমাতরম্' শুনেই সুরেশবাবুর চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বলেন, হ্যাঁ, মধু, বন্দেমাতরম্!

ঢাকা কলেজের ছাত্ররাও ঐ একই আলোচনা করে।

যাই বলো ত্রিদিব, বঙ্কিমবাবুর 'আনন্দমঠ' পড়ার আগে স্বপ্নেও ভাবিনি, দেশকেও মায়ের মত ভালবাসতে হয়।

হ্যাঁ, ভাই, কেদার, 'আনন্দমঠ' 'রাজসিংহ' 'সীতারাম' আমাদের দৃষ্টিভঙি একেবারে ঘুরিয়ে দিল।

সিরাজুল একটু হেসে বলে, আমার আব্বা বলছিলেন, শুধু বঙ্কিমবাবুর জন্যই দেশপ্রেম বলে একটা শব্দ জানলাম।

কেদার আর ত্রিদিব একই সঙ্গে বলে, তোমার আব্বা খুবই পণ্ডিত মানুষ ; উনি ঠিকই বলেছেন।

তখন বঙ্গদেশে সমুদ্রের ঢেউয়ের মত একের পর এক বিস্ময়কর প্রতিভার আবির্ভাব হচ্ছে কিন্তু মাত্র সতের বছরের ছেলের লেখা কবিতার বই?

হ্যাঁ, দেবেন ঠাকুরের সতের বছরের ছেলে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'কবি কাহিনী'।

বছর তিনেক পর বেরুলো 'বাল্মিকী প্রতিভা'।

এটাও কি কবিতার বই?

না, দাদা, এটা শুধু কবিতার বই না। 'বাল্মিকী প্রতিভা' গীতিনাট্য।

সে কি?

হ্যাঁ, দাদা, শুধু গানের দ্বারা নাট্য সৃষ্টি।

আশ্চর্য ব্যাপার!

হ্যাঁ, দাদা, সত্যি আশ্চর্যের ব্যাপার।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতেই প্রথম মঞ্চস্থ হলো 'বাল্মিকী প্রতিভা'। বাল্মিকীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।

অভিনয় দেখে মুগ্ধ বঙ্কিমচন্দ্র, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও যুবক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। মুগ্ধ গুরুদাস তো একটা গানই লিখলেন এই গীতিনাট্য দেখে—

'...উঠেছে নবীন রবি, নব জগতের ছবি
নব 'বাল্মিকী প্রতিভা' দেখাইতে পুনর্বার'।

রবীন্দ্রনাথের বিয়ের বছরখানেকের মধ্যেই 'বৌঠান' কাদম্বরী দেবীর অকস্মাৎ আত্মহত্যা নিয়ে তখন কত কথা, কত আলোচনা! বাইরের জগতের মানুষ জানতেন না, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর এই ভ্রাতৃজায়ার অভাবনীয় স্নেহ প্রীতি-ভালবাসার কথা। তবে রবীন্দ্রনাথের 'ভগ্নহৃদয়' পড়ে তার গভীরতা অনুভব করলেন সুধীজন।

'স্নেহের অরুণলোকে খুলিয়া হৃদয় প্রাণ
এ পারে দাঁড়ায়ে দেবি, গাহিনু যে শেষ গান
তোমারি মনের ছায় সে গান আশ্রয় চায়,
একটু নয়নজল তাহারে করিও দান।...'

ঠিক পরের বছরই প্রকাশিত হলো 'সন্ধ্যা সঙ্গীত'।

রমেশচন্দ্র দত্ত'র বড় মেয়ে কমলার বিয়ে। শহরের সব গণ্যমান্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরাই আমন্ত্রিত।

বিয়েবাড়ির প্রবেশদ্বারে রমেশচন্দ্র সাদরে অতিথিদেব অভ্যর্থনা করে তাঁদের গলায় মালা পরিয়ে দিচ্ছেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উপস্থিত হতেই রমেশচন্দ্র তাঁর গলায় মালা পরিয়ে দেন। ঠিক সেই মুহূর্তে দেবেন্দ্রনাথের পুত্র রবীন্দ্রনাথ এসে হাজির।

বঙ্কিমচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে নিজের গলার মালা রবীন্দ্রনাথের গলায় পরিয়ে দিয়ে বলেন, এ মালা রবিরই প্রাপ্য।

রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ ও বিস্মিতও।

বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্রকে বলেন, রমেশ, তুমি রবির 'সন্ধ্যা সঙ্গীত' পড়েছ?

না।

পড়ো : তুমি অবাক হয়ে যাবে।

'বৌঠাকুরাণীর হাট' পড়ে মুগ্ধ হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র চিঠি লেখেন রবীন্দ্রনাথকে।

'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার ব্যাপারে চিন্তাধারার পরিচয় পেয়ে অবাক হয় দেশের মানুষ। যখন ইংরেজি শেখার জন্য দেশের মানুষ পাগল, তখন উনি সুস্পষ্টভাবে বললেন, মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষা দেওয়া উচিত।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলো পড়েও দেশের শিক্ষিত সমাজ বিস্মিত না হয়ে পারে না! 'ইংরেজ ও ভারতবাসী', 'ইংরেজের আতঙ্ক', 'সুবিচারের অধিকার', 'রাজা ও প্রজা' ও 'রাজনীতির দ্বিধা'র মত প্রবন্ধগুলো পড়ে দেশের মানুষ তাঁর দেশাত্মবোধের পরিচয় পায়।

বঙ্কিমবাবুর রাজসিংহ, আনন্দমঠ, সীতারাম ও দেবী চৌধুরাণীর পর রবীন্দ্রনাথের এইসব প্রবন্ধ দেশবাসীকে দেশ সম্পর্কে আরো বেশি সচেতন করলো, উদ্বুদ্ধ করলো দেশকে ভালবাসতে।

এই সময় সুদূর আফ্রিকায় কৃষ্ণকায় জুলুদের উপর ইংরেজদের অকথ্য অত্যাচারের সংবাদে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—

ওরে, তুই ওঠ আজি।
আগুন লেগেছে কোথা! কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি
জাগাতে জগতজনে! কোথা হতে ধ্বনিছে ক্রন্দনে
শূন্যতল! কোন্ অন্ধ কারা-মাঝে জর্জর বন্ধনে
অনাথিনী মাগিছে সহায়!

এই কবিতা পড়েই বাগবাজারের মনমোহন পটুয়াটোলার গিরিধারীর কাছে এসে হাজির।

মনমোহন ঐ কবিতার কথা বলতেই গিরিধারী গম্ভীর হয়ে বলেন, পড়েছি।

পড়ে কী মনে হলো?

তুমি তো জানো, অনেক ব্রাহ্ম পরিবারের সঙ্গেই আমার হৃদ্যতা ও ঘনিষ্ঠতা আছে।

হ্যাঁ, জানি।

ওদের কাছ থেকে নিয়েই আমি রবিবাবুর লেখাগুলো পড়ি। ওনার প্রবন্ধগুলোও

আমি পড়েছি।

মনমোহন চুপ করে সব শোনেন।

মাইকেল এসেছিলেন সাইক্লোনের মত। উনি এলেন, লিখলেন. জয় করলেন কিন্তু রবিবাবু একেবারেই অনা ধরনের প্রতিভা।

অন্য ধরনের মানে?

রবিবাবুর কাব্যসৃষ্টির ধারা শুধু বিচিত্র নয়, ওনার চিন্তাধারাও বহুমুখী।

ঠিক বলেছ।

বঙ্কিমবাবুর যেসব উপন্যাসে দেশাত্মবোধের সুব আমবা শুনেছি, সেই সুরই আরো স্পষ্টভাবে শুনছি ববিবাবুর সাম্প্রতিক প্রবন্ধ আর 'ওরে তুই ওঠ আজি/আগুন লেগেছে কোথা?' কবিতায়।

মনমোহন একটু হেসে বলেন, হ্যাঁ, ভাই. আমারও তাই মনে হয়েছে।

উনি না থেমেই বলেন, দেখ ভাই. বঙ্কিমবাবুর আনন্দমঠ-বন্দেমাতরম' এর পর রবিবাবুর এইসব লেখালেখির সঙ্গে সুরেন বাঁড়ুজ্যে, আনন্দমোহন বসুদের বক্তৃতা শুনে আমার মনে হচ্ছে, দেশের মধ্যে একটা নতুন হাওয়া বইতে শুরু করেছে।

করেছেই তো! কোনো জাত কি চিরকাল রক্ষিতাদের নিয়েই মত্ত থাকতে পারে?

গিরিধারী এক নিঃশ্বাসে বলে যান, রামমোহন-হেয়ার-বেথুন-বিদ্যাসাগরদের কৃপায় দেশের মানুষ যত শিক্ষিত হবে, ততই নিত্য নতুন চিন্তা-ভাবনার হাওয়া বইবে, এতে আশ্চর্য হবার কী আছে?

তা ঠিক।

মনমোহন, অনেক কাল আমরা ঘুমিয়েছিলাম। রামমোহনের চাবুকের ঘা খেয়ে আমরা প্রথম একটু নড়ে-চড়ে উঠে বসি। তারপর থেকে সমাজের উপর কম চাবুকের ঘা তো পড়লো না! এখন আমরা উঠে দাঁড়িয়েছি।

মনমোহন অবাক হয়ে ওনার কথা শোনেন।

গিরিধারী একুট হেসে বলেন, এখনই আমরা দৌড়তে পারবো না কিন্তু কয়েক পা এগুতে তো পারি।

মনমোহনও একটু হেসে বলেন, হ্যাঁ, ভাই, আমারও মনে হচ্ছে, কোনো এক অজানা ঠিকানার দিকে আমরা এগুতে শুরু করেছি।

এ যেন দুরন্ত পাহাড়ী ঝরনা!

নাচতে নাচতে ছুটে চলেছে। পাহাড়ের অজানা গুহা থেকে বেরিয়ে কত চড়াই-

উতরাই পেরিয়ে, গহন অরণ্য ছাড়িয়ে, গ্রাম-গঞ্জ শহর-নগর পাশে রেখে চারপাশে পলি ছড়াতে ছড়াতে ছুটে চলেছে সৃষ্টির অমৃতসাগরের দিকে।

সৃষ্টির পর সৃষ্টি!

প্রভাত সঙ্গীত, ছবি ও গান, প্রকৃতির পরিশোধ, নলিনী, শৈশব সঙ্গীত, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, কড়ি ও কোমল, রাজর্ষি, মায়ার খেলা, রাজা ও রাণী, বিসর্জন, মানসী, চিত্রাঙ্গদা, গোড়ায় গলদ, সোনার তরী ও আরো আরো কত কি!

সেই সঙ্গে আরো কত গান! কত প্রবন্ধ!

না, তখনও রবিবাবুর লেখা সাধারণ বাঙালি সমাজে ছড়িয়ে পড়েনি কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজে ও শিক্ষিতদের মধ্যে নিত্য আলোচনাব বিষয়।

ব্রাহ্ম সমাজের প্রার্থনাসভা শেষ হবার পরই গিরিজাশঙ্কর বন্ধুবর কৃপাসিন্ধুকে বলেন, রবির এইসব গান শুনলে মন সত্যিই অন্য জগতে চলে যায়।

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। উপনিষদের মূল ভাবগুলি নিয়ে রবি সত্যি অসাধারণ সব গান লিখছে।

রবি দেবেন্দ্রনাথের মত শুধু সমাজ নিয়েই মেতে থাকে না কিন্তু উপনিষদেব মূল সুরটিকে ও কিভাবে এই বয়সেই আত্মস্থ করলো, তা ভেবে অবাক হয়ে যাই।

কৃপাসিন্ধু একটু হেসে বলেন, শুধু এইসব গান না, রবির, সব লেখা পড়েই তো সবাই অবাক হয়ে যাচ্ছে।

আশু বাঁড়ুজ্যেরা ব্রাহ্ম না কিন্তু অনেক ব্রাহ্ম পরিবারের সঙ্গেই ওদের হৃদ্যতা-ঘনিষ্ঠতা। ব্রাহ্ম পরিবারের ছেলে হলেও নলিনীকিশোর আশুর অন্তরঙ্গ বন্ধু।

ইদানীংকালে আশু ওদের বাড়িতে গেলেই নলিনীকিশোর ওকে রবিবাবুর লেখা পড়ে শোনায়। একই কবি যে কিভাবে 'বাল্মীকি প্রতিভা' আর 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' লেখেন, তা আশু ভেবে পায় না। ও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে, হ্যাঁ, ভাই, নলিনী, তোমাদের সমাজের রবিবাবু সত্যি প্রতিভাসম্পন্ন।

আশু নলিনীকিশোরের বিবাহবাসরে ওর স্ত্রী কাদম্বিনী ও তার দু'বোনের গলায় রবিবাবুর গান শুনে শুধু মুগ্ধ হলো না। উচ্ছ্বাসে আনন্দে খুশিতে ভেসে গেল।

এখন দিন-রাত ও গুণ গুণ করে গেয়ে যায় ঐসব গান!

ব্রজমাধব ঘরে পা দিয়েই হাসতে হাসতে বলে, কি ব্যাপার আশু? গুণ গুণ করে

কি গান গাইছো?

আশু ব্রজমাধবকে জড়িয়ে ধরে বলে, ভাই, আমি রবিবাবুর গান শুনে পাগল হয়ে গেছি।

তার মানে?

তুমি তো আমার বন্ধু নলিনীকিশোরকে চেনো?

বিলক্ষণ চিনি।

ঐ নলিনীকিশোরের বিবাহবাসরে ওর স্ত্রী আর দুই শালী রবিবাবুর গান গেয়ে আমাকে পাগল করে দিয়েছে।

ব্রজমাধব একটু হেসে বলে, এমন কি গান শুনলে যে...

ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই আশু বলে, নলিনীকিশোরের স্ত্রী কি গান গাইলো জানো?

কি গান?

আশু গুণ গুণ করে গেয়ে ওঠে—

আমার পরাণ যাহা চায়,
তুমি তাই, তুমি তাই গো।
তোমার ছাড়া আর এ জগতে
মোর কেহ নাই, কিছু নাই গো।...

এই দু'লাইন শুনেই ব্রজমাধব বলে, আহা হা!

আশু শুধু একটু হেসে আবার শুরু করে—

তুমি সুখ যদি নাহি পাও
যাও সুখের সন্ধানে যাও—
আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয় মাঝে
আর কিছু নাহি চাহি গো।
আমি তোমার বিরহে রহিব বিলীন
তোমাতে করিব বাস
দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী, দীর্ঘ বরষ মাস।
যদি আর কারে ভালোবাস
যদি আর ফিরে নাহি আস,
তবে তুমি যাহা চাও তাই যেন পাও—
আমি যত দুখ পাই গো।।
আমার পরান যাহা চায়...

ব্রজমাধব একগাল হেসে মাথা নেড়ে বলে, হ্যাঁ, ভাই, এই গান শুনে সত্যি মাথা খারাপ হয়ে যায়।

আশু খুশির হাসি হেসে বলে, নলিনীকিশোরের স্ত্রী কাদম্বিনী কি সুকণ্ঠী। তুমি ভাবতে পারবে না। তারপর গানটি শিখেছে স্বয়ং রবিবাবুর কাছে।

রবিবাবু কি গানও জানেন?

কি আশ্চর্য! রবিবাবু শুধু গান লেখেন না ; উনি নিজের গানে নিজেই সুর সংযোজন করেন। তাছাড়া অসম্ভব ভাল গায়ক।

রবিবাবুর এত গুণ?

ভাই, রবিবাবু শুধু গুণী না। পরম বিস্ময়।

আশু সঙ্গে সঙ্গেই একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, আমরা রবিবাবুর কিশোর-যৌবনের লেখা আর নানা গুণ দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি। পরিণত বয়সে বোধহয় ইনি সারা দেশকে মাতিয়ে তুলবেন!

হ্যাঁ সেইরকমই আশা করা যায়।

উত্তর কলকাতার উপকণ্ঠে দক্ষিণেশ্বর।

সেখানে গঙ্গার তীরে কালী আর দ্বাদশ শিবের মন্দির তৈরি করেছন জানবাজারের রাণী রাসমণি।

সেখানকার পূজারী মাঝে মাঝেই কেমন আনমনা হয়ে যান ; অবাক বিস্ময়ে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন মা ভবতারিণীর দিকে। ক্ষুধা-তৃষ্ণার দিকেও খেয়াল থাকে না।

আত্মীয়-স্বজনরা ক্ষুদিরাম আর চন্দ্রমণিকে বলেন, ছেলের বিয়ে দাও। সংসারী হলেই এসব ভাব কেটে যাবে।

হ্যাঁ, বাইশ-তেইশ বছরের রামকৃষ্ণের সঙ্গে বিয়ে হলো ন'বছরের সারদামণির!

হা, ভগবান! এখন তো পুজোয় বসলে তাঁর পুজোই শেষ হয় না! আরতি শুরু করলে আরতিও শেষ হয় না। তাছাড়া মাঝে মাঝেই নিজেকেই নিজে পুজো করেন।

দিনরাত শুধু 'মা'! 'মা'!

শুধু কি তাই?

কোন কামিনী-কাঞ্চনাসক্তকে দেখলেই দূরে পালিয়ে যান। আবার শুদ্ধ চরিত্রের কাউকে দেখলেই প্রাণভরে মায়ের কথা বলেন।

রামকৃষ্ণ একগাল হেসে বলেন, যিনিই পরব্রহ্ম, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, তিনিই মা!

কি বললে? বেহ্ম সমাজের কেশব ঈশ্বরের ধ্যান করেন? চলো, বেলঘরের বাগানে গিয়ে কেশবের সঙ্গে দেখা করে আসি।

ঈশ্বর-প্রেমে পাগল রামকৃষ্ণকে দেখে আর তাঁর সঙ্গে কথা বলে কেশব মুগ্ধ! কেশবকে দেখেও রামকৃষ্ণের মন খুশিতে ভরে যায়। শুরু হয় দু'জনের দেখাশুনা, মেলামেশা, ঈশ্বর নিয়ে কথাবার্তা।

রামকৃষ্ণ কেশবকে ভাল না বেসে পারেন না, কেশবও রামকৃষ্ণকে শ্রদ্ধা না করে পারেন না।

কে আবার রামকৃষ্ণকে বলে, কেশব তো বেহ্মো। ওরা দেব-দেবীর মূর্তিকেই মানে না ; ওরা নিরাকার, ব্রহ্মের সাধনা করে।

রামকৃষ্ণ একটু হেসে বলেন, ওরে বাপু, জল আর বরফ কি আলাদা? সাকার-নিরাকার একই ব্যাপার।

আপনি যীশুর ছবি দেখলেও প্রণাম করেন, আর পীরের দরগায় গিয়েও লুটিয়ে পড়েন।

কেন পড়ব না? ওরা ওদের মত ঈশ্বর চিন্তা করছে, আমি আমার মত চিন্তা করছি। ওরে বাবা, যত মত, তত পথ।

রামকৃষ্ণ আবার বলেন, তুমি কলকাতা যেতে চাও? তুমি হেঁটে যাও, গাড়িতে যাও আর নৌকায় যাও, তাতে কি আসে-যায়। মোদ্দা কথা হচ্ছে, কলকাতা পৌঁছতে হবে।

কেশব সেন ও আরো কিছু মানুষের জন্য রামকৃষ্ণের কথা ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। কতজনে ছুটে আসেন দক্ষিণেশ্বরে ঈশ্বর-পাগল রামকৃষ্ণের কাছে ; আসেন গুণী-জ্ঞানীরাও।

সিমলে পাড়ার অ্যাটর্নি বিশ্বনাথ দত্ত'র ছেলে নরেন অসম্ভব মেধাবী ও কৃতী ছাত্র। কলেজের লাইব্রেরীতে যে বই পায়, তাই পড়ে। সাহিত্য-দর্শন-ইতিহাস-ব্যাকরণ। সবকিছু। মিল-স্পেনসার-ডারউইন-বেন্থামের মত বিশ্ববিখ্যাত মনীষীদের সব রচনা কণ্ঠস্থ কিন্তু...

সত্যিই কি ঈশ্বর আছেন?

সবাই বলেন, নিশ্চয়ই আছেন।

আমাকে ঈশ্বর দেখাও তো।

সবাই পিছিয়ে যায়।

অশান্ত মন নিয়ে নরেন যান ব্রাহ্ম সমাজে, ম্যাসনে। বেশ ক'বছর ওদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা মেলামেশা করেও মন শান্ত হয় না।

সিমলে পাড়ার সুরেন মিত্তিরেই বাড়িতেই রামকৃষ্ণের সঙ্গে নরেনের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। শুরু হয় দক্ষিণেশ্বর যাতায়াত।

মাধ্যাকর্ষণ শক্তির জন্য যেমন সমস্ত উৎক্ষিপ্ত বস্তু পৃথিবীর বুকে নেমে আসে, চুম্বক যেমন লৌহকণিকা টেনে নেয়, মধুর লোভে ব্যাকুল ভ্রমর ছুটে আসে ফুলের বনে, ঠিক সেইভাবে আকর্ষিত হন এই অশান্ত, শিক্ষিত যুবক 'অশিক্ষিত' 'ঈশ্বর পাগল' 'কামিনী-কাঞ্চন মোহমুক্ত' রামকৃষ্ণের দিকে।

তবে সূচনা হয় সঙ্গীত দিয়ে।

নরেন গান শোনালেন ঠাকুরকে।

প্রথমে গাইলেন ব্রাহ্ম সমাজের অঘোরনাথ পাকড়াশীর লেখা 'মন চল নিজ নিকেতনে' ; তারপর বেচারাম চাটুজ্যের 'যাবে কি হে দিন আমার বিফলে'।

রামকৃষ্ণ মুগ্ধ!

এই পুরুষোত্তমকে দেখে নরেনও মুগ্ধ!

এত ভক্ত সমাগম হয় কিন্তু একজনকেও মন্ত্র-তন্ত্র দিয়ে নিজেকে গুরুর আসনে বসান না ; একটা পয়সাও গ্রহণ করেন না প্রণামী হিসেবে।

ক্ষুধাতুর ক্রন্দনরত অবোধ শিশু যেমন মাতৃস্তন্য পান করে ও তার উষ্ণ সান্নিধ্যে আস্তে আস্তে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ে, ঠিক সেই রকমই রামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে ও কথামৃতে নরেনের মনের সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কালো মেঘ দূর হয়।

তারপর?

তারপর গড় গড় করে গাড়ি চলতে শুরু করে।

আশে-পাশের ভক্তদের মুখে বার বার 'জীবে দয়া' 'জীবে দয়া' শুনেই রামকৃষ্ণ ক্ষেপে যান।

'দূর শালা! জীবে দয়া, জীবে দয়া আবার কি? তুই কীটাণুকীট হয়ে জীবে দয়া করবি! না, না, জীবে দয়া না—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা।'

নরেন নির্বিকল্প সমাধিতে ডুবে থাকতে চায় শুনেই রামকৃষ্ণ বলেন—ছি, ছি, এত ছোট তোর নজর! আমি ভেবেছিলাম, কোথায় তুই একটা বিশাল বটগাছের মত

হবি, তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে, তা না হয়ে তুই কিনা শুধু নিজের মুক্তি চাস। এতো অতি তুচ্ছ হীন কথা। নারে, এত ছোট নজর করিসনি।

নরেন আর কী পেলেন রামকৃষ্ণের কাছে?

পথনির্দেশ।

আর কী?

সিংহ-শাবকের ঘুম ভাঙিয়ে সুপ্ত শক্তির জাগরণ।

আর কী?

শিব-জ্ঞানে জীবসেবার তীব্র বাসনা।

আর কী?

'লোক-শিক্ষে' দেবার নির্দেশ ও অনুপ্রেরণা।

ধর্ম, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, শিক্ষা-দীক্ষা আহার-বিহার পোশাক-পরিচ্ছদ থেকে জীবনের মূল্যবোধ নিয়ে মানুষ তখন দিশেহারা। সর্বত্রই টানাপোড়েন বিচ্ছেদ-বিরোধ। ঠিক সেই যুগসন্ধিক্ষণে রামকৃষ্ণের সমন্বয়ের বাণী, সংস্কার-মুক্ত চিন্তাধারার স্রোত বয়ে গেল সমাজে।

জাত-পাতের বালাই?

'কই আর আছে? কেশব সেনের বাড়ি চচ্চড়ি খেয়েছি।... একটা লম্বা দাড়িওয়ালার কাছ থেকে বরফ নিয়ে ক্যাচড়-ম্যাচড় করে চিবিয়ে খেয়েছি। তা জানো, জাতিভেদ আপনি খসে পড়ে। যেমন নারকেল গাছ, তালগাছ যত বড় হয়, তত বেল্লোত খসে পড়ে। জাত-পাতের বালাইও তেমনি খসে পড়ে। টেনে ছিঁড়তে নেই।'

তারপর?

নরেনের নবজন্ম হলো। পুনর্জন্ম হলো বিবেকানন্দ-রূপে।

কী বলেন বিবেকানন্দ?

"আমি এমন একটি ধর্ম চাই, যাহা আমাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও জাতীয় মর্যাদাবোধ জাগাইবার, দরিদ্র জনসাধারণকে অন্ন ও শিক্ষা দিবার, আমাদের

চতুষ্পার্শ্বের সকল দুঃখ-বেদনাকে দূর করিবার শক্তি আনিয়া দিবে।"

আর কী বলেন?

"যদি ভগবানকে পাইতে চাও, তবে মানুষের সেবা করো।"

সহায়-সম্বলহীন পরিব্রাজক বিবেকানন্দ ঘুরে বেড়ান আসমুদ্র হিমাচল। প্রত্যক্ষ করেন জনজীবন। দুঃখ-কষ্ট জর্জরিত চির উপেক্ষিত মানুষদের ব্যথা-বেদনা তাঁকে চঞ্চল করে তোলে। তাছাড়া অশিক্ষা আর কুসংস্কার দেখেও উনি স্থির থাকতে পারেন না।

তাছাড়া সারাদেশের মানুষেব হীনমন্যতা আর আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখে বিবেকানন্দ চিন্তিত না হয়ে পারেন না।

না, না, এই অবস্থা চলতে পারে না। যে জাতির গৌরবময় ঐতিহ্যের কথা মানব-ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে, তাকে আত্মবিশ্বাস অর্জন করতেই হবে, দূর করতে হবে হীনমন্যতা।

তাছাড়া আরো কত কি!

চির উপেক্ষিত যুগ যুগ ধরে নিপীড়িত মানুষদের আবার স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে ; মুছিয়ে দিতে হবে ওদের চোখের জল।

পরিব্রাজক বিবেকানন্দ যেন থামতে পারেন না। ক্ষুধা-তৃষ্ণা উপেক্ষা করে, শারীরিক ক্লেশ অগ্রাহ্য করে ঘুরে বেড়ান গ্রাম-গঞ্জ শহর-নগর। কখনও ভিক্ষা করে জীবনধারণ, কখনও আবার দীন-দরিদ্র'র পর্ণকুটিরে বা রাজা-মহারাজার প্রাসাদে আতিথ্য ; রাত্রিযাপন কখনও গাছতলায় বা পথের ধারে।

বিবেকানন্দের চোখের সামনে ভেসে ওঠে বেদান্তের ভারত, অসংখ্য দেব-দেবী-পুণ্যাত্মাব ভারত, পৃথিবীর নানা ধর্ম-সংস্কৃতির সমন্বয়ের ভারত।

আবার সঙ্গে সঙ্গে বুকে জ্বালাবোধ করেন, চোখে জল আসে নিপীড়িত-দরিদ্র-লাঞ্ছিত-অত্যাচারী-বঞ্চিত বুভুক্ষু দেশবাসীর জন্য, নিজের চোখে দেখা সহায়-সম্বলহীন-অসহায় মা-ভাই-বোনের জন্য।

বিবেকানন্দ মনে মনে বলেন, যারা দু'মুঠো অন্ন পায় না, রোগীকে পথ্য দিতে পারে না, মেয়েদের লজ্জা নিবারণের জন্য একটুকরো কাপড় দিতে পারে না, তাদের কাছে বেদ-বেদান্তের কী মূল্য? এদের কাছে অন্ন-পথ্যই ভগবান।

ঠাকুর ঠিকই বলতেন, ওরে খালি পেটে ধর্ম হয় না।

অনেক দেরিতে শিকাগো বিশ্ব ধর্ম মহাসম্মেলনের খবর পৌঁছলো কলকাতায়।

সবার মুখে এক কথা। বছর তিরিশের তরুণ সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ স্তম্ভিত করেছেন ঐ মহাসম্মেলনের সমস্ত প্রতিনিধি ও অভ্যাগতদের!

আশ্চর্য ব্যাপার!

কী বলেছেন উনি?

অমৃতবাজার পত্রিকার উপর দিয়ে চোখ বুলাতে বুলাতে খগেন ঘোষ বলেন, তাহলে শুনুন, উনি কি বলেছেন।

হ্যাঁ, বলুন।

'যে জাতি পৃথিবীর সব ধর্মের ও জাতির নিপীড়িত ও আশ্রয়প্রার্থীদের আশ্রয় দিয়েছে, আমি সেই জাতিরই একজন বলে গর্ববোধ করি। ...আমরাই ইহুদীদের খাঁটি বংশধরদের অবশিষ্ট অংশকে সাদরে বুকে ধরেছি। যে বছর রোমানদের ভয়ঙ্কর উৎপীড়নে তাদের পবিত্র মন্দির ধ্বংস হয়, সেই বছরই ওরা আমাদের দক্ষিণ ভারতে আশ্রয় পায়। জরথুস্ট্রের অনুগামী মহান পারসিক জাতির অবশিষ্টদের যে ধর্মাবলম্বীরা আজ পর্যন্ত তাদের আশ্রয় দিয়েছে, প্রতিপালন করেছে, আমি তাদেরই একজন।...'

মেট্রোপলিট্যান কলেজের উদীয়মান ছাত্র শশধর মুগ্ধ হয়, বিস্মিত হয়।

বিস্ময়ের ঘোর কাটার পর উনি বলেন, খগেনবাবু, আমাদের এই ভারতবর্ষ নিয়ে এমন গর্বের কথা তো আগে কারুর মুখে শুনিনি।

হ্যাঁ, ভাই, সত্যি আগে কেউ আমাদের দেশ সম্পর্কে এমন বুক ফুলিয়ে গর্ব দেখাতে সাহসই করেন নি।

তাছাড়া এই সন্ন্যাসীর বয়স মাত্র বছর তিরিশেক?

হ্যাঁ।

খগেনবাবু সঙ্গে সঙ্গেই একটু হেসে বলেন, আপনি কি জানেন, এই সন্ন্যাসী কলকাতারই ছেলে?

ইনি বাঙালি?

হ্যাঁ।

রিপন কলেজের ছাত্রদের মধ্যে তখন শুধু বিবেকানন্দকে নিয়েই আলোচনা।

যাই বলুন, এই সন্ন্যাসীর মত ভারত-প্রেমিক আর হয়নি।

হ্যাঁ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু আজকের অমৃতবাজারে বিবেকানন্দের বক্তৃতার যে রিপোর্ট বেরিয়েছে, তা পড়েছেন কি?

না, পড়া হয়নি।

তাহলে শুনুন।...

'ভারতবর্ষ যে বহু বিজ্ঞানের জন্মভূমি, তাহা আপনারা জানেন। গণিতের জন্ম ভারতবর্ষে। আজ পর্যন্ত আমেরিকাবাসী আপনারা সংস্কৃত গণনানুযায়ী ১, ২, ৩ হইতে ০ পর্যন্ত সংখ্যা গণনা করিতেছেন। সকলেই জানেন, বীজগণিতের উৎপত্তিও আমাদের ভারতবর্ষে। আর নিউটনের জন্মের হাজার বছর আগে ভারতবাসীরা মাধ্যাকর্ষণের কথা জানিত।'

এইসব কথা শুনলে গর্বে বুক ভরে যায়।

গোঁড়ামি আর কুসংস্কারের বিরুদ্ধেও গর্জে ওঠেন বিবেকানন্দ।

'যে জাতি শত শত বৎসর যাবৎ এক গেলাস জল 'ডান হাতে খাইব, কি বাঁ হাতে খাইব'—এইরূপ গুরুতর সমস্যাগুলির বিচারে ব্যস্ত রহিয়াছে, সেই জাতির নিকট আর কি আশা করিতে পারো? যে দেশের বড় বড় মাথাগুলি শত শত বৎসর ধরিয়া এই স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচারে ব্যস্ত, সেই জাতির অবনতি যে চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে, তাহা কি আর বলিতে হইবে?"

বিবেকানন্দের প্রতিটি কথায় তখন ছাত্র-যুবক সমাজ উদ্বেলিত হচ্ছে।

আগে কে এইসব কথা বলতে সাহস করেছেন?

না, না, কেউ না।

কি নির্ভীক, কি নিদারুণ চরিত্রবল থাকলে এইসব কথা বলা যায়, তা ভাবলেও অবাক লাগে।

হ্যাঁ, ইনি একেবারে ক্ষুরধার তরবারি!

"যে দেশে কোটি কোটি মানুষ মহুয়ার ফল খেয়ে বেঁচে থাকে, আর দশ-বিশ লাখ সাধু আর ক্রোড় দশেক ব্রাহ্মণ ঐ গরীবদের রক্ত চুষে খায়, আর তাদের উন্নতির চেষ্টা করে না, সে কি দেশ, না নরক? সে ধর্ম, না পৈশাচ নৃত্য!"

প্রতিটি ফুলকিতে ছড়িয়ে পড়ে আগুন!

"আগামী পঞ্চাশ বৎসর আমাদের গরীয়সী ভারতমাতাই আমাদের আরাধ্য দেবতা হউন, অন্যান্য অকেজো দেবতা এই কয়েক বৎসর ভুলিলে ক্ষতি নাই।..."

ঢাকার যুবকরা বিবেকানন্দকে ঘিরে ধরেছে। ওদের নিবেদন স্বামীজি, দয়া করে আমাদের কিছু ধর্ম-উপদেশ দিন।

বিবেকানন্দ বেশ রাগ করেই বলেন—"ধর্ম-উপদেশ! পরাধীন জাতির কোন ধর্ম থাকতে পারে নাকি? এখন একমাত্র ধর্ম হচ্ছে শক্তিশালী হয়ে বিদেশী শোষকদের তাড়ানো। তারপর আমার কাছে আসিস ধর্মের কথা শুনতে।"

স্বামীজি আর কি বললেন?

"...প্রাণচঞ্চল তরুণ বাংলার এখন সর্বাধিক প্রয়োজন শরীর গঠনের ও অকুতোভয় দুঃসাহসিকতার।...দুঃসাহসিকতা, পৌরুষ, শৌর্য ও বীরনীতি অবলম্বন করে দুর্বলদের পাশে দাঁড়াতে হবে এবং তাদের রক্ষা করতে হবে।..."

"স্বয়ং মহামায়ার মূর্ত বিগ্রহ এবং সাকার মাতৃভূমি জ্ঞানে নারীকে সম্মান কর। তোমরা কি জান না, 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী?"

আর বললেন—তোমরা সঙ্ঘবদ্ধ হও, সমাজসেবা সংগঠন গড়ে তোলো। 'শিব জ্ঞানে জীব সেবা' করো।

শিবনাথ প্রায় দৌড়তে দৌড়তে একটা পত্রিকা হাতে নিয়ে বৈঠকখানার মেসে এসে হাজির। হাঁপাতে হাঁপাতে মেসের বন্ধুদের বলে—দেখ, দেখ, 'বর্তমান ভারত'-এ বিবেকানন্দ কী লিখেছেন।

কী লিখেছেন?

হ্যাঁ, বলছি। তোমরা মন দিয়ে শোনো।

শিবনাথ পড়ে—"একান্ত স্বজাতি-বাৎসল্য ও একান্ত ইরান-বিদ্বেষ গ্রীকজাতির, কার্থেজ-বিদ্বেষ রোমের, কাফের-বিদ্বেষ আরব জাতির, মূর-বিদ্বেষ স্পেনের, স্পেন-বিদ্বেষ ফ্রান্সের, ফ্রান্স-বিদ্বেষ ইংলন্ড ও জার্মানির এবং ইংলন্ড-বিদ্বেষ আমেরিকার উন্নতির এক প্রধান কারণ নিশ্চিত।"

শিবনাথ একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, বিবেকানন্দ কী বলতে চাইছেন, তা তোমরা কি বুঝতে পেরেছে?

চিত্তরঞ্জন গম্ভীর হয়ে বলে, স্বজাতি-বাৎসল্য ছাড়াও কোন একটা দেশ সম্পর্কে আমাদের বিদ্বেষ না থাকলে এই দেশের উন্নতি সম্ভব নয়।

হ্যাঁ, ঠিক কিন্তু কোন দেশের বিরুদ্ধে আমাদের বিদ্বেষ থাকতে পারে?

অবশ্যই ইংলন্ড।

হ্যাঁ, চিত্তরঞ্জন, তুমি ঠিকই বলেছ।

মানিকতলার মেসবাড়িতে পৌঁছেই জগদীশ কলেজের কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে ঘরের মধ্যে ডাক দেয়।

সবাই প্রশ্ন করে, কী ব্যাপার?

এই দেখ লন্ডনে বিবেকানন্দ বলেছেন—পড়ুক গুলি আমার বুকে, আমেরিকা ও ইউরোপ কেঁপে উঠবে।...কংগ্রেস জোর গলায় নিজেদের স্বাধীনতা declare করুক, শুধু মাগীদের মতন বসে বসে কাঁদুনি গাইলে কি হবে?

সর্বনাশ! কি দুঃসাহস!

জগদীশ গম্ভীর হয়ে বলে, বিবেকানন্দ আজে-বাজে কথা বলেন না। হ্যাঁ, আমাদের দুঃসাহস দেখাবার দিনই এগিয়ে আসছে।

শ্যামসুন্দর বলে, হ্যাঁ, জগদীশ, সত্যি আর চুপচাপ বসে থাকলে চলবে না। কিছু করতে হবে।

...'হে ভারত, ভুলিও না...নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই।...

"হে বীর সাহস অবলম্বন কর ; সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই। তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী ; বল ভাই ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ। আর বল দিন-রাত, হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও ; মা, আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"

উনবিংশ শতাব্দীর অন্তিম লগ্নে বিবেকানন্দ দেশমাতৃকার মুক্তির মন্ত্রে পাগল করে দিলেন যুবসমাজকে।

লক্ষ লক্ষ ছাত্র ও যুবক লোকচক্ষুর আড়ালে অঙ্গীকার করলো, প্রয়োজনে জীবন উৎসর্গ করব কিন্তু দেশের মুক্তি চাইই চাই।

অরবিন্দের গোপন-বার্তা নিয়ে বরোদা থেকে কলকাতা এসে পৌঁছলেন যতীন বাঁড়ুজ্যে আর বারীন ঘোষ।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্'-এর অনুপ্রেরণায় আর বিবেকানন্দের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিলো একদল যুবক। নেপথ্যে শুরু হলো অনুশীলন সমিতি গড়ার উদ্যোগ।

বিদায় নিলো অবিস্মরণীয় উনবিংশ শতাব্দী!

নতুন আশা, নতুন স্বপ্ন, নতুন প্রতিজ্ঞা নিয়ে ওরা স্বাগত জানালো হিরন্ময়-আলোয় আলোভরা বিংশ শতাব্দীকে।